শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
পঞ্চাশটি
কিশোর গল্প

পঞ্চাশটি কিশোর গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশটি কিশোর গল্প

নির্মল বুক এজেন্সি

২৪বি কলেজ রো □ কলকাতা ৭০০ ০০৯

PANCHASTI KISHORE GALPO
By SIRSENDU MUKHOPADHYA
NIRMAL BOOK AGENCY
24 B, College Row
Kolkata 700 009
(033) 2241 9238
(033) 2241 4003
Fax : (033) 2241-3338
E-mail : nirmalsahityam@gmail.com
Web : www.nirmalsahityam.com

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪ বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল পুস্তকালয়
১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩/১এ ক্যানেল ইস্ট রোড
কলকাতা ৭০০ ০১১

বর্ণগ্রন্থন :
অনুপম ঘোষ
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
অনিকেত রায়

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর ১৯৯৬

ছোটরা যারা বই পড়তে ভালোবাসে

সূচি

রাজার মন ভালো নেই

রাজার মন আর কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না। মন ভালো করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে, নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার রকমের ভাঁড়ামি করেছে, যাত্রা, নাটক, মেলা—মচ্ছব, যাগ—যজ্ঞ, পুজো পাঠ সব হল। পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরের হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা বাদাম, দেশ—বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চীনে রসুইকররা দু'বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুক কাঁপিয়ে হুহুংকারে এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। ''না হে, মনটা ভালো নেই।''

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়ি কখনও তেজি, কখনও মহা, কখনও মোটা, কখনও সরু। রাজবৈদ্য আপনমনে হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ করেন, তারপর শতেক রকম শেকড়—বাকড় পাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে শতেক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান। রাজা খেয়ে যান। তারপর হড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। 'না হে, মনটা ভালো নেই।''

রাজার মন ভালো করতে রাজপুত্তুর আর সেনাপতিরা আশপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজাগুলোকে বন্দি করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। 'মনটা বড় খারাপ রে।''

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলস্কর পাইক—পেয়াদা নিয়ে রাজা শ'দেড়েক তীর্থ আর দেশ—দেশান্তর ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, ''হায় হায়! মনটা এ'কদম ভালো নেই।''

ওদিকে ভাঁড়ামি করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় একটু গন্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন। রাজ—পুরোহিত হোম—যজ্ঞের এত ঘি পুড়িয়েছেন যে এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপণ্ডিতরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজজ্যোতিষী রাজার জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে—কষে দিস্তা—দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুল—বাগিচায় বসে আছেন। চারদিকে হাজারো রকমের ফুলের বন্যা, রঙে গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দিঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে বসে থেকে হঠাৎ সিংহ গর্জনে বলে উঠলেন, "গর্দান চাই।"

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপনমনে বিড়—বিড় করছিলেন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, "কার গর্দান মহারাজ?"

রাজা লজ্জা পেয়ে বলেন, "দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়া দরকার।"

মন্ত্রী বললেন, "ভাবুন মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।"

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনোমতো একটা গর্দান দিলে বোধহয় মন ভালো হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভায় কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "না হে, গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।"

বিকেলবেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বুলদার, হুক্কাদার, মন্ত্রী! পায়চারি করতে করতে রাজা হঠাৎ নদীর ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুড়ির ঘরে আগুন দে! দে আগুন বুড়ির ঘরে।"

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, "যে হুকুম মহারাজ। শুধু বুড়ির নামটা বলুন।"

রাজা অবাক হয়ে বললেন, "কী বললাম বলো তো!"

"আজ্ঞে, এই যে বুড়ির ঘরে আগুন দিতে বললেন।"

রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, "বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।"

সেইদিনই শেষ রাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, "বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।"

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির!

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।"

"বিছুটি!" বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গরুর গাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই।

রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক একটা ভাব। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধে করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, "পুঁতে ফেললে কেমন হয়!"

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, "খুব ভালো হয় মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।"

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "কীসের ভালো হয়? কিছুতেই ভালো হবে না মন্ত্রী। মনটা একদম খারাপ।"

মন্ত্রী বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলস্কর, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রথ। বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে। রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু একটাও তির ছুড়লেন না। দুপুরে বনভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন, "বাপ রে! ভীষণ ভূত!"

মন্ত্রীমশাই সঙ্গে সঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজামশাইয়ের সামনে এসে বললেন, "তাই বলুন মহারাজ! ভূত! তা তারই বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে আনাচ্ছি, রাজ্যে যত ভূত আছে ধরে

ধরে সব শূলে দেওয়া হবে।''

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, ''ভূত! না না ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি কখনো মাথা ধরে?''

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, ''মাথা ধরলেও ভূতবদ্যি আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।''

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, ''আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড় খারাপ।''

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দরমহলের অলিন্দে রানির পাশাপাশি বসে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, ''চলো রানি, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।''

রানি তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, ''তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তা—ভাতের জোগাড় কর।''

রাজা অবাক হয়ে বললেন, ''পান্তাভাত? পান্তাভাতটা কী জিনিস বলো তো?''

''জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজে তো পান্তাভাতের কথা বললেন।''

''বলেছি! তা হবে। কখন যে কী বলি। মনটা ভালো নেই তো, তাই।''

মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চারজন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, ''ওরে তোরা আজ পালা করে রাজামশাইয়ের ওপর নজর রাখবি। চব্বিশ ঘণ্টা।''

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, ''রাজামশাই ভোর রাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।''

আর একজন বলল, ''রাজামশাই একা একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব, বলে খুঁকখুঁক করে কাঁদছেন।''

আর একজন এসে খবর দিল, ''রাজামশাই এক দাসির বাচ্চা ছেলের হাত থেকে একটা মন্ডা কেড়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন এই মাত্র।''

চতুর্থ জন বলল, ''আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজামশাই খুব ঘন ঘন ঢেকুর তুলছেন আর বলছেন— সবই তো হল, আর কেন?''

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, ''ঠিক আছে, নজর রেখে যা।''

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, ''আজ্ঞে, রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, 'নজর রাখছিস? রাখ' বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।''

দ্বিতীয় জন এসে বললে, ''আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, ''কানে কেন্নো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়।''

তৃতীয় জন কান চুলকে লাজুক—লাজুক ভাব করে বলল, ''আজ্ঞে আমি রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালি সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, 'ওরে, ভালো গুপ্তচর হতে গেলে সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই।' বলে রাজা নিজেই গাছ ছেঁটে দেখিয়ে দিলেন।''

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনও এসে পৌঁছায়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন।

ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলাকৌশল করতে যায়নি। সকালবেলা রাজার শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি আপনার ওপর নজর রাখছি।''

রাজা অবাক হলেও স্মিত হাসলেন। হাই তুলে বললেন, ''বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ করো।''

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, "চিমটি দে। রাম চিমটি দে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাখহরি পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, "করিস কী, করিস কী? ওরে বাবা।"

রাখহরি বলল, "বললেন যে।"

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ল্যাঙ মেরে ফেলে দে।" বলতে না বলতেই রাখহরি ল্যাঙ মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন! রাখহরি রাজার গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল। রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, "হুঁ"।

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনো ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার পিছু—পিছু শোওয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁত—খুঁত করে বলে উঠলেন, "ঠান্ডা জলে চান করব, ঠান্ডা জলে" ...রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো জলটা সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে কেসে উঠে বসলেন। কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। রাখহরির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "আচ্ছা শুগে যা।"

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, "দে, বুকে ছোরা বসিয়ে দে" ...চকিতে রাখহরি কোমরের ছোরাখানা খুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজা বললেন, "থাক, থাক, ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।"

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু'হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, "ওরে আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ হাসি পাচ্ছে!"

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে—পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "যাক বাবা! মন খারাপটা গেছে তাহলে।"

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললে, "ওঃ হোঃ হোঃ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!"

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা গেল আবার। কারণ নেই কিছু নেই রাজা সব সময়ে কেবল ফিক—ফিক করে হেসে ফেলছেন। খুব দুসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক—ফিক। অমুক মারা গেছে? ফিক—ফিক। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক—ফিক। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিক—ফিক।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।

বাজার দর

একশো বছর পর ঘুম ভাঙতেই রামবাবু ভারি অস্বস্তিবোধ করলেন। যে কাচের বাক্সে তিনি শুয়ে আছেন, সেটার ভিতরটা ভীষণ ঠান্ডা। তার ওপর চোখে তিনি সবকিছু ধোঁয়াটে দেখছেন, কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে, হাত—পা খিল ধরা, মাথাটা খুব ফাঁকা।

কিছুক্ষণ একেবারে ভোম্বলের মতো শুয়ে রইলেন রামবাবু। তারপর আস্তে আস্তে শরীর গরম হল, কানের ভোঁ ভোঁ কমে গেল, হাত পায়ের খিল ছাড়ল। সবকিছু মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তেই তিনি ভীষণ আঁতকে উঠে বসলেন এবং চারদিকে প্যাট—প্যাট করে তাকাতে লাগলেন। ১৯৭৯ সালে তাঁকে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে একটা ঠান্ডা বাক্সে ভরে মাটির নিচে একটা স্টোর রুমে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল একশো বছর পর পরবর্তী সমাজের মানুষ তাঁর ঘুম ভাঙাবে।

একশো বছর কি কেটে গেল এর মধ্যেই? চোখের দৃষ্টি কিছু স্বচ্ছ হতেই তিনি দেখলেন, কাচের বাক্সটা একটা টেবিলের ওপর রাখা, টেবিলের চারধারে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক তাঁকে গম্ভীরভাবে দেখছে।

রামবাবু প্রথমে একটা হাঁচি দিলেন, একটু কাসলেন, একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ভারি লজ্জা—লজ্জা করছিল তাঁর। স্বাভাবিক নিয়মে এতদিন তাঁর বেঁচে থাকার কথা নয়। হিসেব করলে, এখন তাঁর বয়স ঠিক একশো চল্লিশ বছর। তাছাড়া এই একশো বছর পরেকার দুনিয়ায় কত কী পাল্টে গেছে। কেমন লাগবে কে জানে বাবা! তিনি প্রথমেই দেখে নিলেন মানুষগুলোর এই একশো বছরের বিবর্তনে লেজ বা শিং গজিয়েছে কি না। গজায়নি। লোকগুলো খুব লম্বা বা বেঁটে হয়ে যায়নি তো? না। লোকগুলো ভালো, না খারাপ? বোঝা যাচ্ছে না। তবে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা তাঁর জানতে ইচ্ছে করছিল, সেটা হল বাজারদর। এখন চাল কত করে কিলো? আলু কত? মাছ কত? পালং, কপি, কড়াইশুঁটিই বা কী রকম?

রামবাবু একটু হেসে বললেন, "খুব একচোট ঘুম হল বাবা। টানা একশো বছর একেবারে।"

লোকগুলো তাঁর কথার জবাব দিল না। ভারি অভদ্র। এখনো খুব খরচোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সকলের মুখেই কাপড়ের ঢাকনা।

রামবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "হাঁ করে দেখছ কী সবাই? গত একশো বছরে আমার পেটে কিছু পড়েনি, তা জানো? দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটিনি। ছুটে গিয়ে খাবার—দাবার নিয়ে এসো। আর শোনো, চায়ের নাম শুনেছ তো? চা? জানো? হ্যাঁ, এক কাপ গরম চা দাও সবার আগে।"

লোকগুলো মৃদু—মৃদু হাসছে। রামবাবু ভাবলেন, এরা বোধহয় বাংলা ভাষা বোঝে না। তার আর দোষ কী? একশো বছরে ভাষারও কত পরিবর্তন হয়ে থাকবে। এখনকার বাংলা ভাষা হয়তো চীনেভাষার মতোই

দুর্বোধ্য। তাই তিনি একটু চীনে ভাষার মিশেল দিয়ে বললেন, "খাবারচুং জলদিচি লাওং। গরমং চাং দরকারং।

বলে নিজের ওপর একটু বিরক্তই হলেন রামবাবু। চীনে ভাষা তাঁর কস্মিকালেও জানা নেই। অজানা ভাষার ভেজাল দিতে গিয়ে বাংলাটা কেমন সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে গেল না?

লোকগুলো কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। তবে অপারেশন থিয়েটারের মতো নানারকম যন্ত্রপাতিওলা ঘরটায় তারা হরেক কলকাঠি নাড়তে লাগল। রামবাবু হাই তুলে বললেন, "আর কতক্ষণ এই প্রায় দেড়শো বছরের বুড়োটাকে তোরা দগ্ধে মারবি বাপ? খাবার না দিস একটা আয়না অন্তত দে। বুড়ো মুখটার কী ছিরি হয়েছে দেখি।"

লোকগুলো এ—কথাটা যেন কী করে বুঝতে পারল। একজন কোত্থেকে ছোট্ট গোল একটা হাত আয়না বের করে ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে। রামবাবু কী দৃশ্য দেখবেন সেই ভয়ে আয়নাটা মুখের সামনে ধরেও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। চোখ খুলবেন কি খুলবেন না ঠিক করতে না করতেই অবাধ্য চোখদুটো বে—আক্কেলের মতো খুলে গেল। কিন্তু রামবাবু খুশিই হলেন। মুখের চামড়া একটু ঝুলে গেছে ঠিকই, দাড়িও একটু হয়েছে, তবে সব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। চল্লিশ বলেই চালানো যায়।

অবশ্য এরকমই কথা ছিল কাচের বাক্সে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তাঁকে এমনভাবেই রাখা হয়েছিল যাতে তাঁর শরীরে অতি মৃদু হৃৎস্পন্দন হয়, অতি মৃদু গতিতে রক্ত চলাচল করে, অতি মৃদু শ্বাসপ্রশ্বাস চলে এবং শরীরের ক্ষয়ক্ষতি নগণ্য মাত্রায় ঘটে। এই একশো বছর আসলে তিনি ছিলেন মৃত। কাজেই শরীরটার বয়স বাড়েনি।

একটা লোক তাঁর বাঁ হাতটা বাগিয়ে ধরে ইনজেকশন দিচ্ছে। তিনি তাকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন বাজারদরটা কীরকম বলতে পারো হে? আলু কত করে যাচ্ছে!"

লোকটা খুব অবাক হয়ে রামবাবুর দিকে তাকাল। রামবাবু ভাবলেন, লোকটা বোধহয় বাংলা জানে না। ইংরিজিতে বললেন, "পট্যাটো?"

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, "রাইস? ডোনট ইউ ইট রাইস?"

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু হাল ছেড়ে দেন। ইংরিজিও বিস্তর পাল্টে গেছে বোধ হয়। একটা ভারি অস্বস্তি হচ্ছে মনের মধ্যে। একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক গয়েশ হালদারের সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলেন। দুশ্চিন্তা সেই বাজিটা নিয়ে।

একশো বছর পর তাঁর ঘুম ভাঙলে লোকেরা তাঁর ওপর বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট চালাবে, এরকম কথাই ছিল। লোকগুলো চালাচ্ছিলও তাই। ইনজেকশন দিল, রক্ত নিল, ব্লাডপ্রেশার দেখল, হাঁ করাল, শুইয়ে বসিয়ে, চিত করিয়ে, উপুড় করে বিস্তর পরীক্ষা চালাল।

রামবাবু আপনমনে বকবক করতে লাগলেন, "চল্লিশের মতো দেখতে বলেই কি আর চল্লিশের খোকা আছি রে বাবা? বয়সটা হিসেব করে দ্যাখ না! তারপর বুঝেসুঝে খোঁচাখুঁচি করিস।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! গোমড়ামুখো লোকগুলো নাগাড়ে তাদের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রামবাবুর নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ পড়েনি কেন সেটাই আশ্চর্য! একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, দুটো ছেলে আর চারটে মেয়ে ছিল, মাথার ওপর বুড়ো বাপ—মা, তিন ভাই আর সাত বোনও ছিল। এই একশো বছরে তাদের কারোরই আর বেঁচে থাকার কথা নয়।

ভাবতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন রামবাবু। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। একটা লোক তাড়াতাড়ি একটা টেস্ট টিউবে সেই চোখের জল ধরে রাখল।

তবে শোকটা খুব বেশিক্ষণ রইল না রামবাবুর। আত্মীয়স্বজনরা এতকাল বেঁচে থাকলে খুনখুনে বুড়োবুড়ি হয়ে যেত সব। সেটাও ভালো দেখাত না। তিনি লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার বউ—

বাচ্চারা এতকাল বেঁচে নেই জানি, কিন্তু নাতিপুতি বা তস্য পুতপৌত্রাদি কে আছে জানো? একটু খবর দেবে তাদের?

একটা কিম্ভূত এক্স—রে মেশিনে তাঁকে ঝাঁজরা করছিল লোকগুলো। পাত্তাও দিল না। তবে তারা চটপট যন্ত্রপাতি গুটোচ্ছিল। রামবাবুর মনে হল পরীক্ষা আপাতত শেষ হয়েছে। তিনি মটকা মেরে পড়ে রইলেন।

লোকগুলো কোনো সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে গেল। রামবাবু শুয়ে—শুয়ে চোখ পিট—পিট করতে লাগলেন। একশো বছরে বাইরের দুনিয়াটার কতটা পরিবর্তন হয়েছে, তা বুঝবার উপায় নেই এখান থেকে। এ—ঘরে নিরেট দেয়াল আর যন্ত্রপাতি। একটা পুরু দরজা আছে বটে, কিন্তু তার ওপাশে একটা করিডর। বাইরে হয়তো এখন তুষার—যুগ চলছে, সূর্য হয়তো নিভু—নিভু হয়ে এসেছে, মানুষ হয়তো এখন বিজ্ঞানের বলে শূন্যে হাঁটে, জিনিসপত্রের দাম হয়তো একশো গুণ করে বেড়েছে। হয়তো....!

রামবাবু শুয়ে—শুয়ে কিছুক্ষণ ঠ্যাং নাচালেন, তারপর 'দুত্তোর' বলে উঠে পড়লেন। ঘুরে ঘুরে ঘরের যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তবু এই একশো বছর পরেকার আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোর কলাকৌশল তিনি ভালো বুঝতেই পারলেন না। একটা বোতাম টিপতেই ঝড়ের মতো শোঁ—শোঁ শব্দ ওঠায় তাড়াতাড়ি সরে এলেন সেখান থেকে এবং গিয়ে দরজার হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। ভাগ্য ভালো, দরজাটা হড়াক করে খুলে গেল।

কিন্তু করিডরে পা রেখেই আঁতকে উঠলেন রামবাবু। করিডরের মেঝেটা ঠিক নদীর ধীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে! তবে চলন্ত ফুটপাথ, এসকেলেটার বা কনভেয়ার বেল্ট রামবাবুর আমলেও ছিল, তাই খুব বেশি অবাক হলেন না। মাথাটা ঘুরছিল বলে তিনি চলন্ত করিডরে বসে রইলেন। খানিকটা ওপরে উঠে এবং অনেকটা নিচে নেমে, খানিক ডাইনে গিয়ে এবং ফের কিছুটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে করিডরে চলতে লাগলেন। একটু বাদে আর একটা দরজা পেলেন। করিডর থেকে লাফ দিয়ে নেমে দরজাটা টানলেন রামবাবু। দরজাটা খুলেও গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে রামবাবু একটা গভীর শ্বাস ছাড়লেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন তাই। না, তুষারযুগ আসেনি বা সূর্যও নিভু—নিভু হয়নি। বরং একটার বদলে আকাশের চারধারে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা সূর্য জ্বলজ্বল করছে। আবহাওয়া খুবই মনোরম। না গরম, না ঠান্ডা। চারদিকে একশো দুশোতলা বাড়ি একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। আকাশেও তিনি বিস্তর বাড়িঘর ভেসে বেড়াতে দেখলেন। তারই ফাঁকে—ফাঁকে শোঁ করে নানান সাইজের রকেট উড়ে যাচ্ছে, পিরিচের মতো দেখতে কিছু জিনিসকেও উড়ে যেতে দেখলেন তিনি, আরও দেখলেন রকেট লাগানো চেয়ারের মতো দেখতে ছোট ছোট আকাশ—গাড়িতে মানুষ চলাফেরা করছে!

সামনের চলমান ফুটপাথে উঠে পড়লেন রামবাবু। আশেপাশে আরও সব লোকজন রয়েছে। তারা হাঁ করে দেখছে তাঁকে। দেখবেই। তাঁর পরনে সেই একশো বছর আগেকার ধুতি আর পাঞ্জাবি। এদের পরনে শুধু জাঙ্গিয়ার মতো খাটো একটু জিনিস, গা আদুড়।

রামবাবুর পাশেই একটা বুড়ো লোক। তার বয়স সত্তর বছর হবে। তা হোক, সত্তর হলেও এ— লোকটা রামবাবুর চেয়ে না হোক সত্তর বছরের ছোট। তাই আপনি বলবেন না তুমি বলবেন, তা ঠিক করতে না পেরে রামবাবু বারকয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ক'টা বাজে?"

বুড়ো লোকটা একটু অবাক হয়ে তাকাল বটে, তবে একটু খোনাসুরে বলল, "রাত ন'টা বেজে ছত্রিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড।"

রামবাবু নিজে বৈজ্ঞানিক। কাজেই অবাক হলেন না। এতক্ষণে বুঝলেন, আকাশে পাঁচটা সূর্য নয়, ওগুলো কোনো রকমের কৃত্রিম আলো যার ফলে চারদিকটা দিনের মতো দেখাচ্ছে। সম্ভবত ওগুলো পৃথিবীর অন্য পাশের সূর্যের আলো থেকে এপাশে আলো প্রতিফলিত করছে। এ ধরনের একটা আইডিয়া একশো বছর আগে তাঁর মাথাতেও এসেছিল। রামবাবু ফের জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তারিখটা কত বলবে বাবা?"

লোকটা অবাক চোখে ফের তাকিয়ে বলল, "জানুয়ারি, বিশ শো ঊনআশি।"

রামবাবু তা জানেন। তবু লোকটার সঙ্গে একটু খেজুরে আলাপ করছেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য অন্য। একশো বছর পর পৃথিবীতে কীরকম পরিবর্তন হবে না—হবে, মানুষ কতটা এগোবে না—এগোবে, তা মোটামুটি আন্দাজ ছিল। সুতরাং তিনি চারদিকের পরিবর্তন দেখে খুব অবাক হননি। কিন্তু গয়েশের সঙ্গে একটা বাজি ছিল। সেইটে বড় খোঁচাচ্ছে।

রামবাবু বললেন, "আচ্ছা সুকিয়া স্ট্রিটটা কোনদিকে বলতে পারো বাবা?"

লোকটা বলে, "সুকিয়া স্ট্রিট? সুকিয়া স্ট্রিট বলে কিছু শুনিনি তো!"

"নর্থ ক্যালকাটায়।"

লোকটা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, "ক্যালকাটা? ওঃ ক্যালকাটা নামে একটা গ্রাম আছে বটে। সে তো অনেক উত্তর দিকে।"

"এ শহরটার নাম কী বাবা?"

"এ হল গোসাবা, সুন্দরবন!"

"বটে! গোসাবার এত উন্নতি?" বলে রামবাবু চোখ কপালে তোলেন।

লোকটা হঠাৎ রামবাবুর একটা হাত খপ করে ধরে বলল, "আচ্ছা, আপনি কি রামবাবু? একশো বছর আগে যাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল?"

রামবাবু খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি সে—ই। কী করে বুঝলে বাবা?"

"বুঝব না? আপনার ঘুমন্ত মুখের ছবি যে প্রায়ই টেলিভিশনে দেখানো হয়। খবরের কাগজেও বেরোয়।"

"তাই বুঝি?" বলে খুব হাসলেন রামবাবু। বললেন, "তা কলকাতার কী হল বলতে পারো বাবা?"

"সে তো আরও সত্তর—আশি বছর আগেই মশা, লোড—শেডিং আর জলের অভাবে হেজে গিয়েছিল। শহরে জঙ্গল গজিয়ে যায়। তারপর এখন অবশ্য কলকাতা আবার বর্ধিষ্ণু গ্রাম হয়ে উঠেছে। ভালো চাষবাস হচ্ছে। চৌরঙ্গির আলু খুব বিখ্যাত, বাগবাজারের কুমড়ো পৃথিবীর সেরা, খিদিরপুরে মোচার সাইজের পটল জন্মায়। তাছাড়া কলকাতায় এখন 'মশা বাঁচাও' আন্দোলনের একটা হেড কোয়ার্টার হয়েছে।"

"বটে? সে আবার কী? মশা বাঁচাবে কেন বাবা?"

"মশা মেরে—মেরে মানুষ তো মশার প্রজাতিই ধ্বংস করে দিয়েছিল কিনা। যেমন একসময় আপনারা বাঘ—সিংহ মেরে সব প্রায় নিকেশ করেছিলেন। পরে আপনারা যেমন 'ব্যাঘ্রপ্রকল্প' করে বাঘ বাঁচাতে চেয়েছিলেন, এখন ঠিক সেইভাবে মশা জিয়োনোর চেষ্টা চলছে।"

রামবাবু এবার আসল কথাটায় এলেন। খুব সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলবে? খুব সাবধানে বোলো। তেমন শকিং কিছু শুনলে আমার বুড়ো হার্ট থেমে যেতে পারে। এখনকার বাজারদরটা বলতে পারো?"

"বাজারদর?" লোকটা একটু অবাক হয়, হেসেও ফেলে। বলে "খুব চড়া।"

"খুব?" বলে রামবাবু বড় বড় চোখে তাকান। গয়েশের সঙ্গে এই নিয়েই বাজি। গয়েশ বলেছিল, একশো বছর পর বাজারদর হবে একশোগুণ, রামবাবু বলেছিলেন, কক্ষনো না। দশগুণ বড়জোর হতে পারে। রামবাবুর বুকটা তাই ঢিবঢিব করছিল। বললেন, "তবু বলো বাবা, শুনে রাখি। আচ্ছা, আগে বলো চাল কত করে।"

"চাল?" লোকটা হাসিমুখেই বলে, "চাল যাচ্ছে তিন শো টাকা।"

রামবাবু শকটা সামলাতে পারলেন না। চোখ উল্টে ফেললেন, হাত—পা কাঠ হয়ে গেল, ভিরমি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে লোকটা বলল, "কিলো নয়। কুইন্ট্যাল।"

রামবাবু আবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে একটা শ্বাস ছাড়লেন। আর যা হোক তা হোক, বাজারদরটা ঠিক আছে।

ভগবানের আবির্ভাব

ক্যানসারের ওষুধ যে প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা লোহিতাক্ষ নিজেই বুঝতে পারছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক কাঁপছিল, তেষ্টা পাচ্ছিল, হাত—পা ঠান্ডা আর মাথা গরম হয়ে উঠছিল।

লোহিতাক্ষর সামনে একটা কাচের পাত্র বুনসেন বার্নারের ওপর বসানো। ভিতরে একটা সবুজ তরল টগবগ করে ফুটছে। সবুজ রংটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে মেরে এলে তিনি সেটা একটা পিউরিফায়ারের মধ্যে রাখবেন। একটা ফানেলের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ তরলটি একটি টেস্ট টিউবে এসে জমবে। তারপর আর মাত্র দু'টো পর্যায় থাকবে। ক্যানসারগ্রস্ত একটা ইঁদুর খাঁচায় ধুঁকছে। তার ওপর প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ফলাফল কী হবে, তা লোহিতাক্ষ জেনে গেছেন। তাঁর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা হল, কপালের বাঁ দিকে একটা আব। যখনই তিনি কোন সাফল্যের কাছাকাছি আসেন তখনই ওই আবটার মধ্যে একটা কুড়কুড় শব্দ হয়। ঠিক যেন একটা পোকা। আবের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুড়কুড় করে আনন্দে গান গায়।

লোহিতাক্ষর আবের মধ্যে পোকাটা এখন কুড়কুড় কুড়কুড় শব্দ করছে। লোহিতাক্ষ যখন সর্দি—কাশির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন তখনও আবের মধ্যে এরকমই শব্দ হয়েছিল। আর সে কী ওষুধ। চারবার নাক ঝাড়লেই সর্দি সাফ। সেবার সর্দির ওষুধ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজও তাঁর বাঁধা। আবের ওপর আদর করে একটু হাত বুলিয়ে নিলেন লোহিতাক্ষ।

এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বনমালী ঢুকল। বনমালী লোহিতাক্ষর কাজের লোক।

বাইরে দু'জন লোক এয়েছেন।

এই সকালে আবার কে এল?

তা কী জানি। একজন বেঁটে, অন্যজন লম্বা। ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে না। যান গিয়ে দেখুন।

ভালো লোক নয় কী করে বুঝলি?

আপনিও বুঝবেন। আমি শুধু কয়েছিনু যে, বাবু এখন কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না, তাইতে প্রায় মারতে এল।

ওঃ তাই বুঝি খারাপ লোক। তা কী চায় তারা?

তা আর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। আপনার ভিজিটার, আপনি গিয়ে সামাল দিন।

লোহিতাক্ষ সাধারণত উটকো লোকজনের সঙ্গে দেখা—সাক্ষাৎ করেন না। কিন্তু আজ তিনি নিজের সাফল্যের আনন্দে এত ডগমগ যে, বার্নারের তাপটা কমিয়ে উঠে পড়লেন, চল তো গিয়ে দেখি কেমন লোক!

লোহিতাক্ষ বাইরের ঘরে যে দু'জন অপেক্ষা করছিল তারা সুবিধের লোক নয় তা এক নজরেই বোঝা যায়। বেঁটে লোকটা ভীষণ বেঁটে, পাঁচ ফুটের নিচেই হবে। আর তার চেহারা অনেকটা ফুটবলের মতো

গোলাকার। লম্বা লোকটি আবার বিসদৃশ রকমের লম্বা এবং দৈত্যের মতোই তার স্বাস্থ্য। মিল একটা জায়গায়। দু'জনের চোখই ভাটার মতো জ্বলন্ত। দেখলেই মনে হয়, এরা চোখের ইশারায় মানুষের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কোন দেশের লোক তাও বুঝবার উপায় নেই। গায়ের রং তামাটে উজ্জ্বল, মুখও ভাবলেশহীন, চুল কালো। সাহেব, বাঙালি, চীনে সবই হতে পারে।

কী চাই আপনাদের?

বেঁটে লোকটা তার ভাটার মতো চোখ দুটোকে আরও গনগনে করে লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে থেকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, তুমিই জড়িবুটিওয়ালা লোহিতাক্ষ সেন?

এ কথায় কার না রাগ হয়? নোবেলজয়ী বৈজ্ঞানিক লোহিতাক্ষ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। তাঁকে প্রথম পরিচয়ে 'তুমি' করে সম্বোধন আর 'জড়িবুটিওয়ালা' বললে তো তাঁর ক্ষেপে যাওয়ারই কথা। লোহিতাক্ষও ক্ষেপলেন এবং দাঁত কড়মড় করে বললেন, তার মানে? এটা কি ইয়ার্কির জায়গা?

বেঁটে লোকটা একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে এক গাল কটু গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শান্ত হও। তুমি যে একটা মেডেল পেয়েছ তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, মেডেল। কীসের মেডেল?

ওই যে নোবেল প্রাইজ না কী যেন। তা সে যাকগে, তুমি যে ভালো ছেলে তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপছিলেন বটে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতেও তিনি লক্ষ করলেন, বেঁটে লোকটার বাঁ কপালে একটা কালো রঙের জরুল। লোকটা মাঝে মাঝে জরুলটায় হাত দিচ্ছে।

লোহিতাক্ষ বললেন, আপনারা বেরিয়ে যান। আমার বাজে কথায় নষ্ট করার মতো সময় নেই।

বেঁটে লোকটা একটু গা—জ্বালানো হাসি হেসে বলল, কেন, কী এমন রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত আছে হে? অ্যাঁ!

বলেই লোহিতাক্ষর মুখে এক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে অপমানসূচক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারপর বলল, আগেকার লোকেরা ভক্তিশ্রদ্ধা জানত, আর এখনকার তোমরা! ছ্যা, ছ্যা, একটু ভদ্রতাও জান না দেখছি।

এ কথায় লোহিতাক্ষ লোকটাকে খুন করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রিভলবার নেই। কস্মিনকালেও ছিল না।

বেঁটে লোকটা কিন্তু লোহিতাক্ষর মনের কথা টের পেল এবং সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, খেলনাটা দাও তো।

দৈত্যটা একটা রিভলবার বের করে বেঁটের হাতে দিল। আর বেঁটেটা রিভলবারটা নিজের বুকের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ একটা শব্দ ও ধোঁয়ার ভিতরে বুলেটটা লোকটার বুকে লেগে ঠং করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

বেঁটে লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, দেখলে তো! বিশ্বাস না হয় নিজেই চেষ্টা করে দেখ। এই নাও রিভলবার। জেনুইন জিনিস, সত্যিকারের গুলিই ভরা আছে।

বলতে বলতে রিভলবারটা এগিয়ে দিল লোকটা।

লোকটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আর এক কুণ্ডলী ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আরে লজ্জা কী? চালাও না। আচ্ছা আনাড়ি রে বাবা!

লোহিতাক্ষ রিভলবারটা তুলে দুম করে গুলি করলেন। গুলিটা আগের বারের মতোই লোকটার বুকে লেগে ছিটকে পড়ল।

লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বলল, কী হল হে মেডেল—পাওয়া কম্পাউন্ডার, সুবিধে করতে পারলে? দাও খেলনাটা আমার হাতে দাও। আর শোনো, আমি হচ্ছি ভগবান। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই।

লোহিতাক্ষ রাগে গড়গড় করে বললেন, ভগবানই হোন আর যাই হোন, আপনি অত্যন্ত অভদ্র।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। গা জ্বালিয়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে। তারপর বলল, ওরে বাপু, আমার নাম ভগবান নয়, আমিই স্বয়ং ভগবান। যাদের মূর্তি—টুর্তি তোমরা পুজো করো তাদেরই একজন।

লোহিতাক্ষ নাস্তিক লোক। আর নাস্তিক বলেই তাঁর ভগবদ্ভক্ত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই খুব ঝগড়া করেন। তাঁর স্ত্রী মোটেই তাঁর নাস্তিকতাকে ভালো চোখে দেখেন না।

লোহিতাক্ষ লোকটার দিকে চেয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, ভগবান তো একটা বোগাস ব্যাপার। আমি ওসব বিশ্বাস—টিশ্বাস করি না। আর আপনাকেও আমার ভালো লোক মনে হচ্ছে না। আপনি থার্ড গ্রেড ম্যাজিশিয়ান মাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এখন আসুন। নমস্কার।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। তারপর বলল, বিশ্বাস করো না কি হে? জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে। কত লোক আমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কত সাধ্য সাধনা করে।

আমার ইয়ার্কি করার সময় নেই। ল্যাবরেটরিতে আমি একটা জরুরি কাজ করছি। আপনারা আসতে পারেন।

বলতে বলতেই লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে গেলেন, বেঁটে লোকটার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল, মেঝের ওপর পাতা বাঘছালে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন, ছাই মাখা শরীর, মাথায় জটাজুট, ধ্যান নিমীলিত চোখ, সারা গায়ে ফোঁস ফোঁস করে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোহিতাক্ষ তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে লাগলেন। ততক্ষণে শিবের বদলে ধনুর্ধর রামচন্দ্র দেখা দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই রামচন্দ্র গায়েব হয়ে বংশীধারী কৃষ্ণকে দেখা গেল।

বেঁটে লোকটা তেমনি গা—জ্বালানো হাসি হেসে বলল, দেখলে তো! এবার প্রত্যয় হল?

লোহিতাক্ষ একটু কেমন যেন হয়ে গেলেন। ম্যাজিশিয়ানরা অনেক কৌশল জানে ঠিকই, কিন্তু এটা ম্যাজিক বলে তাঁর মনে হচ্ছিল না। একটু ধন্ধে পড়ে কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন।

এমন সময় অন্দরমহল থেকে তাঁর স্ত্রী একটা শাঁখ হাতে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন। তোমার যে মহাপাপ হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন আর তুমি তাঁকে গালমন্দ করছ? ওরে বনমালী, শিগগির জল বাতাসা আর ফুল নিয়ে আয়, ধূপ দীপ জ্বালা....

বেঁটে লোকটা খুব ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগল। লোহিতাক্ষর স্ত্রী ধূপ দীপ জ্বেলে জল বাতাসা আর ফুল দিয়ে ঘণ্টা নেড়ে যাবতীয় স্তবস্তুতি আউড়ে যেতে লাগলেন। লোহিতাক্ষ বেকুবের মতো চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পুজো হয়ে গেলে লোহিতাক্ষকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে গিন্নি বললেন, হলটা কী তোমার? প্রণাম করো।

লোহিতাক্ষ অগত্যা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটা প্রণামও করে ফেললেন।

বেঁটে লোকটা খুব খুশি হয়ে বলল, লোহিতাক্ষ গাড়ল হলেও বউমাটি ভারি লক্ষ্মীমন্ত। তা তোমরা বরটর চাইবে না?

বরের কথায় কর্তা—গিন্নি মুখ চাওয়া—চাওয়ি করতে লাগলেন।

লোকটা একটু হেসে বললেন, আরে লজ্জা কীসের? চেয়ে ফেল, চেয়ে ফেল, আমার আর বিশেষ সময় নেই।

গিন্নি ধরা গলায় বললেন, আমি আর কী চাইব বাবা? স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে থাকতে পারি...

তথাস্তু।

লোহিতাক্ষ করুণ গলায় বললেন, দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজটি...

তথাস্তু।

এই বলে ভগবান উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বললেন, তবে বাপু, আমারও কিছু চাওয়ার আছে। ওই যে কী একটা ওষুধ বানাচ্ছ, ওটা আর বানিও না, একটা দুটো দুরারোগ্য রোগ আছে বলেই মানুষ এখনো ভগবানের ডাক খোঁজ করে। রোগ ভোগ লোপাট হয়ে গেলে সেইটুকুর পাটও উঠে যাবে। তুমি বরং একটা দাদের মলম বা আমাশয়ের ওষুধ বানাও, তাতেই নোবেল পেয়ে যাবে। বুঝেছ?

যে আজ্ঞে। কিন্তু...

আর কিন্তু নয়। এখনই গিয়ে সব ফর্মুলা নষ্ট করে দাওগে। শুভস্য শীঘ্রম।

ওকে যেতে হবে না ঠাকুর, আমিই গিয়ে সব নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসছি। বলে গিন্নিই উঠে গেলেন।

বেঁটে লোকটা একটা বাতাসা মুখে পুরে উঠে পড়ল, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বলল, চলি হে। অনেকটা দূর যেতে হবে। যাওয়ার আগে আসল কথাটা বলে যাই। আমি ভগবান টগবান নই। তবে গ্রহান্তরের মানুষ। পৃথিবীতে অনেকদিন ধরেই আমাদের আনাগোনা। বাঁদর থেকে তোমাদের মানুষ বানিয়েছি আমরাই। বিজ্ঞানে তালিম দিয়েছি, চাকা বানানো থেকে অ্যাটম বোমা তৈরি অবধি সব ব্যাপারেই আমাদের অদৃশ্য হাত ছিল। আর এসব যা দেখালুম তোমায় সবই বুজরুকি বটে, তবে আসল ভগবানও একজন আছেন। কিন্তু তত দূরে তোমাদের ধারণা পৌঁছোয় না বলে এই আমাদেরই তোমরা এতকাল ভগবান ভেবে পুজো আচ্চা করে এসেছ...

লোহিতাক্ষ লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাঁ! তাহলে আমার দ্বিতীয় নোবেলের কী হবে?

তার আমি কী জানি, আমার বর ফলে কিনা তা আমি জানি না।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? ঠিক আছে ফরমুলা আমার মুখস্থ। আমি ক্যানসারের ওষুধ অবার বের করে ফেলব।

লোকটা মাথা নাড়ল, না, বের করবে না। বের করলে কী হবে জানো?

কী হবে?

তুমি যে রোজ চুষিকাঠি ছাড়া ঘুমোতে পারো না সে কথা সবাইকে জানিয়ে দেব।

কথাটা ঠিক। লোহিতাক্ষ এতবড় বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা ছেলের মতো একটা স্বভাব আছে তাঁর। এখনও চুষিকাঠি ছাড়া তিনি ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু সে কথা বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানে না।

লোহিতাক্ষ স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললেন, যে আজ্ঞে।

লোক দুটো বেরিয়ে গেল।

রামবাবু এবং কানাই কুণ্ডু

রামবাবুর খুব সর্দি হয়েছিল। বন্ধু শ্যাম কবিরাজ তাঁকে এক পুরিয়া কবরেজি নস্যি দিয়ে বললেন, শোওয়ার আগে এক টিপ টেনে শুয়ে পড়ো।

তাই করলেন রামবাবু। ঘুম ভেঙে উঠে সকালে বেশ ঝরঝরে লাগল শরীরটা।

সকালবেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে রামবাবু আয়নায় আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর বাঁ গালে একটা কালো এবং বড় জরুল দেখা দিয়েছে। প্রথমটায় ভেবেছিলেন কালির দাগ। আঙুল দিয়ে ঘষে দেখলেন, তা নয়, জরুলই। তবে আচমকা গালে একটা জরুল দেখে রামবাবুর যতটা বিরক্ত বা বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল ততটা হলেন না। কারণ, জরুলটা তাঁর ফর্সা গালে মানিয়েছে ভালো।

ফর্সা! রামবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে আবার একবার থমকালেন, ফর্সা? তিনি তো কস্মিনকালেও ফর্সা নন। বেশ কালোই তাঁর গায়ের রং। তাহলে এরকম ধপধপে ফর্সাই বা তাঁকে লাগছে কেন এখন? রামবাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফুটফুটে আলোয় হাত আয়না দিয়ে মুখখানা দেখলেন। নাঃ, দারুণ ফর্সাই তো তিনি! লোকে যে এতকাল কেন তাঁকে কালো বলে বদনাম দিয়ে এসেছে!

যাকগে, রামবাবু আজ বেশ খোশমেজাজেই দাড়ি কামিয়ে চান সেরে নিলেন। মাথা জোড়া টাক বলে রামবাবুকে চুল আঁচড়ানোর বিশেষ ঝক্কি পোয়াতে হয় না। ঘাড় আর জুলপি আঁচড়ে নিলেই চলে।

কিন্তু আজ রামবাবু চুল সামলাতে একেবারে হিমশিম খেয়ে গেলেন। মাথা ভর্তি কালো কুচকুচে এবং ঢেউ খেলানো চুল যে কোথা থেকে এল তা রামবাবু হদিশ করতে পারলেন না। কিন্তু অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো ফুরসত হাতে নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই রামবাবু একটা হাঁক মারলেন, গিন্নি, খেতে দাও। তারপর চটপট পোশাক পরে ফেললেন।

তাঁর গিন্নি বেশ মোটাসোটা, একটু থপথপে, গম্ভীর প্রকৃতির। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি রামবাবুর দিকে তাঁর গম্ভীর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আপনি বাইরের ঘরে গিয়ে বসুন। উনি বাথরুমে গেছেন।

এটা কি রকম রসিকতা তা রামবাবু বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর গিন্নি খুব রসিক প্রকৃতির মানুষও নন।

রামবাবুকে খুব একটা বোকা বলা যায় না। তিনি একটু ভাবলেন এবং ফের বড় আয়নায় ভালো করে নিজেকে দেখলেন। বছর পঁচিশেক বয়সের বেশ কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারাবিশিষ্ট এই লোকটা যে তিনি নন তা টের পেতে আর এক লহমাও দেরি হল না তাঁর। প্রথমটায় একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও শেষ

অবধি খুশিই হলেন রামবাবু। টাকওলা, কালো এবং নাদুসনুদুস চেহারার যে মানুষটা তিনি ছিলেন তাকে তাঁর বিশেষ পছন্দ ছিল না।

রামবাবু এটাও বুঝলেন যে, এ বাড়িতে আর অবস্থান করা ঠিক হবে না। তিনি আর যেই হোন রামবাবু নন।

সুতরাং রামবাবু সদর খুলে গটগট করে বেরিয়ে পড়লেন।

সমস্যা হল তিনি যে রামবাবু নন এটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু তাহলে তিনি কে? এই নতুন চেহারার লোকটার তো একটা কোনো পরিচয় আছে? গোবর্ধন, রাজবল্লভ, বগলাপতি বা যাই হোক একটা নাম এবং পাল, সিংহ, ভট্টাচার্য যা হোক একটা পদবি তো তাঁর থাকা উচিত।

বড় রাস্তায় পড়ার আগে দেখলেন গলির মোড়ে রক—এ বসে ছেলেরা আড্ডা মারছে। তাঁরই ছেলের বন্ধুরা সব।

রামবাবু যখন তাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ তারা কথাবার্তা বন্ধ করে তাঁর দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ফিসফাস করতে শুরু করল, ওরে, ওই দ্যাখ কানাই কুণ্ডু যাচ্ছে।

কানাই কুণ্ডু! রামবাবু একটু চমকালেন, কানাই কুণ্ডু মানে কী? মোহনবাগানের সেই বিখ্যাত খেলোয়াড়টি নাকি? না, তার খেলা রামবাবু কখনো দেখেননি তবে নামটা প্রায়ই শোনেন। দারুন নাকি ভালো খেলে। রোজই একটা দুটো করে গোল দেয় বিপক্ষ দলকে। তাহলে তিনিই কানাই কুণ্ডু?

রক—এর ছেলেরা হঠাৎ দৌড়ে এসে তাঁকে প্রায় ঘিরে ফেলল।

এই যে কানাইদা; এখানে কোথায় এসেছিলেন?

কানাইদা, আপনি তো বাগবাজারে থাকেন। আপনার ঠিকানাও জানি। ওয়ান বাই সি, বাগবাজার লেন।

কানাইদা, আজ ইস্টবেঙ্গলকে ক গোল দিচ্ছেন?

একটা অটোগ্রাফ দেবেন কানাইদা?

রামবাবু খুব উঁচু দরের হাসি হেসে সবাইকার সঙ্গে একটু আধটু কথা বললেন। এই ফাঁকে নিজের একটু পাবলিসিটিও করে নিলেন। বললেন, এই পাড়ায় রামবাবুর কাছে এসেছিলাম। উনি আমার দাদার মতো।

একটা ছেলে বলে উঠল, ধুস, রামবাবু তো কুমড়ো—পটাশ তার ওপর হাড়—কেপ্পন। একটু ছিটও আছে মাথায়।

রামবাবু আমতা আমতা করে বললেন, তোমরা ওঁকে ঠিক চেনো না। ও রকম সদাশিব লোক হয় না।

যাই হোক, রামবাবু ছেলেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ট্যাকসি ধরলেন।

কোথায় যাবেন তা সঠিক জানেন না। ওয়ান বাই সি বাগবাজার লেন—এ কানাই কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হতে তাঁর ঠিক সাহস হল না। সেখানে আবার কী গুবলেট হয়ে আছে কে জানে!

তবে তিনি এটা জেনে নিয়েছেন যে, ময়দানে আজ মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ আছে। কাজেই ট্যাক্সিটা তিনি ময়দানের কাছে এনে ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়লেন।

আর নেমেই পড়ে গেলেন বিপাকে। কোত্থেকে পিলপিল করে একগাদা লোক ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল।

এই কানাই, খুব ল্যাং মেরে খেলা শিখেছ! অ্যাঁ, সেদিন যে বড় আমাদের হাফ ব্যাকটাকে জখম করেছিলে! আজ তোমার ঠ্যাং খুলে নেব।

কানাইয়ের খুব তেল হয়েছে রে কালু। আয় আজ ওর তেল একটু নিংড়ে নেওয়া যাক।

এই যে কানাইবাবু, বল না প্লেয়ার—কাকে লাথি মারতে আপনার বেশি ভালো লাগে বলুন তো! চোখে ভালো দেখতে পান তো!

ওহে কানাই মস্তান, আজ ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করলে কিন্তু কলজে খেঁচে নেব, বুঝলে।

এই সময়ে কিছু লোক দৌড়ে এসে রামবাবুকে ধরে বলল, এই যে কানাই, আজ এত বড় খেলা, আর তোমার পাত্তাই নেই! চলো চলো, টেন্টে চলো।

রামবাবু বুঝলেন এরা সব ক্লাবের কর্মকর্তা। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কর্তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে টেন্টে ঢুকিয়ে দিলেন।

টেন্টের ভিতরে তখন প্লেয়াররা গম্ভীর মুখে বসে কোচের উপদেশ শুনছে। রামবাবুও শুনতে লাগলেন। তবে কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি জীবনে কখনও ফুটবল খেলেননি। একটু আধটু হাডু—ডু—ডু খেলেছেন, অল্পস্বল্প ডাংগুলি। তার বেশি কিছু নয়।

কোচ রামবাবুকে বললেন, কানাই, তুমি একদম পাংচুয়াল নও। বি সিরিয়াস। সত্যেন তোমাকে বল ঠেললে তুমি ওয়াল পাস খেলবে কালিদাসের সঙ্গে, তারপর ডায়াগোনালি...।

রামবাবু বুঝলেন না। তবে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

দুপুরে বেশ খাওয়া দাওয়া হল। তারপর বিশ্রাম।

তারপর সবাই উঠে বুটটুট পরতে লাগল। রামবাবুর খুব একটা অসুবিধে হল না। আড়চোখে অন্যেরটা দেখে দেখে তিনিও বুট এবং জার্সি পরে ফেললেন।

মাঠে নামতেই রামবাবুর বুক এবং পা কাঁপতে লাগল। চারদিকে গ্যালারি ভর্তি হাজার হাজার লোক বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। রামবাবুর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মাঠে নেমে কী করতে হবে তা তিনি বেবাক ভুলে গেলেন।

তবে একটা ব্যাপার তাঁর জানা আছে। মাঠের শেষে ওই যে জাল লাগানো তিনটে কাঠি ওর মধ্যে বল পাঠানোই হল আসল কাজ।

প্রথম কিছুক্ষণ রামবাবু বেমক্কা ছোটাছুটি করলেন। তারপর পায়ে একবার বল পেয়েই ছুটতে শুরু করলেন প্রাণপণে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে কেউ আটকাতে পারছিল না। রামবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে আরও জোরে ছুটে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে গিয়ে তিন কাঠির সামনে হাজির হলেন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে বলটা পাঠিয়ে দিলেন গোলের ভিতরে।

সমস্ত মাঠ হর্ষধ্বনি আর চিৎকারে ফেটে পড়ল।

রামবাবু এক গাল হাসলেন। একেই বলে খেলা।

কিন্তু চেয়ে দেখলেন তাঁর দলের খেলোয়াড়রা কেমন অদ্ভুত চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। গ্যালারি থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বলছে, ও ব্যাটা ঘুষ খেয়েছে। বের করে দাও মাঠ থেকে।

রামবাবু একটু ভড়কে গেলেন। এবং খানিক বাদে বুঝতে পারলেন, গোল তিনি দিয়েছেন ঠিকই তবে নিজের দলকেই। তাঁর দেওয়া গোলে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে পড়েছে।

কোচ মাঠের মধ্যে ঢুকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, বেরিয়ে এসো!

রামবাবু বেরিয়ে এলেন। আর তারপরই পটাপট কিল চাপড় ঘুঁসি এসে পড়তে লাগল তাঁর ওপর। কে একটা ল্যাংও যেন মারল।

রামবাবু মাটিতে পড়ে চোখ উল্টে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন।

আর তখনই বোঝা গেল, লোকটা রামবাবু। কানাই কুণ্ডু নয়।

আসল কানাই কুণ্ডু মামাবাড়ি গিয়েছিল কাঁঠাল খেতে। সবে ফিরেছে। বুটটুট পরে সে মাঠে নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

পরদিন সকালে যখন দাড়ি কামাতে গেলেন রামবাবু তখন তাঁর কালো গালে জরুল ছিল না। মাথা জোড়া টাক, থলথলে শরীর। তবু রামবাবু নিজেকে দেখে বেশ খুশিই হলেন।

গগন চাকি ও পবন দূত

কুখ্যাত ডাকাত গগন চাকিকে তাড়া করেছে বিখ্যাত পুলিশের গোয়েন্দা সুবল দত্ত। ধরো ধরো অবস্থা। গগনকে ধরতে পারলেই পেল্লায় পুরস্কার, কারণ এযাবৎ গগনকে শত চেষ্টাতেও ধরা যায়নি। তার কারণ, গগন চাকিরও আবার একটি গগন চাকি আছে। অর্থাৎ কি না গগনের গগাড়ি। যেটা এত জোরে ছোটে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যি পুলিশের কোনো গাড়ির নেই। গগন শুধু ডাকাতই নয়, মস্ত বৈজ্ঞানিকও। গোটা নেপচুন গ্রহটা দখল করে সে বিশাল গবেষণাগার বানিয়েছে মাটির তলায়। কেউ এটার ধারে—কাছে যেতে পারে না, এমন এক রশ্মিবর্ম দিয়ে তার চারধারে বলয় তৈরি করা হয়েছে। সরকারি সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ করে গগন সুযোগ বুঝে পৃথিবীতে হানা দেয় এবং ইচ্ছেমতো ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। টাকা—পয়সা অবশ্য সে ছোঁয়ও না, সে ডাকাতি করে রাসায়নিক অতিযন্ত্র বা নতুন কোনো গবেষণালব্ধ জিনিস। সর্বত্র তার চর আছে। তারাই খবর দেয় গগনকে।

নিউ ইয়র্কের বৈজ্ঞানিক রাসেল সাহেব এই তো মাত্র এক সপ্তাহ আগে একজোড়া হাওয়াই চটি আবিষ্কার করে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। হাওয়াই চটি শুনে নাক সিঁটকোবার কিছুই নেই। এ চটি পরে ইচ্ছেমতো শূন্যে উঠে ঘুরে বেড়ানো যায়। দু'আড়াই মিটার শূন্যে যে কোথাও মানুষকে তুলে রাখার ক্ষমতা আছে এই হাওয়াই চপ্পল জোড়ার, প্রায় পাঁচশ বছর ধরে রাসেল সাহেবের নিরলস সাধনার ফলে এই আবিষ্কার। গগন যে এটা চুরি করতে পারে সেই ভয়ে আগে থাকতেই ব্যবস্থা করা ছিল, চারদিকে রোবো পাহারা দিয়েও নানারকম যন্ত্র, রশ্মি, চৌরদ্ধরনিক মোতায়েন। ঘণ্টাখানেক আগে এসব বাধাকে ফাঁকি দিয়ে গগন যে কীভাবে চপ্পল জোড়া বাগিয়ে নিয়ে গেল সেইটে রহস্য। রহস্য অবশ্য তেমন কিছু নয়। গগন এসেছিল তার গগন চাকিতে করে। এই গগন চাকির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা হল, যখন—তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। নিজের শরীরের পরমাণু প্রক্রিয়া বদল করে যে কোনো মনিটরকে ফাঁকি দিতে পারে। আর গগন নিজেও চালাক কম নয়। সে হুবহু রাসেল সাহেবের রূপ ধরে এসে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নিউ ইয়র্কে ইয়র্ক টাওয়ারের দু'শ একান্ন তলার স্ট্রং রুম থেকে জিনিসটা বের করে নিয়ে সেই হাওয়াই চপ্পল পায়ে দিয়েই আকাশে তিনশ গজ দূরে তার গগন চাকিতে চেপে পালাচ্ছিল। সুবল দত্ত তার পুলিশি গাড়ি পবনদূতে বসে পাহারা দিচ্ছিল মাত্র পাঁচশো গজ দূরে। একটা লোককে হন হন করে শূন্যে হাঁটতে দেখেই তার সন্দেহ হয়। চোখে ভেদক দূরবিন লাগাতেই সে রাসেলের ছদ্মবেশের আড়ালে গগনকে চিনতে পারে। তারপরই তাড়া।

কিন্তু তাড়া করলেও একটা বাধা আছে। গগন চাকি হল মহাকাশযান। পৃথিবীর সীমানা ডিঙিয়ে দূর—দূরান্তে চলে যেতে পারে। পবনদূত ততদূর পারবে না। তবে এক—দেড় লক্ষ মাইল অবধি পবনদূত বড়

সাংঘাতিক। নানা ক্ষেপণাস্ত্র ও রশ্মি তো আছেই, পবনের গতিও দুর্দান্ত, এটাও একটা নতুন আবিষ্কার, খুব সম্প্রতি তৈরি হয়েছে।

পবনদূত যে তাকে তাড়া করেছে এটা গগন টের পায়নি, সে নিশ্চিত মনে নেপচুনকে লক্ষ্য করে চড়ে যাচ্ছিল, সুবল দত্ত স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছিল গগনকে। কারণ, গগন চাকির দুর্ভেদ্য শরীরকে ভেদ করছিল সুবলের দূরবিন ভেদক। সুবল দেখল গগন খই আর কলা খাচ্ছে, ডানহাতে ঘাড় চুলকোচ্ছে। খুব নিশ্চিন্ত।

আচমকাই সুবলের কানে ইয়ার ফোনটা একটা গম্ভীর আওয়াজে যেন ফেটে পড়ল, কেরে তুই? অ্যাঁ?

গগনের গলা, সুবল দত্ত দাঁতে দাঁত পিষে, তোমার যম!

গগন হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, তাই নাকি? চোর চোর খেলছিস বুঝি? যা দুধের ছেলে, ঘরে ফিরে যা, নইলে কঠিন অবস্থায় পড়ে যাবি।

আমি ভয় খাই না, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

বটে! বটে! তাহলে আয় তোকে একটু কায়দা দেখাই।

বলেই গগন চাকি হঠাৎ থেমে উল্টোদিকে ধেয়ে আসতে লাগল, সাংঘাতিক কাণ্ড, সোজা তার দিকেই আসছে যে। সুবল দত্ত দু'টো ক্ষেপণাস্ত্র আর একটা রশ্মি ছুড়ল। গগন চাকি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবল দত্ত নিশ্চিন্ত হল না। আঁতি—পাঁতি করে মনিটর খুঁজতে লাগল। পেল না! কিন্তু আচমকাই পেছন থেকে কী যেন তার পবনদূতকে প্রচণ্ড বেগে ঠেলতে শুরু করল।

সুবল চেঁচাল, এই এই! কী হচ্ছে?

গগন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, কেন খোকা ভয় পেলে? দুধের বাছা তুমি, গগনের সঙ্গে পাল্লা নিতে এসেছ?

সুবল দত্ত দেখল, সামনে ঘোর বিপদ। তার পবনদূতের পাল্লা মাত্র দেড় লক্ষ মাইল। তারা ইতিমধ্যেই এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পেরিয়ে এসেছে, দেড় লক্ষ মাইল পেরিয়ে গেলে পবনদূত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। তাকে ফিরিয়ে নেওয়াই হবে কঠিন।

সুবল নানা কায়দায় পবনদূতকে থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু থামা কি সহজ! পিছন থেকে চাকি গগন প্রবল ঠেলায় তাকে নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরে নিয়ে যাবেই। সুবল ঘামছে।

কী খোকা, কেমন লাগছে?

ছেড়ে দিন আমাকে!

কেন, আমাকে ধরবে না?

আজ্ঞে না।

ধরলে যে পেল্লায় পুরস্কার।

আমার পুরস্কার চাই না।

তবে প্রাণটা চাই তো?

যে আজ্ঞে।

হাঃ হাঃ। তবে কান ধরো।

ধরেছি।

বলো আর কখনো এরকম করব না।

বলছি।

হাঃ হাঃ।

পবনদূতের পিছন থেকে চাপটা অদৃশ্য হল। সুবল দত্ত দেখতে পেল, গগন চাকি সামনে দূর—দূরান্তে মহাকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুবল দত্ত পবনদূতের মুখ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, খুব বেঁচে গেছি বাপ!

ইঁদারায় গন্ডগোল

গাঁয়ে একটা মাত্র ভালো জলের ইঁদারা। জল যেমন পরিষ্কার, তেমনি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, আর সেই জল খেলে লোহা পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।

লোহা হজম হওয়ার কথাটা কিন্তু গল্প নয়। রামু বাজিকর সেবার গোবিন্দপুরের হাটে বাজি দেখাচ্ছিল। সে জলজ্যান্ত পেরেক খেয়ে ফেলত, আবার উগরে ফেলত। আসলে কি আর খেত! ছোট ছোট পেরেক মুখে নিয়ে গেলার ভান করে জিভের তলায় কি গালে হাপিশ করে রেখে দিত।

তা রামুর আর সেদিন নেই। বয়স হয়েছে। দাঁত কিছু পড়েছে, কিছু নড়েছে। কয়েকটা দাঁত শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে। তো সেই পড়া, নড়া আর বাঁধানো দাঁতে তার মুখের ভিতর এখন বিস্তর ঠোকাঠুকি, গন্ডগোল। কোনো দাঁতের সঙ্গে কোনো দাঁতের বনে না। খাওয়ার সময়ে মাংসের হাড় মনে করে নিজের বাঁধানো দাঁতও চিবিয়ে ফেলেছিল রামু। সে অন্য ঘটন। থাকগে।

কিন্তু এইরকম গন্ডগোলে মুখ নিয়ে পেরেক খেতে গিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ে গেল সেবার। পেরেক মুখে অভ্যেসমতো এক গ্লাস জল খেয়ে সে বক্তৃতা করছে। ''পেরেক তো পেরেক, ইচ্ছে করলে হাওড়ার ব্রিজও খেয়ে নিতে পারি। সেবার গিয়েওছিলাম খাব বলে। সরকার টের পেয়ে আমাকে ধরে জেলে পোরার উপক্রম। তাই পালিয়ে বাঁচি।''

বক্তৃতা করার পর সে আবার যথা নিয়মে ওয়াক তুলে ওগরাতে গিয়ে দেখে, পেরেক মুখে নেই একটাও। বেবাক জিভের তলা আর গালের ফাঁক থেকে সাফ হয়ে জলের সঙ্গে পেটে সেঁদিয়েছে।

টের পেয়েই রামু ভয় খেয়ে চোখ কপালে তুলে যায় আর কী। পেটের মধ্যে আট—দশটা পেরেক! সোজা কথা তো নয়। আধঘণ্টার মধ্যে পেটের ব্যথা, মুখে গাঁজলা, ডাক্তার কবিরাজ এসে দেখে বলল, ''অন্ত্রে ফুটো, পাকস্থলীতে ছ্যাঁদা, খাদ্যনালী লিক, ফুসফুস ফুটো হয়ে বেলুনের মতো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা নেই।''

সেই সময়ে একজন লোক বুদ্ধি করে বলল, ''পুরনো ইঁদারার জল খাওয়াও।''

ঘটিভর সেই জল খেয়ে রামু আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই লোহা হজম হয়ে গেছে।

ইঁদারার জলের খ্যাতি এমনিতেই ছিল, এই ঘটনার পর আরও বাড়ল। বলতে কী, গোবিন্দপুরের লোকের এই ইঁদারার জল খেয়ে কোনো ব্যামোই হয় না।

কিন্তু ইদানীং একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে। ইঁদারায় বালতি বা ঘটি নামালে দড়ি ছিঁড়ে যায়। দড়ি সব সময়ে যে ছেঁড়ে তাও নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বালতির হাতল থেকে দড়ির গিঁট কে যেন সযত্নে খুলে

নিয়েছে। কিছুতেই জল তোলা যায় না। যতবার দড়ি বাঁধা বালতি নামানো হয়, ততবারই এক ব্যাপার।

গাঁয়ের লোকেরা বুড়ো পুরুতমশাইয়ের কাছে গিয়ে পড়ল। "ও ঠাকুরমশাই, বিহিত করুন।"

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, "ভায়ারা দড়ি তো দড়ি, আমি লোহার শেকলে বেঁধে বালতি নামালাম, তো সেটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর দেখি, জলের মধ্যে সব হুলস্থুল কাণ্ড হচ্ছে। দেখেছ কখনও ইঁদারার জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে? কাল সন্ধেবেলায় দেখলাম নিজের চক্ষে। বলি, ও ইঁদারার জল আর কারো খেয়ে কাজ নেই।"

পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হরিহর রায়ের জমিদারি। রায়মশাই বড় ভালো মানুষ। ধর্মভীরু, নিরীহ, লোকের দুঃখ বোঝেন।

গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকেরা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির।

রায়মশাই কাছারিঘরে বসে আছেন। ফর্সা, নাদুস—নুদুস চেহারা।

নায়েবমশাই সামনে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন, "আজ্ঞে, গোবিন্দপুরের লোকেরা সব এসেছে দরবার করতে।"

রায়মশাই মানুষটা নিরীহ হলেও হাঁকডাক বাঘের মতো। রেগে গেলে তাঁর ধারেকাছে কেউ আসতে পারে না। গোবিন্দুপুর গাঁয়ের লোকদের ওপর তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর সেজো ছেলের বিয়ের সময় অন্যান্য গাঁয়ের প্রজারা যখন চাঁদা তুলে মোহর বা গয়না উপহার দিয়েছিল, তখন এই গোবিন্দপুরের নচ্ছার লোকেরা একটা দুধেল গাই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে এক গাল হেসে নতুন বউয়ের হাতে সেই গরু—বাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিল।

সেই থেকে রায়মশাইয়ের রাগ। গরুটা যে খারাপ তা নয়। রায়মশাইয়ের গোয়ালে এখন সেইটেই সব চেয়ে ভালো গরু। দু বেলায় সাত সের দুধ দেয় রোজ। বটের আঠার মতো ঘন আর মিষ্টি সেই দুধেরও তুলনা হয় না। কিন্তু বিয়ের আসরে গরু এনে হাজির করায় চারদিকে সে কী ছিছিক্কার! আজও সেই কথা ভাবলে রায়মশাই লজ্জায় অধোবদন হন। আবার রাগে রক্তবর্ণও হয়ে যান।

সেই গোবিন্দপুরের লোকেরা দরবার করতে এসেছে শুনে রায়মশাই রাগে হুংকার ছেড়ে বলে ওঠেন, "কী চায় ওরা?"

সেই হুংকারে নায়েবমশাই তিন হাত পিছিয়ে গেলেন, প্রজারা আঁতকে উঠে ঘামতে লাগল, স্বয়ং রায়মশাইয়ের নিজের কোমরের কষি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেল।

গোবিন্দপুরের মাতব্বর লোক হলেন পুরুত চক্কোত্তিমশাই। তাঁর গালে সব সময়ে আস্ত একটা হত্তুকি থাকে। আজও ছিল। কিন্তু জমিদারমশাইয়ের হুংকার শুনে একটু ভিরমি খেয়ে ঢোক গিলে সামলে ওঠার পর হঠাৎ টের পেলেন, মুখে হত্তুকিটা নেই। বুঝতে পারলেন, চমকানোর সময়ে সেটা গলায় চলে গিয়েছিল, ঢোক গেলার সময়ে গিয়ে ফেলেছেন।

আস্ত হত্তুকিটা পেটে গিয়ে হজম হবে কি না কে জানে! একটা সময় ছিল, পেটে জাহাজ ঢুকে গেলেও চিন্তা ছিল না! গাঁয়ে ফিরে পুরনো ইঁদারার এক ঘটি জল ঢকঢক করে গিলে ফেললেই জাহাজ ঝাঁজরা। বামন—ভোজনের নেমন্তন্নে গিয়ে সেবার সোনারগাঁয়ে দু বালতি মাছের মুড়ো—দিয়ে—রাঁধা ভাজা সোনামুগের ডাল খেয়েছিলেন, আরেকবার সদিপিসির শ্রাদ্ধপ্রাশনে দেড়খানা পাঁঠার মাংস, জমিদার মশাইয়ের সেজো ছেলের বিয়েতে আশি টুকরো পোনা মাছ, দু হাঁড়ি দই আর দু সের রসগোল্লা। গোবিন্দপুরের লোকেরা এমনিতেই খাইয়ে। তারা যেখানে যায়, সেখানকার সব কিছু খেয়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দিয়ে আসে। সেই গোবিন্দপুরের ভোজনপ্রিয় লোকদের মধ্যে চক্কোত্তিমশাই হলেন চ্যাম্পিয়ন। তবে এসব খাওয়াদাওয়ার পিছনে আছে পুরনো ইঁদারার স্বাস্থ্যকর জল। খেয়ে এসে জল খাও। পেট খিদেয় ডাকাডাকি করতে থাকবে।

সেই ইঁদারা নিয়েই বখেরা। চক্কোত্তিমশাই হত্তুকি গিলে ফেলে ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। হত্তুকি এমনিতে বড় ভালো জিনিস। কিন্তু আস্ত হত্তুকি কী পেটে গেলে হজম হবে কি না সেইটেই প্রশ্ন। পুরনো

ইঁদারার জল পাওয়া গেলে হত্তুকি নিয়ে চিন্তা করার প্রশ্নই ছিল না।

চক্কোত্তিমশাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "রাজামশাই, আমাদের গোবিন্দপুর গাঁয়ের পুরনো ইঁদারার জল বড় বিখ্যাত। এতকাল সেই জল খেয়ে কোনো রোগ—বালাই আমরা গাঁয়ে ঢুকতে দিইনি। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, ইঁদারার জল আর আমরা তুলতে পারছি না।"

রায়মশাই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, "হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলের বিয়েতে যে বড় গরু দিয়ে আমাকে অপমান করেছিলে?"

চক্কোত্তিমশাই জিভ কেটে বললেন, "ছি ছি, আপনাকে অপমান রাজামশাই? সেরকম চিন্তা আমাদের মরণকালেও হবে না। তাছাড়া ব্রাহ্মণকে গো—দান করলে পাপ হয় বলে কোনো শাস্ত্রে নেই। গো—দান মহা পুণ্য কর্ম।"

রায়মশায়ের নতুন সভাপণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে বললেন, "কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।"

রায়মশাই একটু নরম হয়ে বললেন, "ইঁদারার কথা আমিও শুনেছি। সেবার গোবিন্দপুর থেকে পুরনো ইঁদারার জল আনিয়ে আমাকে খাওয়ানো হয়। খুব উপকার পেয়েছিলাম। তা সে ইঁদারা কি শুকিয়ে গেছে নাকি?"

চক্কোত্তিমশাই ট্যাঁক থেকে আর একটা হত্তুকি বের করে লুকিয়ে মুখে ফেলে বললেন, "আজ্ঞে না। তাতে এখনো কাকচক্ষু জল টলমল করছে। কিন্তু সে জল হাতের কাছে থেকেও আমাদের নাগালের বাইরে। দড়ি বেঁধে ঘটি বালতি যা—ই নামানো যায়, তা আর ওঠানো যায় না। দড়ি কে যেন কেটে নেয়, ছিঁড়ে দেয়। লোহার শিকলও কেটে দিয়েছে।"

রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, "কার এত সাহস?"

এবার হুংকার শুনে গোবিন্দপুরের লোকেরা খুশি হল। নড়ে চড়ে বসল। মাথার উপর জমিদারবাহাদুর থাকতে ইঁদারার জল বেহাত হবে, এ কেমন কথা!

ঠাকুরমশাই বললেন, "আজ্ঞে মানুষের কাজ নয়। এত বুকের পাটা কারো নেই। গোবিন্দপুরের লেঠেলদের কে না চেনে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মাথার ওপর আপনিও রয়েছেন। লেঠেলদের এলেমে না কুলোলে আপনি শাসন করবেন; কিন্তু এ কাজ যারা করছেন তাঁরা মানুষ নন। অশরীরী।"

গোদের উপর বিষফোঁড়ার উপমা শুনে একটু রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশরীরীর কথা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে কানে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন রায়মশাই, "ওরে, বলিস না, বলিস না।"

সবাই তাজ্জব।

নায়েবমশাই রোষকষায়িত লোচনে গোবিন্দপুরের প্রজাদের দিকে চেয়ে বললেন, "মুখ সামলে কথা বলো।"

চক্কোত্তিমশাই ভয়ের চোটে দ্বিতীয় হত্তুকিটাও গিলে ফেলতে ফেলতে অতি কষ্টে সামাল দিলেন।

রায়মশাইয়ের বড় ভূতের ভয়। পারতপক্ষে তিনি ও নাম মুখেও আনেন না। শোনেনও না। কিন্তু কৌতূহলেরও তো শেষ নেই। খানিকক্ষণ কান হাতে চেপে রেখে খুব আস্তে একটুখানি চাপা খুলে বললেন, "কী যেন বলছিলি?"

চক্কোত্তিমশাই উৎসাহ পেয়ে বলেন, "আজ্ঞে সে এক অশরীরী কাণ্ড। ভূ—"

"বলিস না! খবর্দার বলছি, বলবি না!' রায়বাবু আবার কানে হাতচাপা দেন।

চক্কোত্তিমশাই বোকার মতো চারদিকে চান। সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। নায়েবমশাই 'চোপ' বলে একটা প্রচণ্ড ধমক মারেন।

একটু বাদে রায়বাবু আবার কান থেকে হাতটা একটু সরিয়ে বলেন, "ইঁদারার জলে কী যেন?"

চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ভয়ে ভয়েই বলেন, "আজ্ঞে সে এক সাংঘাতিক ভূতুড়ে ব্যাপার!"

"চুপ কর, চুপ কর! রাম রাম রাম রাম!"

বলে আবার রায়বাবু কানে হাত। খানিক পরে আবার তিনি বড় বড় চোখ করে চেয়ে বলেন, "রেখে ঢেকে বল।"

"আজ্ঞে, বালতি—ঘটির সব দড়ি তেনারা কেটে নেন? শেকল পর্যন্ত ছেঁড়েন, তাছাড়া ইঁদারার মধ্যে হাওয়া বয় না, বাতাস দেয় না, তবু তালগাছের মতো ঢেউ দেয়, জল হিলিবিলি করে ফাঁপে।"

"বাবা রে!" বলে রায়বাবু চোখ বুজে ফেলেন।

ক্রমে—ক্রমে অবশ্য সবটাই রায়বাবু শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দিনটাই মাটি করলি তোরা। নায়েবমশাই, আজ রাতে আমার শোবার ঘরে চারজন দারোয়ান মোতায়েন রাখবেন।"

"যে আজ্ঞে।"

গোবিন্দপুরের প্রজারা হাতজোড় করে বলল, "হুজুর আপনার ব্যবস্থা তো দারোয়ান দিয়ে করালেন, এবার আমাদের ইঁদারার একটা বিলিব্যবস্থা করুন।"

"ইঁদারা বুজিয়ে ফ্যাল গে। ও ইঁদারা আর রাখা ঠিক নয়। দরকার হলে আমি ইঁদারা বোজানোর জন্য গো—গাড়ি করে ভালো মাটি পাঠিয়ে দেব'খন।"

তখন শুধু গোবিন্দপুরের প্রজারাই নয়, কাছারিঘরের সব প্রজাই হাঁ—হাঁ করে উঠে বলে, "তা হয় না হুজুর, সেই ইঁদারার জল আমাদের কাছে ধন্বন্তরী। তা ছাড়া জল তো নষ্টও হয়নি, পোকাও লাগেনি, কয়েকটা ভূত—"

রায়বাবু হুংকার দিলেন, "চুপ! ও নাম মুখে আনবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব।"

সবাই চুপ মেরে যায়। রায়বাবু বাজার মুখে কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচার্য মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "এ তো লেঠেলদের কর্ম নয়, একবার যাবেন নাকি সেখানে?"

রায়মশাইয়ের আগের সভাপণ্ডিত মুকুন্দ শর্মা একশ বছর পার করে এখনো বেঁচে আছেন। তবে একটু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভারি ভুলো মন আর দিনরাত খাই—খাই। তাঁকে দিয়ে কাজ হয় না। তাই নতুন সভাপণ্ডিত রাখা হয়েছে কেশব ভট্টাচার্যকে।

কেশব এই অঞ্চলের লোক নন। কাশী থেকে রায়মশাই তাঁকে আনিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতা বা পাণ্ডিত্য কতদূর তার পরীক্ষা এখনো হয়নি। তবে লোকটিকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। চেহারাখানা বিশাল তো বটেই গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল—তা সেও বেশি কথা নয়। তবে মুখের দিকে চাইলে বোঝা যায় চেহারার চেয়েও বেশি কিছু এঁর আছে। সেটা হল চরিত্র।

জমিদারের কথা শুনে কেশব একটু হাসলেন।

পরদিন সকালেই গো—গাড়ি চেপে কেশব রওনা হয়ে গেলেন গোবিন্দপুর। পিছনে পায়ে হেঁটে গোবিন্দপুরের শ দুই লোক।

দুপুর পেরিয়ে গাঁয়ে ঢুকে কেশব মোড়লের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে ইঁদারার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে গোবিন্দপুর আর আশপাশের গাঁয়ের হাজার—হাজার লোক।

ভারি সুন্দর একটা জায়গায় ইঁদারাটি খোঁড়া হয়েছিল। চারদিকে কলকে ফুল আর ঝুমকো জবার কুঞ্জবন, একটা বিশাল পিপুল গাছ ছায়া দিচ্ছে। ইঁদারার চারধারে বড় বড় ঘাসের বন। পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।

কেশব আস্তে আস্তে ইঁদারার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা গম্ভীর। সামান্য ঝুঁকে জলের দিকে চাইলেন। সত্যিই কাকচক্ষু জল। টলটল করছে। কেশব আস্তে করে বললেন, "কে আছিস! উঠে আয়, নইলে থুথু ফেলব।"

এই কথায় কী হল কে জানে। ইঁদারার মধ্যে হঠাৎ হুলুস্থুল পড়ে গেল। প্রকাণ্ড—প্রকাণ্ড ঢেউ দিয়ে জল ইঁদারার কানা পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ—বোঁ বাতাসের শব্দ।

লোকজন এই কাণ্ড দেখে দৌড়ে পালাচ্ছে। শুধু চক্কোত্তিমশাই ভয়ে কাঁপতে—কাঁপতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

"থুথু ফেলবেন না, থুথু ফেলবেন না" বলতে বলতে ইঁদারা থেকে শয়ে শয়ে ভূত বেরোতে থাকে। চেহারা দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। রোগা লিকলিকে কালো—কালো সব চেহারা, তাও রক্তমাংসের নয়—ধোঁয়াটে জিনিস দিয়ে তৈরি। সবকটার গা ভিজে সপসপ করছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে।

কেশব তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঢুকেছিলি কেন এখানে?"

"আজ্ঞে ভূতের সংখ্যা বড্ডই কমে যাচ্ছে যে! এই ইঁদারার জল খেয়ে এ তল্লাটের লোকের রোগ—বালাই নেই। একশো দেড়শো বছর হেসে খেলে বাঁচে! না মলে ভূত হয় কেমন করে? তাই ভাবলুম, ইঁদারাটা দখল করে থাকি।"

বলে ভূতেরা মাথা চুলকোয়।

কেশব বললেন, "অতি কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।"

ভূতেরা আশকারা পেয়ে বলে, "ওই যে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁরই বয়স একশো বিশ বছর। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন ওঁকে।"

কেশব অবাক চোখে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, "বলে কী এরা মশাই? সত্যি নাকি?"

একহাতে ধরা পৈতে, অন্য হাতের আঙুলে গায়ত্রী জপ কড়ে ধরে রেখে চক্কোত্তি আমতা—আমতা করে বলেন, "ঠিক স্মরণ নেই।"

"কূট প্রশ্ন। কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।" কেশব বললেন।

ঠিক এই সময়ে চক্কোত্তির মাথায়ও ভারি কূট একটা কথা এল। তিনি ফস করে বললেন, "ভূতেরা কি মরে?"

কেশব চিন্তিতভাবে বললেন, "সেটাও কূট প্রশ্ন।"

চক্কোত্তি সঙ্গে—সঙ্গে বললেন, "কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। ভূত যদি না—ই মরে, তবে সেটাও ভালো দেখায় না। স্বয়ং মাইকেল বলে গেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?"

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলে উঠল, "তা সে আমরা কী করব?" আমাদের হার্ট ফেল হয় না, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ হয় না—তাহলে মরব কীসে! দোষটা কি আমাদের?"

চক্কোত্তি সাহসে ভর করে বলেন, "তা হলে দোষ তো আমাদেরও নয় বাবা সকল।"

কেশব বললেন, "অতি কূট প্রশ্ন।"

চক্কোত্তি বলে উঠলেন, "কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।"

শ পাঁচেক ছন্নছাড়া বিদঘুটে ভেজা ভূত চারদিকে দাঁড়িয়ে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কেশবের দিকে তাকিয়ে আছে। কী রায় দেন কেশব!

একটা বুড়ো ভূত কেঁদে বলল, "ঠাকুরমশাই, জলে ভেজানো ভাত যেমন পান্তা ভাত, তেমনি দিন রাত জলের মধ্যে থেকে আমরা পান্তোা ভূত হয়ে গেছি। ভূতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এত কষ্ট করলুম, সে—কষ্ট বৃথা যেতে দেবেন না।"

"এও অতি কূট প্রশ্ন।" কেশব বললেন।

চক্কোত্তিমশাই এবার আর 'আপাতগ্রাহ্য' বললেন না। সাহসে ভর করে বললেন, "তাহলে ভূতেরও মৃত্যুর নিদান থাকা চাই। না যদি হয় তবে আমিও ইঁদারার মধ্যে থুথু ফেলব। আর তারই বা কী দরকার। এক্ষুণি আমি এই সব ভূত বাবা সকলের গায়েই থুথু ফেলছি।"

চক্কোত্তিমশাই বুঝে গেছেন, থুথুকে ভূতদের ভারি ভয়। বলার সঙ্গে—সঙ্গে ভূতেরা আঁতকে উঠে দশ হাত পিছিয়ে চেঁচাতে থাকে, "থুথু ফেলবেন না! থুথু দেবেন না!"

কেশব চক্কোত্তিমশাইকে এক হাতে ঠেকিয়ে রেখে ভূতদের দিকে ফিরে বললেন, চক্কোত্তিমশাই যে কূট প্রশ্ন তুলেছেন, তা আপাতগ্রাহ্যও বটে। আবার তোমাদের কথাও ফেলনা নয়। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ভূত কখনো মরে না। সুতরাং ভূত খরচ হয় না, কেবল জমা হয়। অন্যদিকে মানুষ দুশো বছর বাঁচলেও একদিন মরে। সুতরাং মানুষ খরচ হয়। তাই তোমাদের যুক্তি টেঁকে না।''

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলতে থাকে, 'আজ্ঞে অনেক কষ্ট করেছি!''

কেশব দৃঢ় স্বরে বললেন, ''তা হয় না। ঘটি বাটি যা সব কুয়োর জলে ডুবেছে, সমস্ত তুলে দাও, তারপর ইঁদারা ছাড়ো। নইলে চক্কোত্তিমশাই আর আমি দুজনে মিলে থু—''

আর বলতে হল না। ঝপাঝপ ভূতেরা ইঁদারায় লাফিয়ে নেমে ঠনাঠন ঘটি—বালতি তুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটি বালতির পাহাড় জমে গেল। ইঁদারার চারপাশে।

পুরনো ইঁদারায় এরপর ভূতের আস্তানা রইল না। ভেজা ভূতেরা গোবিন্দপুরের মাঠে রোদে পড়ে থেকে থেকে ক'দিন ধরে গায়ের জল শুকিয়ে নিল। শুকিয়ে আরও চিমড়ে মেরে গেল। এত রোগা হয়ে গেল তারা যে, গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও আর তাদের দেখে ভয় পেত না।

শক্তি পরীক্ষা

রামরিখ পালোয়ান রাজবাড়ি চলেছে। সেখানে আজ বিরাট শক্তি পরীক্ষা। নানা দেশ থেকে বহু পালোয়ান জড়ো হবে। তারপর কার কত শক্তি তার পরীক্ষা দিতে হবে। কুস্তি—টুস্তি নয়, শুধু যতটা পারে নিজের শক্তি দেখাবে, তা যে যেভাবে পারে।

রামরিখ ভেবেচিন্তে একটা পাঁচ মণ ওজনের লোহার গদা নিয়েছে। এইটা সে বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। গদাটা একটা গরুর গাড়িতে করে পিছনে আসছে।

রামরিখ আজ ধুতি পরেছে। গায়ে রঙিন জামা, মাথায় পাগড়ি। মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিতে দিতে নাগরা জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছে। মনে একটা স্ফূর্তি। তার ধারণা, আজকের পরীক্ষায় সেই আসর মাত করে আসবে। ওস্তাদকে একশ' মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজবাড়ি আর বেশি দূরে নয়। দু'খানা গ্রাম পেরলেই শহর। শহরের মাঝখানে মস্ত রাজবাড়ি। চারদিকে বিশাল অঙ্গন। আজ হাজার হাজার মানুষ পালোয়ানদের দেখতে আসবে।

সামনেই একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। গরুর গাড়িতে একটা বড়—সড় চেহারার লোক বসে বসে ঢুলছে। রামরিখ দেখতে পেল গরুর গাড়িটা রাস্তায় একটা খাদে পড়ে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আটকে গেছে। বলদ দু'টো টেনে তুলতে পারছে না। যে লোকটা ঢুলছিল সে একটু বিরক্ত হয়ে নেমে পড়ল। মালকোঁচা মারছে। রামরিখ কাঁধ দিয়ে একটা চাড় মেরে গরুর গাড়িটা খাদ থেকে তুলে নিয়ে বলল, সামান্য কাজ।

মোটাসোটা লোকটা তার দিকে চেয়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, পালোয়ান নাকি তুমি?

ওই সামান্য কিছু চর্চা করি আর কী।

বেশ, বেশ, বলে লোকটা একটু হাসল, তা তোমার জিনিসপত্র কই?

ওই যে গরুর গাড়িতে। পাঁচ মণ ওজনের গদা।

লোকটি অবাক হয়ে বলে, পাঁচ মণ? যাঃ!

কথা কইতে কইতে পিছনের গরুর গাড়িটার কাছে চলে এলে। রামরিখ গদাটা দেখিয়ে বলল, ওই যে।

লোকটা গদাটা দেখে বলল, এটা ফাঁপা জিনিস নয় তো?

রামরিখ হেসে বলল, আরে না, নিরেট লোহার গদা।

হতেই পারে না। বলে লোকটা গদাটা তুলে নিয়ে হাতে নাচিয়ে একটু দেখে নিয়ে হঠাৎ নিজের হাঁটুটা তুলে গদাটা তার ওপর রেখে দু'হাতের চাড় দিয়ে মচাৎ করে গদাটা দু—আধখানা করে ভেঙে ফেলল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, নাঃ, নিরেট জিনিসই বটে হে।

রামরিখ হাঁ করে চেয়ে রইল। লোহার গদা কেউ ভাঙতে পারে এ তার জানা ছিল না।

লোকটা মুখে একটু দুঃখপ্রকাশ করে বলল, সামনের গাঁয়েই কামারশালা আছে, জুড়ে নিও ভাই। অসাবধানে তোমার খেলনাটা ভেঙে ফেলেছি। বলে লোকটা চলে গেল।

রামরিখ গদাটা কামারশালায় জুড়ে নিতে গাঁয়ে ঢুকল। একটু চিন্তিত। মনে আর তত স্ফূর্তি নেই।

কামার ভীষণ ব্যস্ত। বলল, আমার যে গদা জোড়া দেওয়ার সময় নেই। রামরিখ করুণ গলায় বলল, ভাই, আমি যে রাজবাড়ির শক্তি পরীক্ষায় যাচ্ছি। সময় নেই, একটু করে দাও ভাই।

কামার খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় তোমার গদা?

এই যে! বলে গদার টুকরো দু'টো দু'হাতে তুলে বলল, এইটুকু গদা! বলে কামারশালার আর এক কোণে অন্তত একশ হাত দূরে যেখানে তার ছোট ছেলেটা কাজ করছিল সেদিকে ছুড়ে দিতে দিতে বলল, ওরে বিশে এ—দু'টো টুকরো জুড়ে দে তো।

বিশে একটা টুকরো বাঁ হাতে, অন্যটা ডান হাতে লুফে নিয়ে বলল, দিই বাবা।

রামরিখ অধোবদন হয়ে বসে রইল। গদা জুড়ে নিয়ে রামরিখ ফের যখন রওনা হল তখন তার পা চলছে না। মনটা বড়ই খারাপ।

আর একটা গাঁ পেরোলেই শহর। রাস্তার পাশে কতগুলো ছেলে ডাংগুলি খেলছিল। কী কারণে তাদের মধ্যে একটু বিবাদ হয়েছে। হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে এসে বলল, মশাই, আপনার ডান্ডাটা একটু ধার দেবেন? আমরা এই পাটিটা খেলেই দিয়ে দেব। আমাদের ডান্ডাটা ভেঙে গেল কি না এই মাত্র।

বলেই ছেলেটা গদাটা গরুর গাড়ির ওপর থেকে তুলে নিয়েই ছুট। রামরিখ দাঁড়িয়ে দেখল, ছেলেটা তার গদা দিয়ে গুটি তুলল, তারপর সেই গুটি সত্তর হাত দূরে পাঠাল। গদা দিয়ে একহাতে দূরত্বটা মাপল। তারপর দৌড়ে এসে ফের গরুর গাড়িতে গদাটা রেখে ছুটে গেল।

রামরিখ আর এগোল না। গরুর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফেরত যেতে লাগল।

ঢেকুর

প্রায় চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা দারুব্রহ্মবাবুকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। একে তো এত বড় বাড়ি কেনার খদ্দের নেই, তার ওপর যদি বা খদ্দের জোটে তারা ভালো দাম দিতে চায় না। বলে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে ও বাড়ি কিনে হবেটা কী? কথাটা সত্যি। তবে বহুকাল আগে এ গ্রাম ছিল পুরোদস্তুর একখানা শহর। এই বাড়িতে দারুব্রহ্মের যে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ বাস করতেন তিনিই ছিলেন এই অঞ্চলের রাজা। তখনকার আস্তাবল, দ্বাদশ শিবের মন্দির, পদ্মদিঘি, দেওয়ান—ই—আম, দেওয়ান ই—খাস, নহবতখানা, শিশমহল সবই এখনো ভগ্নদশায় আছে। ফটকের দু'ধারে মরচে—পড়া দু'টো কামানও পাওয়া গেছে।

দারুব্রহ্মের অবস্থা খুবই খারাপ। এবেলা ভাত জুটলে ওবেলা খুদও জুটতে চায় না। নিজে বিয়ে করেনি। বাপের একমাত্র সন্তান। বাপ গত হয়েছেন, সুতরাং বুড়ি মা আর তাঁর দুমুঠো জুটে যাওয়ার কথা, কিন্তু বংশের নিয়ম মানতে হয় বলে এক পাল অপোপগু নিষ্কর্মা আত্মীয়—স্বজনকে ঠাঁই দিতে হয়েছে। তারা দিন—রাত চেঁচামেচি করে মাথা ধরিয়ে দেয়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সের দারুব্রহ্মের চুল পাকতে লেগেছে, আশা—ভরসা গেছে। বুড়ি—মা বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে রেখেছেন। কিন্তু মেয়ের বাপ এই হাড়—হাভাতের হাতে মেয়ে দিতে রাজি নন। অপমানটা খুব লেগেছে দারুব্রহ্মের। বাড়ি কেনার খদ্দের জুটে যাওয়ায় খানিকটা নিশ্চিন্ত। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পেলে মায়ে—পোয়ে কাশীবাসী হবে, ঠিক করেই রেখেছে।

শেষবার চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা ঘুরে—ঘুরে দেখছিল দারুব্রহ্ম। ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ সত্যব্রহ্ম ছিলেন দারুণ মেজাজি। একটা মশা সেবার তাঁর নাকে হুল ফোটানোয় রেগে গিয়ে তিনি মশা মারতে কামান দাগার হুকুম দেন। কিন্তু তোপদার এসে খবর দিল, কামানের মশলা নেই। সত্যব্রহ্ম তখন বলেন, কুছ পরোয়া নেই। বন্দুক আনো। শোনা যায়, কম—সে—কম শতখানেক গুলি চালানোর পর মশাটা বাস্তবিকই মরেছিল। এখনো দরবার ঘরের দেয়ালে সেইসব গুলির জখম রয়েছে। দারুব্রহ্ম সেগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে একটা দুটো তিনটে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফেলল।

ঊর্ধ্বতন নবম পুরুষ পূর্ণব্রহ্মের খুব শিকারের শখ ছিল। তাই বলে জঙ্গলে—টঙ্গলে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বা মাচানে বসে শিকার করতেন না। খুব আমুদে অলস লোক। দোতলা থেকে নিচে নামতে হলেই গায়ে জ্বর আসত। তিনি দোতলায় একটা আলাদা ছাদ তৈরি করে মাটি ফেলে জঙ্গল বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা শেকলে—বাঁধা বাঘ থাকত। তিনি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বাঘের দেখা পেলেই গুলি করতেন। আর বাঘটাও লুটিয়ে পড়ত। অবশ্য সবাই জানত বন্দুকে ভরা গুলিটা আসলে ফাঁকা গুলি।

আর বাঘটা ছিল পোষা। সেই এক বাঘই কত বাঘের মরণ মরেছে। দোতলায় উঠে দারুব্রহ্ম সেই জঙ্গলের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে।

ঊর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ কৃষ্ণব্রহ্ম ছিলেন পালোয়ান। দু'হাতে দু'মণ ওজনের দুটো মুগুর ঘুরিয়ে রোজ দু'বেলা ব্যায়াম করতেন। সেই মুগুর দুটো দোতলার সিঁড়ির মুখেই রাখা। দারুব্রহ্ম মায়াভরে সে দুটোকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ।

তিনতলার সব ঘর বহুকাল হল তালাবন্ধ। ছাদ ফেটেছে, জানালার শিক আছে তো পাল্লা নেই। পাল্লা থাকলে শিক নেই। বাদুড় চামচিকের বাসা। যত রাজ্যের পুরনো জিনিসের আবর্জনা ডাঁই করে রাখা। শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নেওয়ার জন্য দারুব্রহ্ম তালা খুলে ঢুকে পড়ল। কাঠের সিন্দুক, দেয়াল আলমারি, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন, পুরনো নাগরা, ভাঙা খাট, কত কী চারদিকে ছড়ানো।

কাঠের সিন্দুক খুলে এটা—সেটা নাড়াচাড়া করছিল দারুব্রহ্ম আর এটা—সেটা ভাবছিল। এমন সময় হাত ফসকে কী একটা যেন মেঝেয় পড়ে গেল। একটু চমকে উঠল দারুব্রহ্ম। চমকাবারই কথা। জিনিসটা পড়ার সঙ্গে—সঙ্গেই একটা ঝলকানি আর সেই সঙ্গে খানিক ধোঁয়া বেরোল। দারুব্রহ্ম জিনিসটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখে, সেটা একটা প্রদীপ। প্রদীপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছে, চোখে পড়ল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা সামনেই পাকিয়ে পাকিয়ে একটা লম্বা রোগা সুঁটকো লোকের চেহারা নিচ্ছে।

"কে রে?" দারুব্রহ্ম চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা গোটা চারেক হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, "আমি? আমি হচ্ছি প্রদীপের দৈত্য।"

দারুব্রহ্ম হাঁ। ব্যাটা বলে কী? সে বলল, "ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? দিনে—দুপুরে ব্যাটা চুরির মতলবে বাড়িতে ঢুকে বসে আছ।"

লোকটা ভয় খেয়ে বলে, "সত্যি না। অনেককাল কেউ ডাকাডাকি করেনি বলে বেশ হাজার দেড়েক বছর একটানা ঘুমিয়ে এই উঠলাম। চুরি—টুরি কিছু হয়ে থাকলে আমি কিন্তু জানি না।"

দারুব্রহ্ম সাহসী বংশের লোক। সহজে ভয় খায় না। তবে সে বুঝল, লোকটা গুল দিচ্ছে না। প্রদীপটাও আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হতে পারে। তার বংশের অনেকেরই নানা বিদঘুটে জিনিস সংগ্রহের বাতিক ছিল। সে বলল, "বটে? তা তোর কাজটা কী?"

আবার গোটা কয়েক হাই তুলে বিশুদ্ধ বাংলাতেই লোকটা বিরস মুখে বলল, "আমার আবার কাজ কী? দেড় হাজার বছর পরে ঝুটমুট কাঁচা ঘুমটা ভাঙালেন, এখন যা করতে বলবেন তাই করতে হবে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, প্রথমেই শক্ত কাজ দেবেন না, আমরা এখনো ঘুমের রেশ কাটেনি। গা ম্যাজ—ম্যাজ করছে।"

দারুব্রহ্ম বুঝল, এ ব্যাটা আলাদীনের সেই দৈত্যই বটে, তবে ফাঁকি মারার তাল করছে। সে বলল, "বাপু হে, অত রোয়াব দেখালে কি চলে? বরাবর অনেক বড়—বড় কাজ করে এসেছ, সব খবর রাখি। এখন পিছোলে চলবে কেন?"

লোকটা ব্যাজার হয়ে বলে, "সে করেছি, কিন্তু বহুকাল অভ্যাস নেই কিনা। তাছাড়া ঘুমোলে হবে কী, খাওয়া তো আর জোটেনি। দেড় হাজার বছর টানা উপোস। শরীরটা দেখুন না কেমন শুকিয়ে গেছে। আগে বরং কিছু খাবার—দাবার দিন।"

"তারপর?"

"তারপর যা বলবেন একটু—আধটু করে দেব।"

দারুব্রহ্ম লোক খারাপ নয়। দৈত্যটার সুড়ুঙ্গে চেহারা দেখে তার কষ্টও হল। বলল, "চলো, দেখি মুড়িটুড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা।" বলে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নামল দারুব্রহ্ম। বাড়ির কেউই লোকটাকে দেখে তেমন গা করল না। গা করার মতো কিছু নেই। দারুব্রহ্ম তাকে নিজের ঘরে নিয়ে ধামা ভরে মুড়ি আর

বাতাসা খাওয়াল। সব—শেষে দেড় ঘটি জল খেয়ে লোকটা বলল, "এ যা খাওয়ালেন এতে তো একটা ঢেকুরও উঠবে না। যাকগে, ওবেলা কী রান্না হবে?"

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, "একদিন এ বাড়ির অতিথিরা মাংস—পোলাও খেয়ে একটা করে মোহর দক্ষিণা নিয়ে যেত। সেদিন তো আর নেই। ওবেলা যদি হাঁড়ি চড়ে তবে দুটো ডাল—ভাত জুটতে পারে।"

লোকটা মন খারাপ করে বলল, "ডাল—ভাত। ছোঃ।"

দারুব্রহ্ম হেসে ফেলে বলল,"তুমি দেখি উলটো—কথা বলতে লেগেছ। প্রদীপের দৈত্যই কোথায় খাবার—দাবার জোগাড় করে আনবে, তা না তুমিই উলটে চাইতে লাগলে।"

লোকটা জবাব দিল না। ধোঁয়া হয়ে প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে দারুব্রহ্ম প্রদীপটা ঠুকে আবার দৈত্যটাকে জাগায়। দৈত্যটা চারজনের খোরাক একা খেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার খোরাকটা একটু বেশিই। তা ভরপেট না হলেও ক্ষতি নেই কিন্তু একটা ঢেকুর তো উঠবে! এতে তো একটা ঢেকুরও উঠল না।" একটা হাই তুলে "যাই ঘুমোই গিয়ে" বলে দৈত্যটা আবার প্রদীপের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

পরদিন দেখা গেল, দৈত্যকে একবেলা খাওয়াতে গিয়েই চালের ডোল ফাঁকা হয়ে গেছে। দারুব্রহ্ম ভাবল, আহা বেচারা। কতকাল খায়নি। একদিন তো ব্যাটার কাছ থেকে সুদে—আসলে সবই উশুল করব, কদিন বরং পেট ভরে খাক।

দারুব্রহ্ম পুরনো সব দলিল—দস্তাবেজ বের করে খুঁজতে—খুঁজতে সন্ধান পেল, চৌমারির চরে তাদের কিছু জমি বহুকাল ধরে আছে, কিন্তু খাজনা বা ফসল আদায় হয়নি। একটা তেলকলের অংশীদারিরও সন্ধান পেল। খুঁজে—পেতে দেখল, পুরো একটা তহসিলের খবরও সে একতাল রাখত না। ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দারুব্রহ্ম। দাগ—নম্বর ধরে—ধরে খুঁজে—পেতে জমির সন্ধান পেল। প্রজারা তাকে দেখে প্রথমে একটু বেগড়বাঁই করলেও স্বীকার করল যে বহুকাল তারা খাজনা বা ফসল দেয়নি। বাবা—বাছা বলে তুতিয়ে পাতিয়ে তাঁদের কাছ থেকে দারুব্রহ্ম কিছু আদায় করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মোড়ল চোখ মুছতে—মুছতে এসে বলল, "জমির মালিককে বঞ্চিত করেছি বলেই আমাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই। আপনি যান। আমরা নিজে থেকেই পৌঁছে দেব যা দেওয়ার।"

দারুব্রহ্ম তেলকলে গিয়ে দেখল সেটা বেশ রমরম করে চলছে। দারুব্রহ্ম কাগজপত্র বের করে তার দাবি—দাওয়া জানাতেই তেলকলের মালিক মূর্ছা গেল। জেগে উঠে বলল, "দলিলে দেখছি আপনি দশ আনার মালিক। তবে আমার থাকবে কী? যাকগে, এসব তো জানা ছিল না। কবেকার কথা সব। এখন একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। আপনি যান।"

তহসিলটাও দারুব্রহ্মকে হতাশ করল না। প্রজারা বলল, আমরা কী জানি ছাই যে, এ—জমিরও মালিক আছে। তবে আমরা নিমক—হারাম নই, বঞ্চিত করব না।

দিন দুই বাদে দারুব্রহ্ম বাড়িতে ফিরে দেখে চারটে গরুর গাড়ি বোঝাই ধান, দু কলসি কাঁচা টাকা আর আনাজপাতি, তেল মশলা সব এসেছে। সেদিন দারুব্রহ্ম বাড়িতে দশজনের রান্না রাঁধিয়ে প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে বের করে বলল, "খাও বাপু, পেট ভরে খাও। এ—বাড়িতে অতিথির ঢেকুর ওঠে না, এ—কথা শুনলে আমার পূর্বপুরুষরা স্বর্গ থেকে অভিশাপ দেবে।"

কিন্তু উঠল কই? দশজনের ভাত শাবাড় করে দৈত্য করুণ মুখে বলল, 'বটে?'

দারুব্রহ্ম হাঁ হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা বিশজনের খোরাক শেষ করেও কিন্তু দৈত্য ঢেকুর তুলল না। সাতদিনে চার গরুর গাড়ির চাল শেষ। বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে, এত খেয়েও দৈত্যটার ঢেকুর উঠছে না। তারা রোজ দুবেলা এসে খাওয়ার সময় দৈত্যকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কবে কখন ঢেকুর ওঠে। কিন্তু উঠল না! ঢেঁকুর না

উঠলেও পাহাড়—প্রমাণ খাওয়ার ফলে কদিনের মধ্যেই সুড়ঙ্গে দৈত্যটার চেহারা পুরোপুরি ঘটোৎকচের মতো হয়ে উঠল। মুগুরের মতো হাত, পাটাতনের মতো বুক, মুলোর মতো দাঁত, তালগাছের মতো লম্বা।

দারুব্রহ্মেরও জেদ চেপেছে। তাদের এত বড় রাজবংশে একটা পুঁচকে দৈত্য এসে খেয়ে ঢেকুর তুলছে না—এ কেমন কথা! এ বাড়িতে ভোজ খেয়ে লোকে পাক্কা দেড়দিন মেঝেয় পড়ে থাকত। দু'চারজন ভোজ খেয়ে গঙ্গাযাত্রায় পর্যন্ত গেছে। সেই বাড়ির এই অপমান?

দারুব্রহ্ম নাওয়া—খাওয়া ভুলে আদায় উশুল করতে লাগল। তেলকলের ভার নিজে নিল আরও সব নতুন নতুন কারবার খুলতে লাগল। গাড়ি—গাড়ি চাল আসছে বাড়িতে, বস্তা—বস্তা আনাজ, ঘি, দুধ, দই। এ সবই একদিন দৈত্যের ওপর দিয়ে উশুল হবে। আগে ব্যাটা ঢেকুরটা তো তুলুক।

এর মধ্যেই একদিন বাড়ির খদ্দের এসে হানা দিয়েছিল। তখন দুপুরবেলা, দারুব্রহ্ম প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে মাত্র ডেকেছে। দৃশ্যটা দেখে খদ্দের চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর থেকে আর আসেনি। কিন্তু বাড়ি বিক্রি এখন মাথায় উঠেছে দারুব্রহ্মের। বিক্রির মানেও হয় না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটা যখন হাতে পেয়েছে তখন আর অভাবও থাকবে না। খামোখা পূর্বপুরুষের ভিটে বিক্রি করবে কেন? সে তাই মিস্ত্রি ডেকে বাড়িটা মেরামত করাতে লাগল। সব খরচই উশুল হবে।

মৌরসিপাট্টায় আরও কিছু জমি নিল দারুব্রহ্ম। চাষবাস বাড়িয়ে ফেলল। কারবারগুলোও বেশ ফেঁপে—ফুলে চলছে। গোশালায় গরু, আস্তাবলে ঘোড়া, বাড়ির সামনে জুড়িগাড়ি। শুকনো বাগানে আবার গাছ লাগানো হল, তাতে ফুল ফুটল। বাড়িটা কলি ফেরানোর পর আবার ঝলমল করতে লাগল। এর মধ্যেই দারুব্রহ্মের জন্য যে মেয়েটি দেখা হয়েছিল তার বাবা এসে হাতজোড় করে বলল, "আমার মেয়েটি নিলে ধন্য হই।" তা তিনি হলেনও। নহবতখানায় সানাই বাজল, দারুব্রহ্ম বিয়ে করে এসে বিরাট ভোজ দিয়ে সাত গাঁয়ের লোককে খাওয়াল।

কিন্তু সাত গাঁয়ের লোকের মতো খাবার একা খেয়েও ব্যাটা দৈত্যটা কিন্তু ঢেকুর তুলল না। তবে বলল, "খিদেটা এবারে একটু কমেছে। পেটের জ্বলুনিটা তেমন নেই।" বলে ফের ঘুমোতে চলে গেল। নতুন বউয়ের সামনে এই অপমানে কান লাল হয়ে উঠল দারুব্রহ্মের, বলতে নেই সে এখন লাখোপতি। একটা দৈত্যের পেট ভরাতে পারবে না? পরদিন থেকে সে কাজকর্ম দ্বিগুণ করে দিল।

মাসখানেক বাদে সে একশো গাঁয়ের লোকের আয়োজন করে দৈত্যটাকে ডাকল। খুবই লজ্জার সঙ্গে প্রকাণ্ড চেহারার বিকট দৈত্যটা এসে বসল আসনে। আচমন করে একটু ভাত মেখে মুখে দিয়েছে কি দেয়নি অমনি একটা বাজ পড়ার আওয়াজে আঁতকে উঠল সবাই। ঘড় ঘড়াৎ। ঘড় ঘড়াৎ। ঘড় ঘড়াৎ। পরপর তিনবার। অমনি চারদিকে হই—হুল্লোড় ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। বাচ্চারা হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। তুলেছে। তুলেছে। দৈত্য ঢেকুর তুলেছে।

মাথা নিচু করে দৈত্যটা উঠে পড়ল। আঁচিয়ে যখন প্রদীপের মধ্যে ঢুকতে যাবে তখনই গিয়ে দারুব্রহ্ম তাকে ধরল, "এই যে বাপু। এই দিনটারই অপেক্ষা করছিলাম। ঢেঁকুর তো তুললে, এবার তো কাজকর্ম কিছু করতে হয়।"

দৈত্যটা অবাক হয়ে চেয়ে বলল, "আপনি হুকুম করলে সবই করতে হবে মালিক। কিন্তু কাজটা আর বাকি রেখেছেন কী? লোকে আমাকে পেলেই গাড়ি চায়, বাড়ি চায়, ধনদৌলত চায়। আমি দিইও। কিন্তু আপনার যা দেখছি, এর ওপরেও আমাকে কিছু করতে হবে নাকি?"

দারুব্রহ্ম কথাটা আগে ভেবে দেখেনি। এখন দেখল। বাস্তবিকই তার যা আছে তার ওপর আরও কিছু চাওয়ার মানেও হয় না। সে মাথা চুলকে বলল, "তা বটে। তবে কিনা—"

দৈত্যটা করুণ মুখ করে বলল, "যে—বাড়িতে খেয়ে আমার ঢেকুর ওঠে, বুঝতে হবে সে—বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনো অভাব নেই। ঝুটমুট আমাকে আর খাটাবেন কেন? দেড় হাজার বছরের ঘুমটা আর কয়েক হাজার বছর চালাতে দিন। শরীরটা বড় ম্যাজ ম্যাজ করছে।"

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, "তাই হোক।"
দৈত্যটা প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দারুব্রহ্ম সেটাকে আবার সাবধানে কাঠের সিন্দুকে ভরে রাখল।

টেলিফোনে

"টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।"

সকাল থেকে ডায়াল—টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গন্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ—অভিজ্ঞতা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড় পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজি হননি।

দুপুরের লাঞ্চের আগে সে একটা পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটা বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত—পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, "হ্যালো! হ্যালো!"

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তাহলেও তো ওপাশ থেকে কেউ না কেউ সাড়া দেবে!

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা ছিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা—ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারে কাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দু'টো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, "সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।"

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ—ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, "স্যার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গন্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।"

"কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।"

"হয়তো ক্রস কানেকশান হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরনো, তাই মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।"

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশান কেটে দেওয়ার পর ডায়াল—টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...' গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক—আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ—করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা—বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার...?

না, ফোন তুলে ডায়াল—টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হাল্কা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন—চারদিন আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গলফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিস ইজ দ্য ডে...দিস ইজ দ্য ডে...দিস ইজ দ্য ডে...দিস ইজ দ্য ডে...।

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, ''হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?''

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, ''দিস ইজ দ্য ডে...দিস ইজ দ্য ডে...''

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু—একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি—মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ারর বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গলফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গান—বাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি—হট্টগোল চলছে। গলফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গলফের বিশাল মাঠ। মাঝে—মধ্যে ঝোপ—জঙ্গল, জলা। অনেক গলফ খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোপ—জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নিচু হয়ে বলটা খোঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, ''দিস ইজ দ্য ডে...''

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই একজোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য সে বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। কে তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশেপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশেপাশে।

সারা দিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

''হ্যালো।''

ওপাশ থেকে একটা ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, ''এই নম্বর তো!''

''হ্যাঁ। আপনি কে?''

''আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?''

''প্রদীপ রায়।''

''ওঃ, হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?''

''না। বিলটা একটু ইরেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।''

''খুব ভালো। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।''

''বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।''

''হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।''

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, ''হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে...''

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, ''জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু—ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তাহলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সমাধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার ফরে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা গুড নাইট।''

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

চোর

পটাশের বাবা নব এবং নবর বাবা ভব দু'জনেই ছিল বিখ্যাত চোর। অর্থাৎ পটাশকে নিয়ে তিন পুরুষ ধরে তারা চোর। ভব চোরের নামডাক ছিল সাংঘাতিক। লোকে বলে, ভব নাকি বাজি রেখে এক দুপুরে তার পিসির আহ্নিক করার কম্বলের আসন চুরি করেছিল। কাজটা শুনতে যত সহজ, আসলে তত সহজ নয়। কারণ পিসি তখন স্বয়ং ওই আসনে বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন। সেই অবস্থায় আসন চুরি যাওয়ায় পিসি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে ভবকে আশীর্বাদ করেছিলেন, "ওর আমার ভব, তোর ওপর স্বয়ং ভগবানের ভর আছে, এ বিদ্যে ছাড়িসনি।"

পিসির আশীর্বাদে ভব বিদ্যে ছাড়েনি। বয়সকালে নিজের ছেলে নবকে তালিম দিয়ে সব বিদ্যে শিখিয়ে গেল। তা নবও কিছু কম গেল না। চোরের তালিম কিছু সহজ কাজ নয়। ভালো দৌড়োতে পারা চাই, উঁচু বা লম্বা লাফে দক্ষ হওয়া চাই, বাঁশের ওপর ভর দিয়ে ভল্ট খেয়ে উঁচু দেওয়াল ডিঙোতে পারা চাই, রণপায়ে চলতে জানা চাই। এছাড়া গায়ে যথেষ্ট জোর না থাকলে দু'দশ জন মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করা তো সহজ নয়। তারপর ভালো অভিনয়, বিনয়ী ব্যবহার ইত্যাদি তো আছেই। চোর বলে যদি সবাই চিনে ফেলে তো চিত্তির। নবর এসব গুণ তো ছিলই তা ছাড়া ছিল দুর্জয় সাহস। সে দু—মণ লোহা তুলত, কুস্তিতে যে—কোনো পালোয়ানকে হটিয়ে দিতে পারত, যন্ত্রবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্রও ছিল তার নখদর্পণে। এমন ঘুমপাড়ানি মন্ত্র জানত যে, গেরস্তের কুকুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকত, টুঁ শব্দ করত না। জমিদার তারিণী রায়ের বাড়ি থেকে এক খিলি পান চুরি করেছিল সে। শুনতে যত সহজ, কাজটা মোটেই তত সহজ ছিল না। রায়মশাইয়ের নাতির অন্নপ্রাশনে বাড়িতে সেদিন লোক গিজগিজ করছে। খাওয়াটাও হয়েছিল বেজায় রকমের। সকলের আইঢাই অবস্থা রায়মশাইয়ের খুড়ো বিপিনচন্দ্র এক খিলি বেনারসি পাত্তির স্পেশাল পান নিজের রুপোর বাটা থেকে বের করে মুখে ফেলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে পানটা চুরি যায়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। খুড়োমশাই নিজেও কিছুক্ষণ বুঝতে পারেননি যে,তাঁর দু আঙুলে ধরা পানটি হাঁ করা মুখের মধ্যে যেতে যেতে কীভাবে হাওয়া হল। কিছুক্ষণ চিবুবার পর তিনি খেয়াল করলেন, যা চিবোচ্ছেন তা পান নয়, নিজের জিবখানা। বেনারসি পান ততক্ষণে নবর গালে জমে বসেছে।

নবর এই হাত সাফাই দেখে তারিণী রায় তাকে সভাচোর করতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেমন পুরনো আমলে রাজরাজড়াদের সভাকরি, সভাগায়ক থাকত। অবশ্য সভাচোর হয়নি। হাতজোড় করে রায়মশাইকে বলেছিল, "আজ্ঞে, এ হল বাপ—দাদার বিদ্যে, এ ছাড়তে পারব না।"

"ছাড়বি কেন? বৃত্তি ছাড়ার জন্য কি তোকে রাখছি? চুরিই করবি, তবে মজার জন্য।"

নব শেষ অবধি রাজি না হওয়ায় তারিণী রায় তাকে আর পীড়াপীড়ি করেননি। তবে একখানা সোনার মেডেল দিয়েছিলেন। বরাবর স্নেহও করতেন খুব।

সেই নবর ছেলে হল পটাশ। ছেলে না বলে অকালকুষ্মাণ্ডই বলা ভালো। সব থেকেও তার কী যেন নেই। এই ছেলেকে এইটুকুন বেলা থেকে নিজে তালিম দিয়েছে নব। ছেলে তৈরিও কিছু কম হয়নি। হরিণের মতো দৌড়োতে পারে, বানরের মতো লাফাতে পারে, গায়ে হাতির জোর, বুদ্ধিও খুব। তবু) চুরিতে একেবারেই মন নেই। নব শেখায়, সেও শেখে, তবে গা লাগায় না, মন দেয় না।

একদিন হল কী, হাত মকশো করতে নব তার ছেলেকে সুদখোর অক্ষয় হাজরার বাড়ি চুরি করতে পাঠাল। পটাশ গেল বটে, কিন্তু চোরের যা যা করতে নেই তার সবকিছুই করতে লাগল। হাজরার চারটে কুকুরই তাকে চেনে, সুতরাং তেড়ে এল না। দু'একবার ভুকভুক করে চুপ মেরে গেল। পটাশের সেটা পছন্দ হল না। ঢিল মেরে মেরে সেগুলোকে খেপিয়ে দিয়ে শোরগোল তুলে ফেলল সে। তারপর দরজা ভাঙতে এমন সব বিকট শব্দ তুলল, যাতে মড়া অবধি উঠে বসে। তাতেও খুশি না হয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

অক্ষয় হাজরা সর্বদা ভয়ে—ভয়ে থাকে। ঘরে নগদ টাকা, সোনাদানা তো কম নেই। জেগে গিয়ে সে হেঁকে উঠল, ''কে, কে রে?''

''আমি পটাশ।''

''পটাশ? তা কী মনে করে? এই রাত—বিরেতে আমি দোর খুলতে পারব না। জিনিস বাঁধা দিতে এসেছিস তো! জানালা দিয়ে দে। এই হাত বাড়াচ্ছি।''

''হাত বাড়াতে হবে না। আমি দরজা ভেঙে ফেলেছি।''

''ভেঙে ফেলেছিস মানে? করছিসটা কী বল তো?''

''আজ্ঞে চুরি করছি।''

''চুরি করছিস। ইয়ার্কি হচ্ছে, অ্যাঁ? এভাবে কেউ চুরি করে? বেরো, বেরো বলছি।''

পরদিন অক্ষয় হাজরা এসে নবকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, ''ও কেমনধারা ছেলে তোর? চুরি তো তুইও করতিস, কখনো তো সাড়াশব্দ করিসনি, আস্পদ্দাও দেখাসনি। আর তোর ছেলের আস্পদ্দা দ্যাখ। গেরস্ত জিজ্ঞেস করছে কী করছিস, আর বুক ফুলিয়ে চোর বলছে, চুরি করছি। তার ওপর আবার গুনগুন করে গানও গাইছিল। দিনটি কী পড়ল বল তো নব!''

নব সেদিন পটাশকে জুতোপেটা করল খুব। কিন্তু পেটাতে পেটাতেই নব বুঝতে পারছিল, পটাশকে দিয়ে হবে না। বাপ—দাদার বিদ্যে এর হাতেই নষ্ট হবে।

পটাশ নির্বিকার। খায়—দায়, ঘুরে বেড়ায়। মাঝে—মাঝে বাপের সঙ্গে শাগরেদি করতে বেরোয় বটে কিন্তু কাজের চেয়ে অকাজই করে বসে বেশি। কখনো দুম করে হাত থেকে তার সিঁদকাঠি পড়ে যায়। একদিন 'সাপ—সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠে কেলেঙ্কারি করল। আর একদিন একজনের ঘরে ঢুকে নব যখন সিন্দুক বাক্স আলমারি খুলে ফেলেছে, তখন পটাশ একটা ফাঁকা বিছানা দেখতে পেয়ে সোজা গিয়ে তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত মানুষজনের মধ্যে যে পটাশও থাকতে পারে, তা নব আন্দাজ করতে পারেনি। তাই ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে একাই ফিরে এসে ভাবতে বসল। সকালবেলা হাই তুলতে তুলতে পটাশ ফিরে এলে তাকে একখানা গোদা হাতের চড় কষিয়ে বলল,''কোথায় ছিলি?''

''ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।''

''পাজি নচ্ছার, ঘুমিয়ে পড়লি চোরের ছেলে হয়ে?''

''তা কী করব? ঘুম পেয়ে গেল যে বেজায়।''

''তোকে ওরা ঠেঙায়নি?''

''না। সব বলে দিলাম যে।''

''বললি! কী বললি?''

''বললাম বাবার সঙ্গে চুরি করতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাবার নাম নব চোর। তখন বসিয়ে দুধ চিঁড়ে ফলার করাল।''

''ফলার করাল?''

''করাবে না? এত বড় চুরির হদিশ দিয়ে দিলাম। তারা সব দল বেঁধে লাঠিসোঁটা নিয়ে আসছে।''

নব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

সেই দিনই নব তার বাড়ি থেকে পটাশকে তাড়িয়ে দিল। সবাইকে জানিয়ে দিল, ''ওকে ত্যাজ্যপুত্তুর করলাম।''

পটাশ কোথায় গেল তার খোঁজ আর কেউ রাখল না।

এদিকে নব ধীরে ধীরে বুড়ো হতে লাগল। দাঁত পড়ল, চুল পাকল, শরীরের জোর বল চোখের দৃষ্টি সবই কমতে লাগল, বুদ্ধি একটু ঘোলাটে হল। বেপরোয়া ভাবখানাও তেমন রইল না। পৈতৃকবৃত্তি বজায় রাখা ভারি শক্ত হয়ে উঠল। আগে প্রতি রাতে চুরি করতে বেরোত, আজকাল আর তা পেরে ওঠে না। ফলে সে সঞ্চয়ে মন দিল। একটু—আধটু সুদের কারবার করতে শুরু করল। তাতে আয় মন্দ হল না। স্বভাবটা ভারি কৃপণের মতো হয়ে গেল তার।

ওদিকে বাপের তাড়া খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পটাশ পড়ল অথৈ জলে। চুরি ছাড়া তার বাবা তাকে আর কিছুই শেখায়নি বলে কাজকর্মেরও জোগাড় হল না। না খেয়ে খেয়ে চেহারা পাকিয়ে যেতে লাগল। এক বাড়িতে চাকরের কাজ পেয়েছিল কিছু দিন। বাসন মাজত, জল তুলত, ঘরদোর ঝাঁটপাট দিত। বেশ ছিল। একদিন হঠাৎ মাঝরাত্রে যেন নিশির ডাক শুনে উঠে পড়ল। তারপর ভারি অবাক হয়ে দেখল তার দুটো হাত আপনা থেকেই বাক্স প্যাঁটরা হাতড়াচ্ছে।

এই কাণ্ড দেখে পটাশ এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, তার ''চোর! চোর!'' বলে চেঁচিয়ে উঠতেও ইচ্ছে হয়েছিল। ভাগ্যিস চেঁচায়নি। তবে সে অবাক হয়ে দেখল, বিনা আয়াসেই সে তালাচাবি খুলে ফেলছে এবং নিঃশব্দে জিনিসপত্র বের করছে। বাপ—দাদার স্বভাব যাবে কোথায়? রক্তেই বিজবিজ করছে যে!

পটাশ পালাল। আবার আর—এক বাড়িতে কাজ নিল। কিছুদিন পর সেখানেও সেই কাণ্ড। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পটাশ বুঝল, এটা থেকে তার আর নিস্তার নেই। বাপ নব তাকে চুরিতে নামাতে পারেনি বটে, কিন্তু তার ভিতর একটা চোরকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এতকাল সেটা ঘুমিয়ে ছিল, এখন তার ঘুম ভেঙেছে।

তা পটাশ সেয়ানা চোর। এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। ঘন ঘন এলাকা বদলায়। চুরির ধরনও সে পালটে ফেলে। পয়সাকড়ি সোনাদানা যা পায় উড়িয়ে দেয়। চুরি তো শুধু তার রোজগার নয়, একটা নেশাও।

একদিন রাত্রিবেলা একটা গাঁয়ে ঢুকল পটাশ। বেশ সম্পন্ন গ্রাম। অনেক বাড়িঘর! ঘরবাড়ির চেহারা দেখেই তার অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারে, কোন বাড়িতে জিনিসপত্র আছে।

বেছে বেছে একটা বাড়ি তার পছন্দ হল। বাড়ি তো নয়, যেন দুর্গ। মোটা গরাদ, পুরু মজবুত একপাটা কাঠের পাল্লা দেওয়া জানালা—কপাট, চারধারে উঁচু পাঁচিল। পাহারাদার কুকুর। দেখে খুশিই হল পটাশ। যেখানে চুরি করা শক্ত, সেখানেই চুরির আনন্দ।

পাঁচিল ডিঙিয়ে কুকুরটার মুখ বেঁধে জানালা খুলে ঘরে ঢুকতে সে বেশি সময় নিল না। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই তার মনে হল, এ বাড়ি, এই ঘর তার চেনা।

ওদিকে নবরও ঘুম ভেঙেছে। ইঁদুরের শব্দ, বেড়ালের শব্দ সব সে চেনে। কিন্তু ও শব্দটা অন্যরকম। নব বাতাস শুঁকল। একটা গন্ধ পেল। তারপর খুব অবাক হয়ে বুঝতে পারল, তার ঘরে চোর ঢুকেছে। নবচোরের ঘরে চোর ঢুকেছে! আশ্চর্য কথা!

লাঠিসোঁটা অন্ধকারে খুঁজে পেল না নব। গায়ে তেমন জোরও নেই যে, চোরকে জাপটে ধরবে। বাঁ পায়ে বাতের সাংঘাতিক ব্যথা। অথচ ঘরে প্রচুর সোনাদানা, টাকাপয়সা। চোর সব নিয়ে যাবে।

নব বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল, ''চোর! চোর! চোর!''

লালটেম

লালটেম কারও পরোয়া করে না। সে আছে বেশ। সকাল বেলা সে তিনটে মোষ নিয়ে চরাতে বেরোয়। এ জায়গাটা ভারি সুন্দর। একদিকে বেঁটে—বেঁটে চা—বাগানের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার। অন্য ধারে বড় একটা মাঠ। মাঠের শেষে তিরতিরে একটা ঠান্ডা জলের পাহাড়ি নদী— তাতে সবসময়ে নুড়ি—পাথর গড়িয়ে চলে। নদীর ওপারে জঙ্গল। আর তার পরেই থমথম করে আকাশ তক উঠে গেছে পাহাড়। সামনের পাহাড়গুলো কালচে—সবুজ। দূরের পাহাড়গুলোর শুধু চূড়ার দিকটা দেখা যায়— সেগুলো সকালে সোনারঙের দেখায়, দুপুরে ঝকঝকে সাদা। আর সন্ধের মুখে—মুখে ব্রোঞ্জের মতো কালোয় সোনার রং ধরে থাকে। আর চারপাশে সারাদিন মেঘ—বৃষ্টি—রোদ আর হাওয়ার খেলা। গাছে—গাছে পাখি ডাকে, কাঠবেড়ালি গাছ বায়, নদীর ওপাশে সরল চোখের হরিণ অবাক হয়ে চারদিক দেখতে—দেখতে আর থমকে—থমকে থেমে জল খেতে আসে।

লালটেম বেশ আছে। মোষ নিয়ে সে মাঠে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এক জায়গায় বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খায়। নদীর জল খায়। তারপর খেলা করে। তার সঙ্গীসাথী কিছু কম নেই। তারাও সব মোষ, গরু, বা ছাগল চরাতে আসে। যে যার জীবজন্তু মাঠে ছেড়ে দিয়ে চোর—চোর খেলে, ডাণ্ডাগুলি খেলে; নদীতে নেমে সাঁতরায়, আরও কত কী করে।

দুপুরের দিকে খুব খিদে পেলে বাড়ি ফিরে লালটেম খায়।

কিন্তু সব দিন খাবার থাকে না। যেদিন থাকে না, সেদিন লালটেম টের পায়। তাই সেদিন সে বাড়ি ফেরে না। দুপুরে সে গোছের পাকা ডুমুর কি আমলকী পেড়ে খায়। বেলের সময়ে বেল পাড়ে, কখনও বা টক আম বা বাতাবি লেবু পেয়ে যায় বছরের বিভিন্ন সময়ে। তাই খায়। খেয়ে সবচেয়ে বুড়ো আর শক্ত চেহারার মোষ 'মহারাজর' পিঠে উঠে চিৎপাত হয়ে ঘুমোয়।

ছোট্ট ইস্টিশনটার গা ঘেঁষে লালটেমদের ঝোপড়া। তার বাবা পেতলের থালায় সাজিয়ে পেঁড়া বিক্রি করে ট্রেনের সময়ে। বাজারে বড়—বড় কারবারিদের কাছে ভৈঁসা ঘি বেচে, দুধ দেয় বাড়ি—বাড়ি। তিনটে মোষের মধ্যে দুটো মেয়ে মোষ। মহারাজা পুরুষ। দুটো মেয়ে—মোষই বছরের কোনো—না—কোনো সময়ে দুধ দেয়। বুড়ো মোষটার মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর দুটোও বুড়ো হতে চলল। সামনে দুর্দিন। লালটেমদের সংসার বেশ বড়। মা ঘুঁটে বিক্রি করে, বাবা দুধ, পেঁড়া, ঘি বেচে। এই করে কোনোরকমে দশজনের সংসার চলে। লালটেমদের দাদু আছে, আরও ছয় ভাইবোন আছে। তারা কোনো লেখাপড়া শেখেনি, মাঝে—মাঝে মোষের দুধ, ঘি বা পেঁড়া ছাড়া কোনো ভালো খাবার খায়নি, খাটো ধুতি বা শাড়ি ছাড়া ভালো জামাকাপড় পরেনি, তারা একসঙ্গে একশো টাকাও কখনও চোখে দেখেনি।

তবু লালটেম কারও পরোয়া করে না। দিনভর সে মোষ চরায়, সাথীদের সঙ্গে খেলা করে, আর চারদিককার আকাশ—বাতাস—আলো—পাহাড় দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়।

একদিন একটা রোগা মানুষ ওপার থেকে শীতের নদীর হাঁটুভর জল হেঁটে পার হয়ে এল। লোকটার গা ময়লা চাদরে ঢাকা, পরনে একটা পাজামা, কাঁধে মস্ত এক পুঁটুলি। লালটেম আর তার সাথীরা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। কারণ, নদীর ওপারের জঙ্গলে বাঘ আছে, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োর আর গন্ডার আছে, সাপ তো কিলবিল করছে। ওদিকে কেউ যায় না, একমাত্র কাঠুরেরা ছাড়া। তারাও আবার দল বেঁধে যায়, সঙ্গে লাঠি থাকে, বল্লম থাকে, তির—ধনুক থাকে, আর কুড়ুল তো আছেই।

লোকটা জল থেকে উঠে পোঁটলাটা মাটিতে রেখে একগাল হেসে বলল, 'একটা জিনিস দেখবে?'

'হ্যাঁ—অ্যা লালটেমরা খুব রাজি।'

লোকটা ধীরে—আস্তে পুঁটলির গিঁট খুলে চাদরটা মেলে দিল। লালটেমরা অবাক হয়ে দেখে, ভিতরে কয়েকটা ইট।

রোগা লোকটা হেসে বলল, 'ইট ঠিকই, তবে সাধারণ ইট নয়। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো একটা রাজবাড়ির জিনিস। ওই জঙ্গলের মধ্যে আমি সেই রাজবাড়ির খোঁজ পেয়েছি।'

রাজা বা রাজবাড়ি সম্পর্কে লালটেমের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সে জানে, একজন রাজা সোনার রুটি খেতেন। তাঁর রানি যে শাড়ি পরতেন সেটা জ্যোৎস্নার সুতো দিয়ে বোনা।

লোকটা ইটগুলো পুঁটলিতে বেঁধে হাত ঝেড়ে বলল, 'সেই রাজবাড়িটায় অনেক কিছু মাটির নিচে পোঁতা আছে। যে পাবে, সে এক লাফে বড়লোক হয়ে যাবে। তবে কিনা সেখানে যখেরা পাহারা দেয়, সাপ ফণা ধরে আছে। চারদিকে যাওয়া শক্ত।

লালটেম বলে, 'তুমি তাহলে বড়লোক হলে না কেন?'

লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'আমি! আমি বড়লোক হয়ে কী করব? দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। দিব্যি আছি, ঘুরে—ঘুরে সময় কেটে যায়। রাজবাড়িটা দেখতে পেয়ে আমি শুধু লোককে দেখানোর জন্য কয়েকটা ইট কুড়িয়ে এনেছি। এইতেই আমার আনন্দ।'

লালটেম বলে, 'তোমাকে বাঘে ধরল না? সাপে কাটল না? বুনো মোষ তাড়া করল না?'

লোকটা ভালোমানুষের মতো বলে, জানোয়ারেরাও বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে। আমি নিরীহ মানুষ, ওরাও সেটা টের পেয়েছিল। তাই কিছু বলেনি।'

লোকটা তারপর গান গাইতে—গাইতে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। লালটেম তার সাথীদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় কোদাল—গাঁইতি হাতে কয়েকজন লোক নদীর ধারে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন লোককে লালটেম চেনে। সে হল এ অঞ্চলের নামকরা গুন্ডা আর জুয়াড়ি প্রাণধর। লালটেমকে ডেকে সে লোকটা বলল, 'এই ছোঁড়া, ওই জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা আছে?'

লালটেম ভালোমানুষের মতো বলে, 'কাঠুরেদের পায়ে—হাঁটা রাস্তা আছে।'

লোকটা কটমট করে চেয়ে বলে, 'আমরা যে এদিকে এসেছি, খবরদার কাউকে বলবি না।'

লোকগুলো হেঁটে শীতের নদী পার হয়ে ওপাশের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালটেমরা মুখ—তাকাতাকি করে নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দেয়। কিন্তু একটু বাদেই আবার কোদাল—শাবল হাতে একদল লোক আসে। তারাও জঙ্গলের মধ্যে পথ আছে কিনা জিগ্যেস করে, তারপর লালটেমরা যাতে আর কাউকে না বলে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন যে এভাবে কত লোক জঙ্গলের মধ্যে গেল, তার গোনাগুনতি নেই। তাদের মধ্যে কানা—খোঁড়া—বুড়ো—কচি—বড়লোক—গরিব সবরকম আছে। চোরের মতো হাবভাব সবার। কী যেন গোপন করছে। এদের দলে লালটেম নিজের বাবাকেও দেখে ভারি অবাক হয়।

বাবা লালটেমকে দেখে কিছু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আমার ফিরতে দুদিন দেরি হবে। সাবধানে থেকো। মোষগুলোকে যত্নে রেখো। বাড়ি—বাড়ি দুধ দিও, পেঁড়া বেচো, ঘি বিক্রি কোরো।'

বাবা গেল। কিছুক্ষণ পরে একদল ঘুঁটেউলির সঙ্গে মাকেও জঙ্গলে যেতে দেখল লালটেম।

মা কাছে এসে তাকে টেনে নিয়ে বলল, 'আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বাবা। একদিন বা দুদিন। তুমি সব সামলে রেখো।'

সেই রোগা লোকটা গ্রামে—গঞ্জে—হাটে বাজারে রাজবাড়ির কথা রটিয়ে দিয়ে গেছে। এখন তাই লোভী মানুষরা চলেছে সেই রাজবাড়ির খোঁজে! লালটেম তাই অবাক হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

দুদিন গেল। তিনদিন গেল। লালটেম আর তার সাথীরা রোজ মোষ চরাতে আসে। এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলেরই বাপ মা, আপনজনেরা জঙ্গলে গেছে। কেউই এখনো ফেরেনি!

দাঁড়িয়ে তারা একটু অপেক্ষা করে। তারপর আবার খেলায় মাতে। নদীতে স্নান করে। গাছে উঠে খাওয়ার যোগ্য ফল—পাকুড় খোঁজে। মোষের পিঠে শুয়ে থাকে।

চারদিনের দিন সন্ধেবেলা একটা লোক জঙ্গল থেকে টলতে—টলতে বেরিয়ে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। পড়ে আর ওঠে না। লালটেমরা দৌড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তুলে তাকে এপারে নিয়ে আসে।

লোকটা প্রাণধরের এক স্যাঙাত। তার চোখ রক্তবর্ণ, পেটে পিঠে এক হয়ে গিয়েছে খিদেয়, ভালো করে কথা বলতে পারছে না। লালটেম গিয়ে শালপাতায় নদীর জল তুলে এনে তাকে খাওয়ায়। তারপর মকাই ভাজা দেয়।

লোকটা একটু দম পেয়ে বলল, 'সব মিথ্যে কথা। রাজবাড়ি কোথাও নেই। আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটে খুঁজেছি। খাবার নেই, জল নেই।

সারা পথে নানারকম বিপদ। আমার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে!'

এইরকম ভাবে দু—চার দিন পরে একটি—দুটি হা—ক্লান্ত লোক ফিরে এসে তাদের বিপদের কথা জানায়। তারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রান হয়েছে। বহুলোক বাঘের পেটে গিয়েছে। কিছু মরেছে বুনো হাতি, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োরের পাল্লায় পড়ে। বহু লোককে সাপে কেটেছে। জঙ্গলে খাবার নেই, জল নেই, পথ নেই। সেখানে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে মরতে হয়।

গা—ভর্তি জ্বর নিয়ে একদিন লালটেমের বাবা ফেরে। শরীর শুকিয়ে সিকিভাগ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর বিড়বিড় বকছে, 'রাজবাড়ি? সোনা—দানা! বাপ রে বাপ!'

এর দুদিন বাদে ফিরল মা। লালটেম দেখল, তার মা কয়েকদিনেই খুনখুনে বুড়ি হয়ে গিয়েছে। মাজা বেঁকে যাওয়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে, মাথার চুল পেকে শনের গুছি, গলার স্বরে একটা কাঁপ ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একে একে সবাই ফিরে এসেছে। মরেনি কেউ। তবে সকলেরই ভীষণ বিপদ হয়েছিল। নানারকম বিপদ আর কষ্ট সহ্য করে মরতে—মরতে ফিরেছে। তবে মানুষগুলো আর আগের মতো নেই। যুবকরা বুড়ো হয়ে ফিরেছে, বুড়োরা অথর্ব হয়ে গিয়েছে, আমুদে লোকেরা দুঃখী, দুঃখীরা পাথর হয়ে এসেছে। কোনো মানুষই আর আগের মতো নেই।

লালটেম আজকাল মোষ চরাতে—চরাতে খুব রাজবাড়ির কথা ভাবে। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রাজবাড়ির জন্য লোকগুলো হন্যে হয়ে ছুটে গিয়েছিল কেন!

দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। মোষ মহারাজার পিঠে গামছা পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল লালটেম। বুড়ো মোষটা ঘাস খেতে—খেতে নদীর ধারে এল। তারপর লালটেমকে পিঠে নিয়ে নদীতে নামল জল খেতে। জল খেয়ে খুব ধীরে—ধীরে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগল।

লালটেম ঘুম থেকে উঠে হাঁ। এ সে কোথায়? মহারাজা তাকে পিঠে নিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর শেষ হয়ে রোদে বিকেলের নরম আভা লেগেছে। চারদিকে গভীর স্বরে পাখিরা ডাকছে। পাতা খসে পড়ছে গাছ থেকে। সরসর করে হাওয়া দিচ্ছে। আর চিকড়ি—মিকড়ি আলো—ছায়ায়, সামনেই এক বিশাল বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে—পড়া খিলান, গম্বুজ, পাথরের পরী, ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়ির চূড়ায় এখনও একটা সোনার কলস চিকমিক করছে।

লালটেম অবাক হয়ে চেয়ে আছে তো আছেই। মহারাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়তে সেই শব্দে লালটেম সচকিত হয়ে মাটিতে নামল লাফ দিয়ে। তাই তো! এই তো সেই রাজবাড়ি মনে হচ্ছে! এক—পা দু—পা করে লালটেম এগোয়।

চারিদিকে শ্যাওলা ধরা পাথর আর ইটের স্তূপ। এই সেই ইট যা রোগা লোকটা তাদের দেখিয়েছিল। সুতরাং এইটাই রাজবাড়ি। লালটেম দেখে, চারধারে নানা রঙের সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সাপ ফণা তুলছে। ফোঁ ফোঁ করে ভয়ঙ্কর শব্দ করছে তারা। কোত্থেকে একটা দুটো তক্ষক ডাকল। ছমছম করে ওঠে এখানকার নির্জনতা। লালটেম ভয় পায় বটে, কিন্তু তবু এগোয়। সাপেরা তার পথ থেকে সরে যায়।

চারদিকে ফিসফাস শব্দ ওঠে। কারা যেন হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে কাছেই। চারদিকে চেয়ে লালটেম কাউকে দেখতে পায় না। আবার এগোয়।

কী করুণ অবস্থা! বিশাল ঘরের আধখানা ভেঙে পড়ে গেছে, বাকি অর্ধেকটায় ধুলো জঞ্জাল আর আগাছা। মাকড়সার জাল এত ধারালো যে, গায়ে লাগলে, চামড়া চিরে যায়। কাঁকড়া বিছেরা বাসা করে আছে যেখানে—সেখানে, একটা ঘরে শেয়ালের বাচ্চারা দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, একটা জং ধরা লোহার সিন্দুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একটা দাঁতাল শুয়োর।

একটার পর একটা ভাঙা ঘর পার হয় লালটেম। দেখে, অনেকগুলো বন্ধ কুঠুরি। কৌতূহলবশে সে একটা কুঠুরির দরজা ঠেলা দিতেই দরজাটা মড়াৎ করে ভেঙে পড়ে গেল। লালটেম ভিতরে ঢুকে ভীষণ অবাক হয়ে দেখে, সেখানে অনেক সোনা—রুপোর বাসন পাঁজা করে রাখা।

পাশের কুঠুরিতে ঢুকে লালটেম হাজার—হাজার মোহর দেখতে পেল। তার পাশেরটায় গহনা, হীরে, মুক্তো।

কত কী রয়েছে রাজবাড়িতে। দেখে লালটেম অবাক তো অবাক! সবকিছু সে ছুঁয়ে—ছুঁয়ে, নেড়েচেড়ে দেখে, তারপর আবার যেখানকার জিনিস, সেখানেই রেখে দেয়।

সাতটা কুঠুরির সব—শেষটায় ঢুকে লালটেম দেখে, ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের কঙ্কাল! ভীষণ ভয় পেয়ে লালটেম দরজার দিকে পিছু হটে সরে এল।

হঠাৎ কঙ্কালটা নড়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে কঙ্কালটা বলল, 'লালটেম, যেও না।'

লালটেম ভয় পেয়েও দাঁড়াল।

একবোঝা হাড় নিয়ে খটমট শব্দ করে আস্তে—আস্তে কঙ্কালটা উঠে বসে। লালটেম দেখে, কঙ্কালটার পাঁজরের মধ্যে একটা কালো সাপ, মাথার খুলির ভিতর থেকে চোখ আর নাকের ফুটো দিয়ে কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে আসছে, আর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে থিকথিক করছে।

কঙ্কালটা হাত তুলে বলে, 'আমার দশা দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'ভয় পেও না। এখানে যা কিছু দেখছ, সব সোনাদানা মোহর—গয়না, এ সবই তোমার। নিয়ে যাও।

লালটেম মাথা নেড়ে বলে, 'নিয়ে কী হবে?'

'অভাব থাকবে না। খুব বড়লোক হয়ে যাবে। নাও।'

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় মহারাজা ডাকল 'হাংগা'।

লালটেম চমকে উঠে বলল, 'আমার মোষটার জল তেষ্টা পেয়েছে। আমি যাই।'

'যেও না লালটেম। কিছু নিয়ে যাও।'

মহারাজা আবার ডাকে, 'আঃ—আঃ'।

লালটেম ছটফট করে বলে, 'বেলা বয়ে যাচ্ছে। আমি যাই।'

'তোমার মোষগুলো বুড়ো হয়েছে লালটেম, একদিন মরবে। তখন বড় দুর্দিন হবে তোমাদের। এইবেলা বড়লোক হয়ে যাও।'

মহারাজা বাইরে ভীষণ দাপিয়ে চেঁচায়, 'গাঁ...গাঁ।'

লালটেম একটু হেসে বলে, 'আমার দিন খারাপ যায় না। বেশ আছি।'

কঙ্কালটা রেগে গিয়ে বলে, 'গাঁ—গঞ্জের হাজারো মানুষ যে রাজবাড়ি খুঁজে—খুঁজে হয়রান, সেই রাজবাড়ি পেয়েও তুমি বড়লোক হবে না?

লালটেম একটু ভেবে বলে, 'না, আমি তো বেশ আছি। চারদিকে কত আনন্দ! কত ফুর্তি!

সাপটা ফোঁস করে কঙ্কালটার পাঁজরায় একটা ছোবল দিল। 'উঃ করে কঙ্কালটা পাঁজর চেপে ধরে বলল, 'গত একশো বছর ধরে রোজ ছোবলাচ্ছে রে বাপ।...ইঃ, ওই দেখ, মাথায় ফের কাঁকড়াবিছেটা হুল দিল...কী যন্ত্রণা!... আচ্ছা লালটেম, বলো তো, বোকা লোকগুলো রাজবাড়িটা খুঁজে পায় না কেন? তোমাদের এত কাছে, জঙ্গলের প্রায় ধার ঘেঁষেই তো রয়েছে তবু খুঁজে পায় না কেন? আর যে দু—একজন খুঁজে পায়, সেগুলো একদম তোমার মতোই আহাম্মক। লালটেম, লক্ষ্মী ছেলে, যদি একটা মোহরও দয়া করে নাও, তবে আমি মুক্তি পেয়ে যাই। নেবে?'

বাইরে মহারাজা ভীষণ রেগে চেঁচায়, 'গাঁ—আঁ।'

লালটেম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, 'নিলেই তো তোমার মতো দশা হবে।'

এই বলে লালটেম বেরিয়ে আসে গটগট করে। মহারাজা তাকে দেখে খুশি হয়ে কান লটপট করে, গা শোঁকে, পা দাপিয়ে আনন্দ জানায়।

পরদিন থেকে আবার লালটেম মোষ চরাতে যায়। সাথীদের সঙ্গে খেলে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, চা—বাগান দেখে তার ভারি আনন্দ হয়। রোদ আর আলো, মেঘ আর বৃষ্টি, বাতাস আর দিগন্ত তাকে কত আদর জানায় নানাভাবে।

কোনোদিন তার খাবার থাকে। কোনোদিন থাকে না। যেদিন খাবার জোটে না, সেদিন সে মহারাজার পিঠে শুয়ে আকাশ দেখে। তার মনে হয়, সে বেশ আছে। খুব ভালো আছে। তার কোনো দুঃখ নেই।

কালীচরণের ভিটে

কালীচরণ লোকটা একটু খ্যাপা গোছের। কখন যে কী করে বসবে, তার কোনো ঠিক নেই। কখনও সে জাহাজ কিনতে ছোটে, কখনও আদার ব্যবসায় নেমে পড়ে। আবার আদার ব্যবসা ছেড়ে কাঁচকলার কারবারে নেমে পড়তেও তার দ্বিধা হয় না। লোকে বলে, কালীচরণের মাথায় ভূত আছে। সেকথা অবশ্য তার বউও বলে। রাত তিনটের সময় যদি কালীচরণের পোলাও খাওয়ার ইচ্ছে হয় তো, তা সে খাবেই।

তা, সেই কালীচরণের একবার বাই চাপল, শহরের ধুলো—ধোঁয়া ছেড়ে দেশের বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে বসবাস করবে। শহরের পরিবেশ ক্রমে দূষিত হয়ে যাচ্ছে বলে রোজ খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে। কলেরা ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, যক্ষ্মা— শহরে কী নেই?

কিন্তু কালীচরণের এই দেশে গিয়ে বসবাসের প্রস্তাবে সবাই শিউরে উঠল। কারণ, যে গ্রামে কালীচরণের আদি পুরুষরা বাস করত, তা একরকম হেজেমজে গেছে। দু—চারঘর নাচার চাষাভূষো বাস করে। কালীচরণের বাড়ি বলতে যা ছিল, তাও ভেঙেচুরে জঙ্গলে ঢেকে ধীরে—ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সেই বাড়িতে গত পঞ্চাশ বছর কেউ বাস করেনি, সাপখোপ, ইঁদুর—ছুঁচো, চামচিকে প্যাঁচা ছাড়া।

কিন্তু কালীচরণের গোঁ সাংঘাতিক। সে যাবেই।

তার বউ বলল, 'থাকতে হয় তুমি একা থাক গে। আমরা যাব না।'

বড় ছেলে মাথা নেড়ে বলল, 'গ্রাম! ও বাবা, গ্রাম খুব বিশ্রী জায়গা।'

মেয়েও চোখ বড় বড় করে বলে, 'গ্রামে কি মানুষ থাকে?'

ছোট ছেলে আর মেয়েও রাজি হল না।

রেগেমেগে কালীচরণ একাই তার স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বলে গেল, 'আজ থেকে আমি তোমাদের পরস্য পর। আর ফিরছি না।'

কালীচরণ যখন গাঁয়ে পৌঁছল, তখন দুপুরবেলা। গ্রীষ্মকাল। স্টেশন থেকে রোদ মাথায় করে মাইলটাক হেঁটে সে গ্রামের চৌহদ্দিতে পৌঁছে গেল। লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। চারদিক খাঁ—খাঁ করছে।

গোঁয়ার কালীচরণ নিজের ভিটের অবস্থা দেখে বুঝল যে, এ ভিটেয় আপাতত বাস করা অসম্ভব। চারদিকে নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে বাড়িটা ঘেরা। আর বাড়ি বলতেও বিশেষ কিছু আর খাড়া নেই। তবু হার মানলে তো চলবে না।

একটা জিনিস এখনো বেশ ভালোই আছে। সেটা হল তাদের বাড়ির পুকুরটা। জল বেশ পরিষ্কার টলটলে, বাঁধানো ঘাট ভেঙে গেলেও ব্যবহার করা চলে। কালীচরণ পুকুরে নেমে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে নিল, ঘাড়ে মাথায় জল চাপড়াল। পুকুরের জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে একডেলা গুড় দিয়ে খেল। তারপর পুকুরপাড়ে কদমগাছের তলায় বসল জিরোতে।

একটু ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পাখির ডাকে চটকা ভেঙে চাইতেই সে সোজা হয়ে বসল। তাই তো! চারদিক জঙ্গলে ঢাকা হলেও উত্তরের দিকটায় জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি পথ আছে যেন! মনে হয় লোকজনের যাতায়াত আছে। তাদের বাগানে অনেক ফলগাছ ছিল। হয়তো এখনো সেসব গাছে ফল ধরে, আর রাখাল ছেলেটেলে সেইসব ফল পাড়তে ভেতরে যায়। তাই ওই পথ।

কালীচরণ বাক্স হাতে উঠে পড়ল। তারপর কোলকুঁজো হয়ে বহুকালের পরিত্যক্ত ভিটের মধ্যে গুঁড়ি মেরে সেঁধোতে লাগল।

ভেতরে এসে স্তূপাকার ইট আর ভগ্নস্তূপের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কালীচরণ। তারপর হাঁ করে দেখতে লাগল চারদিকে।

অবস্থা যাকে বলে গুরুচরণ। একখানা ঘরও আস্ত আছে মনে হচ্ছিল না। এর মধ্যে কোথায় যে রাত্রিবাস করবে সেইটেই হল কথা। কালীচরণের সঙ্গে টর্চ, হ্যারিকেন, লাঠি আছে। ছোট একটা বিছানাও এনেছে সে। রাতটা কাটিয়ে কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিলে দিন—সাতেকের মধ্যে জঙ্গল আর আবর্জনা সাফ হয়ে যাবে। রাজমিস্ত্রি ডেকে একটু—আধটু মেরামত করাবে। ভালোই হবে।

কালীচরণ ঘুরে—ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। দক্ষিণ দিকে নিচের তলায় একখানা ঘর এখনও আস্ত আছে বলেই মনে হল কালীচরণের। স্তূপাকার ইট আর আবর্জনার ওপর সাবধানে পা ফেলে কালীচরণ এগিয়ে গেল।

বেজায় ধুলো, চামচিকের নাদি, আগাছা সত্ত্বেও ঘরখানা আস্ত ঘরই বটে। মাথার ওপর ছাদ আছে, চারদিকে দেওয়াল আছে। জানলা কপাট অবশ্য নেই। একটু সাফসুতরো করে নিলেই থাকা যায়। দরকার একখানা ঝাঁটার।

তা ঝাঁটাও পাওয়া গেল না খুঁজতেই। ঘরের কোণের দিকে পুরোনো একগাছা ঝাঁটা দাঁড় করানো। পাশে একটা কোদাল। তাও বেশ পুরোনো। বোধহয় সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার।

কালীচরণ ঘণ্টাখানেকের মেহনতেই ঘরখানা বেশ সাফ করে ফেলল। গা তেমন ঘামলও না। তারপর ঘরখানার ছিরি দেখে মনে হল, এক বালতি জল হলে হত। কিন্তু বালতি?

না, কপালটা ভালোই বলতে হবে। ঘর থেকে বেরোতেই ভাঙা সিঁড়ির নিচে চোখ পড়ল তার দু—খানা জংধরা বালতি উপুড় করা রয়েছে। কালীচরণ যেমন অবাক, তেমনি খুশি হল—যখন দেখল, একটা বালতিতে লম্বা দড়ি লাগানো রয়েছে।

উঠোনের পাতকুয়োটা হেজেমজে যাওয়ার কথা এতদিনে। কিন্তু কপালটা ভালোই কালীচরণের। মজেনি। সে জল তুলে এনে ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করল। তারপর ভাবল, একটা চৌকিটৌকি যদি পাওয়া যেত তো তোফা হত। আর একটা জলের কলসি।

বলতে নেই, কালীচরণের মনে যা আসছে তাই হয়ে যাচ্ছে আজ। কলসি পাওয়া গেল পাশের ঘরটায়, মুখটা সরা দিয়ে ভালো করে ঢাকা ছিল বলে ভেতরটা এখনো পরিষ্কার। একটু মেজে নিলেই হবে। আর চৌকি নয়, খাটই পাওয়া গেল কোণের দিককার ঘরে। ভাঙা নয় আস্ত খাট। কালীচরণ খাটখানা খুলে আলাদা—আলাদা অংশ বয়ে নিয়ে এসে পেতে ফেলল।

চমৎকার ব্যবস্থা।

সন্ধে হয়ে আসতেই কালীচরণ হ্যারিকেন জ্বেলে ফেলল। চিঁড়ে খেয়েই রাতটা কাটাবে ভেবেছিল। কিন্তু সন্ধে হতেই প্রাণটা ভাতের জন্য আঁকুপাঁকু করছে। চাল, ডাল, আলু নুন, তেল, সব সঙ্গে আছে। কিন্তু উনুন, কয়লা কাঠ এসব জুটবে কোত্থেকে?

ভাবতে—ভাবতে কালীচরণ উঠল। সবই যখন জুটেছে, তখন এও বা জুটবে না কেন?

বাস্তবিকই তাই, ভেতরের বারান্দার শেষ মাথায় যেখানে রান্নাঘর ছিল, সেখানে এখনও একখানা উনুন অক্ষত রয়েছে। ঘরের কোণে কিছু কাঠ, মণ দুয়েক কয়লা পড়ে আছে। আর আশ্চর্য, রান্নাঘরে যে বড়

কাঠের বাক্স ছিল সেটা তো আছেই, তার মধ্যে কিছু বাসন—কোসনও রয়ে গেছে।

কালীচরণ দাঁত বের করে হাসল। তারপর রামপ্রসাদী গাইতে—গাইতে রান্না চড়িয়ে দিল। গরম—গরম ডাল—ভাত আর আলুসেদ্ধ ভরপেট খেয়ে ঘুমে রাত কাবার করে দিল কালীচরণ।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই তার মনে হল, বাড়িটা যেন ততটা ভাঙা আর নোংরা লাগছে না। ধ্বংসস্তূপটা যেন খানিক কমে গেছে, নাকি তার চোখের ভুল?

যাই হোক, কালীচরণ কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করল। ভাবল, নিজেই করে ফেলবে, লোক লাগানোর দরকার নেই।

দুপুরবেলা কালীচরণ পুরোনো বাগান খুঁজে কিছু উচ্ছে, কাঁকরোল, ঝিঙে, পটল আর কুমড়ো পেয়ে গেল। দিব্যি ফলে আছে গাছে। পাকা আমও রয়েছে। সুতরাং দুপুরে কালীচরণ প্রায় ভোজ খেয়ে উঠল আজ। তারপর ঘুম।

বিকেলে চারদিক ঘুরে দেখে সে খুশিই হল। অনেকটা জঙ্গল সে নিজে সাফ করে ফেলেছিল। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, আরও অনেক বেশি আপনা থেকেই সাফ হয়ে গেছে। আবর্জনার স্তূপ প্রায় নেই বললেই হয়। আশ্চর্যের কথা, বাড়িতে আরও কয়েকটা আস্ত ঘর খুঁজে পাওয়া গেল। সেসব ঘরের জানলা দরজাও অটুট। সুতরাং কালীচরণ খুব খুশি। এইরকমই চাই।

তবে সবটা এইরকমই আপনা—আপনি হয়ে উঠলে ভারি লজ্জার কথা। তাই পরদিন কালীচরণ বাজার থেকে গোরুর গাড়িতে করে কিছু চুন—সুরকি, ইট আর কাঠ নিয়ে এল। যন্ত্রপাতি বাড়িতেই পেয়ে গেছে সে, টুকটুক করে বাড়িটা সারাতে শুরু করল।

মজা হল, বেশি কিছু তাকে করতে হল না। সে যদি খানিকটা দেয়াল গাঁথে আরও খানিকটা আপনি গাঁথা হয়ে যায়। সে এক দেয়ালের কলি ফেরালে, আরও চারটে দেয়ালের কলি আপনা থেকেই ফেরানো হয়ে যায়।

সুতরাং দেখ—না—দেখ কালীচরণের আদি ভিটের ওপর বাগানওয়ালা পুরোনো বাড়িটা আবার দিব্যি হেসে উঠল। যে দেখে, সে—ই অবাক হয়।

কিন্তু মুশকিল হল, এত বড় বাড়িতে কালীচরণ একা। সারাদিন কথা বলার লোক নেই।

কালীচরণ তাই গ্রাম থেকে গরিব বুড়ো একজন মানুষকে চাকর রাখল। বাগান দেখবে, জল তুলবে, কাপড় কাচবে, রান্না করবে। কালীচরণও কথা কইতে পেয়ে বাঁচবে।

লোকটা দিন—দুই পর একদিন রাতে ভয় খেয়ে ভীষণ চেঁচামেচি করতে লাগল। সে নাকি ভূত দেখেছে।

কালীচরণ খুব হাসল কাণ্ড দেখে। বলল, 'দূর বোকা; কোথায় ভূত?'

কিন্তু লোকটা পরদিন সকালেই বিদেয় হয়ে গেল। বলল, 'সারাদিন জল খেয়ে থাকলেও এ বাড়িতে আর নয়।'

কালীচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র। কিছুদিন আবার একা। কিন্তু কাঁহাতক ভালো লাগে। অগত্য কালীচরণ একদিন শহরে গিয়ে নিজের বউকে বলল, 'একবার চলো দেখে আসবে। সে বাড়ি দেখলে তোমার আর আসতে ইচ্ছে হবে না।'

কালীচরণের বউয়ের কৌতূহল হল। বলল, 'ঠিক আছে চলো। একবার নিজের চোখে দেখে আসি কোন তাজমহল বানিয়েছ।'

গাঁয়ে এসে বাড়ির শ্রীছাঁদ দেখে কিন্তু বউ ভারি খুশি। ছেলেমেয়েদেরও আনন্দ ধরে না।

কিন্তু পয়লা রাত্তিরেই বিপত্তি বাধল। রাত বারোটায় বড় মেয়ে ভূত দেখে চেঁচাল। রাত একটায় ছোট মেয়ে ভূতের দেখা পেয়ে মূর্ছা গেল। রাতদুটোয় দুই ছেলে কেঁদে উঠল ভূত দেখে। রাত তিনটেয় কালীচরণের বউয়ের দাঁতকপাটি লাগল ভূত দেখে।

পরদিন সকালেই সব ফরসা। বাচ্চা—কাচ্চা নিয়ে শহরে রওনা হওয়ার আগে বউ বলে গেল, 'আর কখনও এ বাড়ির ছায়া মাড়াচ্ছি না।'

কালীচরণ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আপনমনে বলল, 'কোথায় যে ভূত, কীসের যে ভূত, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যতটা না গরিব তার চেয়ে ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কিনা কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, 'এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে।' বাস্তবিকই জুতো এত ছেঁড়া আর তাপ্পি মারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুণছুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তাহলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এরপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি—কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটখাটো দর্জির কাজ সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি—চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ বা ছেলেমেয়েরাও করে নেয়।

ছোট ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে তার মধ্যে একটা ডান্ডা গলিয়ে লাটাই হল। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবু পয়সা বেঁচে গেল।

এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরানো বাড়ির রক—এ উঠে ঝুল বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতন লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, 'এই যে শ্যামবাবু! এসে গেছেন তাহলে? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।'

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না হলে বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে। দেরি হলে কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কি রঙ্গ—রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, 'আমি তো দাবা খেলতে জানি না।'

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সবসময়ে কি রসিকতা করতে হয়?'

ভেতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এইসব পুরনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনও ঢোকেননি। যেদিকে তাকান চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুললোক ভেবে এ বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে এ কথাটা ভালো করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে—মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেয়ালঘড়ির...ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, 'এঃ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া—তাপ্পি দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাখানার কী হল?

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, 'জাপানি ছাতা?'

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, 'আপনার মতো শৌখিন মানুষ ক'টা আছে বলুন।'

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপ—সপ করছিল। কদম্ববাবু জুতো জোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, 'সেই সোনালি সুতোর কাজ করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?'

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণরা টেরই পায় না যে, তারা কৃপণ। তারা ভাবে যা তারা করছে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারি লজ্জা পেলেন তিনি। এমনকী তিনি যে শ্যামবাবু নন এ কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে বলে ফেললেন, 'বর্ষকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি।'

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, 'যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল!'

কদম্ববাবু এ কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না। যেন তাঁর মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা হঠাৎ বলে উঠল, 'নাঃ আজ বোধহয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন, শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়লোকদেরও কি আর মাঝে—মাঝে গরিব সাজাতে ইচ্ছে যায় না। নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালি —মারা জামা, পরনে হেঁটে ধুতি হয় কী করে!'

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, 'ঠিক ধরেছেন বটে।'

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কি শ্রী! দু—ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল—বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নিচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড় একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তা শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

দু—ধারে সারি—সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক—একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে।...

নাঃ কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে—উঠতে বলল, 'কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখান ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!'

কদম্ববাবু হেঃ—হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ সিঁড়িতে পা রাখতেই তাঁর লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রুপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রুপো। রুপোর ফুলদানি, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেয়ালে রুপোর বাঁধানো বড়—বড় ফোটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, 'হল কী শ্যামবাবুর অ্যাঁ। এ বাড়ি আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে থেকে হেদিয়ে পড়লেন। আসুন তাড়াতাড়ি।'

'সোনামহল্লা' কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপো মহলেই যে লাখো—লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে।

কিংখাবের একটা পরদা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে—কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লায় সব কিছুই সোনার। এমনকী পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওয়ালা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা—ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝে একটা বিরাট সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনায় বাঁধানো আরাম—কেদারায় বসে ছিলেন তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, 'এই যে শ্যামকান্ত এসো।'

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা—ই নয়, প্রত্যেকটি খোপে আবার হীরে, মুক্তো, চুনি আর পান্না বসানো। একধারে সোনার ঘুঁটি, অন্যধারে রুপোর।

প্রত্যেকটি ঘুঁটির মাথায় আবার এক কুচি করে হীরে বসানো।

'বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা। এই হল আমার বাজি।'

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সর ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড় হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

'তুমি কি বাজি রাখবে শ্যামবাবু?'

কদম্ববাবু আমতা—আমতা করে বললেন, আমি গবির মানুষ, কী আর বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ—হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, 'গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয় সে আবার কেমন গরিব?'

'আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন।'

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সে কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।'

'টাকার ওপর ঘেন্না। কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ—হাঁ করে উঠল।'

কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আজ সকালে মনটা খারাপ ছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। কী করলুম জানো? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।'

'অ্যাঁ?'

'শুধু কি তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুড়ে কাক তাড়ালুম। তাতে একটু মনটা ভালো হল। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হীরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।'

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামাল দিলেন। 'লোকটা বলে কী?'

কর্তাবাবু বললেন, 'এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে না?'

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, 'টাকা—পয়সা হীরে—জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।'

'কলম।' কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উলটোদিকে।

'কিন্তু চাল?' দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, 'শাবাশ!'

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে! অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! আমি যে মাত।

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে, কদম্ববাবুর মাথা ঝিম—ঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুট্টি ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি! চারদিকে চুন—বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল। ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝেয় পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে।

কদম্ববাবু পড়ি কি মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনোরকমে বাইরের দরজায় পৌঁছলেন। দরজাটা অক্ষত আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবতে লাগলেন সত্যিই তো টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি।

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন নতুন একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্যে কেনাকাটা করাটা ভালো দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি ও ছেলেমেয়েদের জন্য জামা—কাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল তাঁর।

নিশি কবরেজ

হারানো একটা পুঁথিতে নিশি কবরেজ একটা ভারি জব্বর নিদান পেয়েছেন। গাঁটের ব্যথার যম। তবে মুশকিল হল পাচনটা তৈরি করতে যে পাঁচরকম জিনিস লাগে তার চারটে জোগাড় করা যায়। কিন্তু পাঁচ নম্বরটাই গোলমেলে। পাঁচ নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আধ ছটাক ভূত।

নিশি কবরেজ রাতে খাওয়ার পর, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আচমন করছিলেন। ঘুটঘুটি অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিঃঝুম। শীতকালের কুয়াশা আর ঠান্ডাটাও জেঁকে পড়েছে। আঁচাতে—আঁচাতে নিশি কবরেজ পাচনটার কথাই ভাবছিলেন। রাজবল্লভবাবু বিরাট বড়লোক! কিন্তু গাঁটের ব্যথায় শয্যাশায়ী। ব্যথাটা আরাম করতে পারলে রাজবল্লভবাবু হাজার টাকা অবধি দিতে রাজি বলে নিজে মুখে কবুল করেছেন। কিন্তু ভূতটাই সব মাটি করলে। আধ ছটাক ভূত এখন পান কোথায়? হঠাৎ নিশি কবরেজের মনে হল, উঠোনের ওপাশটায় হাঁসের ঘরের পাশটায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

'কে রে? ওখানে কে?'

কেউ জবাব দিল না।

নিশি কবরেজ জলের ঘটিটা ঘরে রেখে হ্যারিকেন আর লাঠিগাছা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দিনকাল ভালো না। চোর—ছ্যাঁচড়ের দারুণ উপদ্রব। ঘরে কিছু কাঁচা টাকাও আছে। সোনাদানাও মন্দ নেই।

বাঁ—হাতে হ্যারিকেনটা তুলে ডানহাতে লাঠিটা নাচাতে—নাচাতে কয়েক পা এগোতেই উঠোনের ওপাশ থেকে একটু গলা খাঁকারির বিনয়ী শব্দ হল। চোরের তো গলা খাঁকারি দেওয়ার কথা নয়।

'কে রে? ওখানে কে?'

ওপাশ থেকে খোনাস্বরে জবাব এল। 'ইয়ে, আমি হলুম গে রামহরি— না, না থুড়ি, আমি হলুম ধনঞ্জয়।'

নিশি কবরেজ আলোটা ভালো করে তুলে ধরে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বললেন, রামহরি বা ধনঞ্জয় নামে এ গাঁয়ে আবার কে আছে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি। দরকারটাই বা কী? রুগি দেখতে হলে রাতে বিশেষ সুবিধে হবে না বলে রাখছি। দিনের বেলা এসো।

কে যেন বলে উঠল, 'আজ্ঞে ওসব কিছু নয়।'

নিশি কবরেজ লোকটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না। তাঁর চোখের জোর কিছু কম নয়। হ্যারিকেনেও কালি পড়েনি। তবু ভালোমতো লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন, হাঁসের ঘরের পাশে খুব কালো একটা লম্বাপানা ছায়া—ছায়া কী যেন।

নিশি কবরেজ মনে—মনে ভাবলেন, 'এঃ চোখের বোধহয় বারোটা বাজল এতদিনে। না, কাল থেকে চোখে তিনবেলা ত্রিফলার জল দিতে হবে।

নিশি কবরেজ বললেন, 'রুগির ব্যাপার নয়, তো এত রাতে চাও কী? চোর টোর নও তো বাপু?'

'আজ্ঞে না, চোর—ডাকাত হওয়ার উপায়ও নেই কি না। একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আজ্ঞে।'

'সমস্যাটা কী?'

'আজ্ঞে বলে দিতে হবে যে আমি রামহরি, না ধনঞ্জয়।'

নিশি কবরেজ খ্যাঁক করে উঠে বললেন, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি রামহরি না ধনঞ্জয় তা আমি কী করে বলব? আমি তোমাকে চিনিই না।'

'আজ্ঞে আপনি আমাদের চেনেন—থুড়ি—চিনতেন। আমরা দুজনেই গেলবার ওলাউঠায় মরলুম, মনে নেই? আপনার পাচন ফেল মারল।'

নিশি কবরেজ আঁতকে উঠে বললেন, 'তোমরা? ওরে বাবা।'

'আজ্ঞে ভয় খাবেন না। আমরা ভারি দুর্বল জিনিস।'

নিশি কবরেজ কাঁপতে—কাঁপতে বললেন, পাচনের দোষ নেই বাবা, সবই কপালের ফের। আমাকে তোমরা মাপ করো।

'আজ্ঞে সেজন্য আপনাকে আমি দুষতে আসিনি। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা একটা দেখা দিয়েছে। ভূত হওয়ার পর আমরা সব কেমন যেন ধোঁয়াটা মার্কা হয়ে গেলুম। শরীর—টরীর নেই, তবে কী করে যেন আছি। তা আমরা অর্থাৎ আমি আর ধনঞ্জয়—মানে আমি আর রামহরি—মানে কে যে কোন জন তা বলা মুশকিল— তা আমরা দুজন খুব মাখামাখি করি। খুব বন্ধুত্ব ছিল তো দুজনে। এ ওর শরীরে ঢুকে যাই, ও এর শরীরে মিশে যায়। কিন্তু ওই মাখামাখি করতে গিয়েই কে যে কোনজন তা গুলিয়ে গেছে।'

'বলো কী?'

'আজ্ঞে সেই কথাটাই বলতে আসা। দুজনে প্রায়ই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। কখনও আমি বলি যে, আমি রামহরি ও ধনঞ্জয়। কখনও বলে যে, ও রামহরি আর আমি ধনঞ্জয়।'

নিশি কবরেজ এই শীতেও ঘামছিলেন। হাতের হ্যারিকেন আর লাঠি দুই—ই ঠকঠক করে কাঁপছে। পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে। মাথা ঘুরছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, গাঁটের ব্যথার পাচনটার জন্য আধ ছটাক ভূত লাগবে।

নিশি কবরেজ একগাল হাসলেন। তাঁর হাত—পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'এ আর বেশি কথা কী? তবে এখন তোমার যেমন বেগুন পোড়ার মতো চেহারা হয়েছে তাতে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। একটু ধৌতি দরকার। বেশি কষ্ট হবে না। একটা পাচনের মধ্যে মিনিট দশেক সেদ্দ করে নেব তোমাকে, তাতেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে।'

'বটে!' বলে কালো জিনিসটা এগিয়ে এল।

নিশি কবরেজ আর দেরি করলেন না। নিশুতিরাতেই পাচনটা উনুনে বসিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ভূতটা সেদ্ধ হতে—হতে মাঝে—মাঝেই মাথা তুলে বলে, হল?

নিশি কবরেজ অমনি কাঠের হাতাটা দিয়ে সেটাকে ঠেসে দিতে—দিতে বলেন, হচ্ছে হে হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করলে কী হয়? তোমার তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ছে না হে!

পাচনটা ভোররাতে তৈরি হয়ে গেল। আর আশ্চর্যের বিষয় ভূতের ঝুলকালো রংটাও একটু ফ্যাকাসে মারল। নিশি কবরেজ খুব ভালো করে জিনিসটাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'আরে, তুমি তো রামহরি।'

ভূতটা একথায় ভারি খুশি হয়ে বলল, 'আজ্ঞে বাঁচালেন, ধনঞ্জয়ের কাছে রামহরি শ'তিনেক টাকা পেত কিনা। ভারি দুশ্চিন্তা ছিল আমার। পেন্নাম হই আজ্ঞে। বলে ভূতটা হাওয়ায় মিশে গেল।'

নিশি কবরেজ পাচনটা বোতলে পুরে নিশ্চিন্ত মনে তামাক খেতে বসলেন, বড্ড ধকল গেছে।

গুপ্তধন

ভূতনাথবাবু অনেক ধার—দেনা করে, কষ্টে জমানো যা—কিছু টাকা—পয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তাঁর বাড়ির কারও পছন্দ হল না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন—চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেওয়ালে শ্যাওলা, অশ্বত্থের চারা গজাচ্ছে, দেওয়ালের চাপড়া বেশির ভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো—টুটো। মেঝের অবস্থাও ভালো নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিঁটকে বলেই ফেললেন, এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়। ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয় তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়! তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছ ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।

কথাটা ঠিক। এই মহীগঞ্জের মতো ছোট গঞ্জেও বাড়ি ভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওয়ালা নিত্যই তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স—প্যাঁটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি—খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করতে আর ঘর সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে ধীরে বাড়ির একটালক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ—চিঁড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসীর মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তা আপনি কে?

আজ্ঞে আমি হলুম পরাণচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।

অ। তা কাকে খুঁজছেন?

আমাকে আপনি আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।

তাই নাকি?

আজ্ঞে, তা বাবু, কিছু পেলেন—টেলেন? সোনাদানা বা হীরে—জহরত কিছু?

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, তাই বলো! এইজন্য পুরোনো বাড়ি খুঁজে বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

ভালো করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে ঠুকে দেখবেন কোথাও কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয় কি না।

বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কি আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।

পরাণ তবু হাল না ছেড়ে বলল, তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশ বছরের পুরোনো বাড়ি।

তা হতে পারে।

আর একটা কথা বাবু, তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?

কে? কাদের কথা বলছ?

ওই ইয়ে আর কী—ওই যে রামনাম করলে যারা পালায়।

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।

না বাবু, অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তাঁরা কুপিত হলেই মুশকিল।

তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তাঁরাও থাকবেন, আমিও থাকব।

একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বোসো বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।

লোকটা সসঙ্কোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, তা বাবু, বাড়িটা কতয় কিনলেন?

তা বাপু, অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকর্জও হয়ে গেল মেলা।

উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।

গরিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড্ড ধকল গেছে।

আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি। ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধে হয়—হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরাণ দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হল। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, তা পরাণ, তুমি এখন কোথাও যাবে?

পরাণ একটা হাই তুলে বলল, তাই ভাবছি।

ভাবছ মানে! তোমার বাড়ি নেই?

আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরোনো বাড়ি অনেক সময় ভারি পয়মন্ত হয়।

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আহা, এই সন্ধেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো তোমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে ঢুকলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন—চারখানা ঘর আছে। বস্তা—টস্তা পেতে শুতে পারবে না?

পরাণ দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল সোজা গাঁয়ের লোক দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, চোরটোর নয় তো?

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকা পয়সা কোথা?

পরাণ দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা খেঁটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুকঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কাণ্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হল। পাগল আর কাকে বলে।

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোল। শুধু পরাণ দাস বলল, আমি একটু চারদিক ঘুরেটুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কাণ্ড ঘটে কিনা।

মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, কে?

সামনে হ্যারিকেন হাতে পরাণ দাস। চাপা গলায় বলল, পেয়েছি বাবু।

অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, কী পেয়েছ?

যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।

ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, বুড়োকর্তাটা আবার কে?

একশ বছর আগে এ বাড়িটা তো তাঁরই ছিল কিনা। বড্ড ভালো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন দুধে—আলতায়। খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।

একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, তুমি নিজে তো পাগল বটেই, এবার আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।

বিশ্বাস হল না তো বাবু। আসুন তাহলে, নিজের চোখেই দেখবেন।

বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতূহলও হল।

পরাণ দাসের পিছু পিছু বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তূপাকার ইঁট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।

এ সব কী করেছ হে পরাণ? মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছ।

যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালো মতো কলসি জাতীয় কিছু।

আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারী, দুজনা না হলে টেনে তোলা যাবে না।

ভূতনাথবাবুর হাত—পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। বললেন, কী আছে ওতে?

তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।

ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখঢাকা ভারী কলসিটা দুজনে মিলে অতি কষ্টে তুললেন ওপরে। পরাণ একগাল হেসে বলল, এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।

বেশ বড় পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হ্যারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।

বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো। যান, আপনার আর কোনো দুঃখ থাকল না। দু'তিন পুরুষ হেসেখেলে চলে যাবে।

ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরাণের দিকে চেয়ে বললেন, এসব সত্যি তো! স্বপ্ন নয় তো!

না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়ো কর্তার সব কিছু এর মধ্যে। এত দিনে গতি হল।

ভূতনাথবাবু পরাণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পাগল হলেও তুমি খুব ভালো লোক। এর অর্ধেক তোমার।

পরাণ সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকা—পয়সায় আমার কী হবে বাবু?

তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?

না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকা—পয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।

ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?

আজ্ঞে, ওইটে আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।

পরাণ দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাব? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইঁটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

শিবেনবাবু ভালো আছেন তো

হরসুন্দরবাবু একটু নাদুসনুদুস, ধীর—স্থির—শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরেন, ফুলহাতা জামার গলা অবধি বোতাম আঁটেন, কখনও হাতা গোটান না। শীত—গ্রীষ্ম সবসময়ে তিনি হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু পরেন। তাঁর বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ আছে। চুলে পরিপাটি সিঁথি। হরসুন্দরবাবু খুব নিরীহ মানুষও বটে।

সেদিন মাসের পয়লা তারিখ। হরসুন্দরবাবু সেদিন বেতন পেয়েছেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছেন। যে গলিটায় তিনি থাকেন সেটা বেশ অন্ধকার, পাড়াটাও ভালো নয়। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগোতেই তিনটে ছোকরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। একজন বুকে রিভলভার ঠেকাল, একজন পেটে আর অন্যজন পিঠে দুটো ছোরা ধরল। রিভলভারওলা বলল, 'চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।'

হরসুন্দরবাবু খুবই ভয় পেলেন। ভয়ে তাঁর গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, 'প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।'

মাইনের পুরো টাকাটা নিয়ে তিনজন হাপিস হয়ে গেল। হরসুন্দরবাবু ভয়ে চেঁচামেচি করলেন না যদি তারা ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরেও কারও কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন এ মাসটা ধারকর্জ করে চালিয়ে নিলেই হবে।

তা নিলেনও হরসুন্দরবাবু। একটা মাস দেখতে—দেখতে চলে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

ফেরার সময় যখন গলির মধ্যে ঢুকলেন তখন আচমকা ফের তিনটে লোক ঘিরে ধরল। বুকে রিভলভার, পেটে পিঠে ছোরা।

রিভালভারওলা বলল, 'যা আছে দিয়ে দিন। চেঁচাবেন না।'

হরসুন্দরবাবু ফের ভয়ে কাঁপতে—কাঁপতে বললেন, 'প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।'

মাইনের টাকা নিয়ে লোক তিনটে হাপিস হয়ে গেল।

হরসুন্দরবাবু এবারও বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, এ মাসটাও কোনোরকমে চালিয়ে নেবেন।

কষ্ট হল যদিও, কিন্তু হরসুন্দরবাবু চালিয়ে নিলেন। ফের পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার গলিতে ঠিক আগের মতোই তিনটে লোক ঘিরে ধরল তাকে। বুকে—পিঠে—পেটে ঠিক একই জায়গায় রিভালভার আর ছোরা ধরল। একই কথা বলল, এবং বেতনের টাকাটা নিয়ে হাওয়া হল।

হরসুন্দরবাবুর আজ চোখে জল এল।

বাড়ি ফিরে তিনি গুম হয়ে রইলেন। রাতে ভালো করে খেলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে ভাবলেন, কী যে করব বুঝতে পারছি না।

কাছে পিঠে কে যেন একটা হাই তুলল, তারপর আঙুল মটকানোর শব্দ হল, তারপর বলল, 'হবি, হবি।' হরসুন্দরবাবু চারদিকটা চেয়ে দেখলেন। ছাদ জনশূন্য, শীতকালের গভীর রাত্রে ছাদে আসবেই বা কে?

তিনি কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কে?'

'ভেবে দেখতে হবে হে, ভেবে দেখতে হবে।'

'তার মানে?'

'কতবার জন্মেছি তার কি হিসেব আছে? কোন জন্মে কে ছিলুম তা যে গুবলেট হয়ে যায় বাপ। এ জন্মে বিশু তো ও জন্মে নিতাই, পরের জন্মে হয়তো চিঁনেম্যান চাঁই চুঁই।'

'আ—আপনি কোথায়? দে দেখতে পাচ্ছি না তো!'

গলার স্বরটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'দেখার চোখ আছে কি তোমার যে দেখবে? সারাদিনই তো তোমার ধারেকাছে ঘুরঘুর করি, দেখতে চেয়েছ কি কখনও?'

'আজ্ঞে, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, ভয় পাচ্ছি, মাথা ঝিমঝিম করছে।'

'আ মোলো! এ যে ভালো করতে এসে বিপদ হল।'

'আ—আপনি কী চান?'

'তোমার মতো গবেটদের কান দুটো মলে দিতেই চাই হে।

কিন্তু বিধি বাম সে উপায় নেই।'

'আমি কী করেছি? আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন?'

'রাগ করব না? তিনটে কাঁচা মাথার ছোঁড়া তিন—তিনবার যে তোমাকে বোকা বানাল তা থেকে শিক্ষা পেয়েছ কি? কিছু করতে পারলে?'

'আজ্ঞে কী করব? তাদের হাতে যে ছোরা আর বন্দুক।'

'আর তোমার বুঝি কিছু নেই?'

'আজ্ঞে না।'

'কে বলল, নেই?'

'ইয়ে, আমার বন্দুক, পিস্তল বা ছোরাছুরি নেই। তবে আমার গিন্নির একখানা বঁটি আছে, আর আমার ছেলে ভুতোর একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আছে, আর আমার মায়ের বেড়াল তাড়ানোর জন্য একখানা ছোট লাঠি আছে।'

'আহা, ওসব জানতে চাইছে কে? বঁটি—লাঠির কথা জিগ্যেস করেছি কি তোমায়? বলি এসব ছাড়া তোমার আর কিছু নেই?'

'আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার একটা গাদা বন্দুক ছিল।'

'গবেট আর কাকে বলে? বলি বন্দুক—টন্দুক ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?'

'আজ্ঞে না।'

'বলি, বুদ্ধি বলে একটা বস্তু আছে জানো তো!'

'জানি।'

'তোমার সেটাও নেই?'

আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হল। তারপর গলার স্বরটা বলল, 'শোনো, এবার যখন ওই মর্কটগুলো তোমাকে পাকড়াও করবে তখন একটুও ঘাবড়াবে না। হাসি—হাসি মুখ করে শুধু জিগ্যেস করবে, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!'

'শুধু এই কথা বললেই হবে?'

'বলেই দেখো না।'

তৃতীয় মাসটাও কষ্টেসৃষ্টে কেটে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল এবং হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় বুকটা দুরুদুরু করছিল। যে—কথাটা বলতে হবে তা বারবার বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন। হাত—পা—কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলির মুখে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দুর্গা বলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই তিন মূর্তি ঘিরে ফেলল তাঁকে। বুকে পিস্তল, পেটে আর পিঠে ছোরা।

পিস্তলওলা বলল, 'চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।'

জীবনে কোনো সাহসের কাজ করেননি হরসুন্দরবাবু। আজই প্রথম করলেন। জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো?'

ছেলে তিনটে হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর তার পরেই দুড়দাড় দৌড়ে এমনভাবে পালাল যেন ভূত দেখেছে।

হরসুন্দরবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই সামান্য কথায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে? যাক গে, এবার মাইনের টাকাটা তো বেঁচে গেল।

না, এর পর থেকে হরসুন্দরবাবুকে আর ওদের পাল্লায় পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর ধাঁধাটা গেল না। এই তো সেদিন তাঁর অফিসের বড়বাবু তাঁকে কাজের একটা ভুলের জন্য খুব বকাঝকা করে চার্জশিট দেন আর কী? হরসুন্দরবাবু শুধু হাসি—হাসি মুখ করে তাঁকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!' তাইতে বড়বাবু এমন ঘাবড়ে গেলেন, যে আর বলার নয়। তারপর থেকে খুবই ভালো ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

সে দিন বাজার থেকে পচা মাছ এনেছিলেন বলে হরসুন্দরের গিন্নি তাঁকে খুবই তুলোধনা করছিলেন। হরসুন্দরবাবু তাঁকেও বললেন, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো। গিন্নি একেবারে জল।'

'হ্যাঁ, এখন হরসুন্দরবাবু খুবই ভালো আছেন। কোনো উদ্বেগ, অশান্তি নেই, বিপদ দেখা দিলেই তিনি শুধু বলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! মন্ত্রের মতো কাজ হয়।

দুই সেরি বাবা

ভুবন মানুষটা ভালো, কিন্তু তার কপাল ভালো নয়। কপালের ফেরে তার মা বসন্তকুমারী অতিশয় রগচটা মহিলা। মায়ের দাপটে আর গলাবাজির চোটে পাড়া—প্রতিবেশীরা কেউ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। আবার কপালের দোষে ভুবনের বউ নয়নতারাও হল সাংঘাতিক দজ্জাল।

নয়নতারাকে পছন্দ করে ভুবনের বউ করে এনেছিলেন মা বসন্তকুমারী। এখন শাশুড়ি—বউয়ে সকাল থেকে রাত ইস্তক রোজ এমন কুরুক্ষেত্র হয় যে, কহতব্য নয়। ঝগড়ার চোটে বাড়ির পোষা বেড়ালটা বিদায় নিল। পোষা নেড়ি কুকুরটাও মনের দুঃখে করালীবাবুর বাড়িতে গিয়ে জুটেছে। ডাকলেও আসে না। কাকপক্ষীরাও আনাগোনা বন্ধ করেছে। বাঙাল ভিখিরিরা অবধি এ—বাড়ির ছায়া মাড়ায় না।

ভুবনেরও মাঝে—মাঝে সন্নিসি হওয়ার ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু ঠিক সাহস পায় না। সন্নিসি হলে লেংটি পরে থাকতে হবে, ভিক্ষে করে খেতে হবে। সাধন—ভজনের হ্যাপাও তো কম নয়। মা আর বউয়ের ঝগড়ার চোটে অনেকদিন বাড়িতে রান্নাই হয় না। ভুবন না খেয়েই দোকানে গিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে। দোকান তার ভালোই চলে, আয়ও কম হয় না। তবে মনে সুখ নেই।

আজ ভোররাত থেকেই বসন্তকুমারী আর নয়নতারায় ঝগড়া লেগেছে। ভুবন বাড়িতে টিকতে না পেরে সাতসকালেই এসে দোকান খুলে বসেছে। সন্নিসি হবে না গলায় দড়ি দেবে সে—কথাই বসে বসে ভাবছে। এত সকালে কর্মচারীরা আসে না, খদ্দেরও জোটে না। তাই নিরিবিলিতে বসে সুখরামের দোকান থেকে আনানো ভাঁড়ের গরম চা খেতে খেতে নিবিষ্ট মনে ভুবন ভাবছিল, সন্নিসি না গলায় দড়ি?

এমন সময়ে কে যেন বলে উঠল, "ব্রাহ্মণভোজন।"

ভুবন অবাক হয়ে দেখল, একজন আধবুড়ো, দাড়ি—গোঁফওয়ালা লোক সামনে দাঁড়িয়ে। পরনে গেরুয়া রঙের একটা জোব্বামতো। মাথায় ঝুঁটি। সাধু—বৈরাগী হতে পারে। ফকির—দরবেশ কি আউল—বাউল হওয়াও বিচিত্র নয়।

ভুবন বলল, "আপনি কে?"

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, "সন্নিসি হওয়া বা গলায় দড়ি দেওয়ার চাইতে ব্রাহ্মণভোজন করানো অনেক ভালো।"

ভুবন তাড়াতাড়ি উঠে লোকটার পায়ের ধুলো নিয়ে গদগদ হয়ে বলল, "আপনি কি অন্তর্যামী?"

লোকটা খ্যাঁক করে উঠে বলল, "অন্তর্যামী হওয়াটা কি খুব সুখের ব্যাপার বলে ভেবেছ নাকি হে বাপু? দিনরাত মানুষের মনের মধ্যে যত আ—কথা—কু—কথা বুড়বুড়ি কাটছে সেগুলো কান দিয়ে ভেতরে এসে সেঁধোচ্ছে, সেটা কি ভালো হচ্ছে রে বাপু? দুটো কান অপবিত্র হচ্ছে রোজ। গঙ্গাজল দিয়ে রোজ পরিষ্কার করতে হয়। নাঙ্গাবাবা যে কী বিভূতিই দিলেন, এখন হয়েছে জ্বালা।"

ভুবন হেঁঃ হেঁঃ করে বলল, "আজ্ঞে, পাপী—তাপীদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলেনই মহারাজ।"
"থাক, থাক, আর দাঁত বের করে বিনয় দেখাতে হবে না। বলি, খাঁটি সর্ষের তেল আছে?"
ভুবন হাতজোড় করে বলল, "আছে বাবা, আছে।"
"তাই এক পলা বের করো তো বাপু। গায়ে খড়ি উঠছে। তা খড়ি ওঠারই বা দোষ কী? কৈলাস থেকে হেঁটে আসছি, চারদিন স্নান নেই।"
বলেই জোব্বাটা খুলে ফেলল লোকটা। আদুর গা হয়ে একটা টুল টেনে বসে বলল, "বেশ ডলাইমলাই করে তেলটা মেখে দাও তো হে বাপু।"
ভুবন যেন বর্তে গেল। খুব যত্ন করে তেল মাখতে মাখতে বলল, "তা বাবা, আপনার শ্রীনামটি কি শুনতে পাই না?"
"তা পাবে না কেন? নাম তো পাঁচজনকে বলার জন্যই। তবে এ হল সাধনমার্গের নাম। আমাকে সবাই আদর করে 'দু'সেরি বাবা' বলে ডাকে। সকাল—বিকেল দু'সের করে খাঁটি গোরুর দুধ খাওয়ার অভ্যাস কিনা।"
চোখ বড়—বড় করে ভুবন বলল, "এক—এক বারে?"
"ওরে বাপু, দুধ কি আর আমি খাই? সাধনভজনে আত্মার যে মেহনত হয়, তাতে দু'সের দুধ তো নস্যি। ওটা আত্মাই টেনে নেয়।
ওরে বাপু, নতুন গামছা আছে?"
"এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।"
"ওই সঙ্গে একজোড়া নতুন ধুতি আর দু'খানা ভালো গেঞ্জিও আনিয়ে রাখ। আর আমি পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে—আসতে যেন দু'সের দুধ তৈরি থাকে। দুপুরে ব্রাহ্মণভোজনে কী—কী লাগবে তা এসে বলছি।"
ভুবন খুব কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আজ্ঞে, ব্রাহ্মণসেবা করা তো ভাগ্যের ব্যাপার বাবা, কিন্তু আমার যে বাড়িতে বড় অশান্তি।"
হাঃ হাঃ করে হেসে দু'সেরি বাবা বলে, "সে কি আর জানি না রে মূর্খ! তোর জন্যই তো কৈলাস থেকে এত দূর কষ্ট করে আসতে হল। তোর দুঃখে স্বয়ং শিবের সিংহাসন নড়ে গেছে। বাবা শিবই তো আমাকে ডেকে বললেন, 'যা তো দু'সেরি, গিয়ে একটু দেখে আয়, ছেলেটা এত কষ্ট পাচ্ছে কেন?"
ভুবন গদগদ হয়ে বলল, "বটে বাবা! স্বয়ং শিব পাঠিয়েছেন আপনাকে?"
"তবে আর বলছি কী রে ব্যাটা! যা, দুধের জোগাড় দেখ রে।"
দু'সেরি বাবা স্নান করে এসে কাচি ধুতি পরে দু'সের দুধ শেষ করে বললেন, "এবার চল ব্যাটা, তোর বাড়িতে ব্রাহ্মণসেবার ব্যবস্থা দেখি গে।"
ভুবনের বাড়ি কাছেই। খুব ভয়ে—ভয়ে ভুবন দু'সেরি বাবাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকতেই দেখতে পেল ভেতরের বারান্দায় বসন্তকুমারী আর নয়নতারার হাতে খুন্তি।
বসন্তকুমারী বলছে, "মুখপুড়ি, শাঁকচুন্নি..."
নয়নতারা বলছে, "ডাইনিবুড়ি, শনের নুড়ি..."
হঠাৎ দু'সেরি বাবা বাজখাঁই গলায় হাঁক মারল, "বসন্তকুমারী! নয়নতারা! তোমাদের এত অধঃপতন হয়েছে?"
অচেনা একটা লোককে হঠাৎ এরকম বজ্রগম্ভীর গলায় তাদের নাম ধরে ডাকতে দেখে দু'জনেই থেমে গেল।
তারপরই বসন্তকুমারী তেড়ে এল, "কে রে তুই ড্যাকরা?"
খুন্তি উঁচিয়ে নয়নতারাও বলল, "কে এলেন রে গুরুঠাকুর!"

দু'সেরি বাবা অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বলে উঠল, ''ওরে, ঝগড়া করবি তো বাপের বেটির মতো কর। ও কীরকম ধারা মিনমিনে ঝগড়া তোদের? তোদের ঝগড়ার ছিরি দেখে কৈলাসে যে মা—দুর্গা হেসে কুটুপাটি। আমাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, এই দু'জনের তো এখনও ঝগড়ার দুধের দাঁতই গজায়নি, তবু কেমন মিউমিউ করছে দ্যাখ। যা বাবা, ওদের একটু ঝগড়ার পাঠ দিয়ে আয়।''

শাশুড়ি—বউ দু'জনেই দু'জনের দিকে একটু চেয়ে ঝগড়া ভুলে দু'সেরি বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ''জোচ্চুরি করার আর জায়গা পাওনি! মা দুগ্গা পাঠিয়েছে তোমাকে! দেব ভূত ঝেড়ে।''

হাসি—হাসি মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দু'সেরি বাবা বলল, ''ওরে, তোদের হবে। প্রতিভা আছে, সাধনা নেই। তাই তো আমার আসা।''

বসন্তকুমারী ফোঁস করে উঠল, ''এঃ, কোথাকার কে আমাকে ঝগড়া শেখাতে এলেন রে!''

নয়নতারাও ঝেঁঝে উঠল, ''দেব মুখে নুড়ো জ্বেলে।''

দু'সেরি বাবা মাথা নেড়ে বলল, ''হচ্ছে না, হচ্ছে না। গলায় তোদের কোনো হুল নেই, বিষ নেই, ঝাঁজ নেই, ধক নেই। কলজের জোর কম, দমেরও বালাই নেই। তা ছাড়া কোথায় সম পড়বে, কোথায় [illegible] তারও তো ঠিক—ঠিকানা পাচ্ছি না। তোদের যে একেবারে গোড়া থেকে শেখাতে হবে। ওরে ভুবন, বাড়িতে তানপুরা নেই?''

''আজ্ঞে না, মহারাজ।''

''হারমোনিয়াম আছে?''

''তা আছে একটা।''

''শিগগির নামা। আর পারলে ওবেলা একজন খোলদার ধরে আনিস। ঝগড়ার সঙ্গে খোলটা জমে ভালো।''

ভুবন হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দিয়ে টুক করে সরে পড়ে সটান দোকানে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। বাড়িতে কী হচ্ছে ভেবে বুকটা বড় দুরুদুরু করল সারাক্ষণ।

দুপুরবেলা বাড়িতে এসে তাজ্জব। ভেতরের বারান্দায় দু'সেরি বাবা খেতে বসেছে। কাঁসার থালায় ভাত, থালা ঘিরে পঞ্চব্যঞ্জন। মাছের মুড়ো, তিনরকম মাছ, ধোঁকার ডালনা, বাটিচচ্চড়ি, পায়েস, এলাহি আয়োজন। নয়নতারা ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করছে, বসন্তকুমারী কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছে, দু'সেরি বাবাকে।

ভুবনকে দেখে দু'সেরি বাবা উদার গলায় বলে, ''আয় বেটা, আয়। তোর ঘরে যে সাক্ষাৎ মা—মনসা আর চামুণ্ডার বাস। তুই তো ভাগ্যবান রে। এ বলে আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে। তালিম দিতে গিয়ে দেখি দু'জনেই ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে এসেছে। সাধনা করলে অনেক ওপরে উঠতে পারবে। তবে একটু সংযম, ধৈর্য আর পরিশ্রমের দরকার।''

''যে আজ্ঞে, বাবা।''

দুপুরে দু'সেরি বাবা একটু টেনে দিবানিদ্রা দিল। ভুবন খেয়ে উঠে দেখল, তার মা আর বউ রান্নাঘরে মুখোমুখি বসে খাচ্ছে আর খুব ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা কইছে।

দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে উঠে ভুবন দেখল, দু'সেরি বাবা মাদুর পেতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে, তার একধারে বসন্তকুমারী, অন্যধারে নয়নতারা।

দু'সেরি বাবা বসন্তকুমারীর দিকে চেয়ে বলল, ''এবার শুরু করো মা। মুখপুড়ি বলার সময় একটু শুদ্ধ নি লাগাতে হবে, মনে থাকে যেন।''

বসন্তকুমারী ভারি কুণ্ঠিত হয়ে বলল, ''আমার কি আর বুড়োবয়সে ওসব হবে বাবা।'

''আরে, হবে, হবে। আয় নয়নতারা—মা তুমি যখন ডাইনিবুড়ি বলবে তখন কড়ি মধ্যম...''

নয়নতারা লাজুক মুখে বলল, ''বড্ড লজ্জা করছে যে বাবা...''

দৃশ্যটা দেখে ভুবনের চোখে জল এল। তার জীবনে যে এমন সুদিন আসবে তা সে কখনও কল্পনাও করেনি।

না, লোকটা যদি ঠক—জোচ্চরও হয় তো হোক। ভুবন দু'সেরি বাবাকে ছাড়বে না।

কবচ

আরে হরিপদবাবু যে!

প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম!

প্রাতঃপ্রণাম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না মশাই?

তার তাড়াহুড়ো নেই, ক্রমে—ক্রমে চিনবেন। আগে কুশলপ্রশ্নাদি সেরে নিই তারপর তো অন্য কথা। তা বলি আপনার খিদে—টিদে ঠিকমতো হচ্ছে তো? রাতে বেশ সুনিদ্রা হয় তো? কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে তো?

দেখছেন তো মশাই, বাজার যাচ্ছি। এখন কি আর এত খতেনের জবাব দেওয়ার সময় আছে?

কিন্তু হরিপদবাবু, প্রশ্নগুলোকে তুচ্ছ ভাববেন না। এসব প্রশ্নের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্যও থাকতে পারে তো! এই যে ধরুন, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাতে ভালো ঘুমোননি, নানারকম দুশ্চিন্তা করেছেন। আপনার তেমন খিদেও হচ্ছে না বলে মুখখানা আঁশটে করে রেখেছেন। কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না বলে আপনার মেজাজটাও বেশ তিরিক্ষি। ঠিক কি না!

তা খুব একটা ভুলও বলেননি বটে। আপনার মতলবখানা কী বলুন তো?

চলুন, বাজারের দিকে হাঁটতে—হাঁটতেই দুটো কথা কয়ে নিই।

কথা কওয়ার উদ্দেশ্যটা কী একটু বলবেন? খামোখা একজন উটকো লোকের সঙ্গে হাপরহাটি বকে মরার সময় আমার নেই।

আহা, চটে যাচ্ছেন কেন? ষষ্ঠীচরণ যে আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পায় আর সুদসমেত সেই পাঁচ হাজার যে পঞ্চাশ হাজার দাঁড়িয়ে যেতে বসেছে, আর পচা গুন্ডা যে ষষ্ঠীচরণের হয়ে আপনার গলায় গামছা দিয়ে প্রতি মাসে অন্যায্য টাকা আদায় করছে, সে তো আর আমার অজানা নয়।

দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। এসব গুহ্য কথা আপনি জানলেন কী করে? মেয়ের বিয়ের সময় মোটে পাঁচটি হাজার টাকা ষষ্ঠীচরণের কাছে ধার নিয়েছিলুম। তখন কি আর জানতুম যে ওই পাঁচ হাজারের ফেরে আমার ঘটিবাটি চাঁটি হওয়ার জোগাড় হবে। ঠিকই বলেছেন মশাই, আমার খিদে হচ্ছে না, ঘুম উধাও, কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার লক্ষণই নেই।

শুধু কি তাই হরিপদবাবু? গণকঠাকুর সদানন্দ সরখেল যে শনির দৃষ্টি কাটানোর জন্য প্রায় জবরদস্তি একখানা নীলা ধারণ করিয়েছিলেন তারও কিস্তি টানতে গিয়ে আপনি কি কম নাকাল হচ্ছেন। সদানন্দ আবার ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, কিস্তি ঠিকঠাক না দিলে মহাক্ষতির অভিশাপ লাগবে। তার ওপর ধরুন আপনার বাড়ির পাশেই মহাকালী ব্যায়ামাগারের আখড়া। তারা জোর করে আপনার জমির আড়াই ফুট বাই ষাট ফুট দখল করে বসে আছে, আর আপনি প্রতিবাদ করলেই তেড়ে আসছে, এও তো সবাই জানে কিনা।

আশ্চর্য মশাই, আমি আপনাকে না চিনলেও আপনি তো দেখছি আমার সব খবরই রাখেন। তা মশাই, এত সব জানলেন কী করে? আপনি কি শত্রুপক্ষের লোক?

ছিঃ—ছিঃ, হরিপদবাবু এরকম অন্যায় সন্দেহ আপনার হল কী করে? আপনার ভালো চাই বলেই না আর পাঁচটা গুরুতর কাজ ফেলে আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি! আপনার গিন্নির বাঁ—হাঁটুর বাত আর অম্বলের অসুখের জন্য ডাক্তার বদ্যি আর ওষুধের পিছনে আপনার যে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে সে খবর জানি বলেই না আপনার দুঃখে দুঃখিত হয়ে না এসে থাকতে পারলাম না।

কিছু মনে করবেন না মশাই, আজকাল লোক চেনা খুব শক্ত বলে একটু ধন্দ ছিল। এখন বুঝতে পারছি, আপনি তেমন খারাপ লোক নন।

নই—ই তো! এই যে গেল হপ্তায় আপনি অফিসের লেজারে একটা চল্লিশ হাজার টাকার ক্রেডিট এন্ট্রি ভুল করে ডেবিটের ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য গণেশবাবু কী অপমানটাই না আপনাকে করলেন। ইডিয়ট, গুড ফর নাথিং, অপদার্থ, মিসফিট, নন—কমিটেড ইত্যাদি কী বলতে বাকি রাখলেন বলুন! তার ওপর হেড অফিসে জানিয়ে আপনাকে পায়রাডাঙায় বদলি করার হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। আর আপনি ভালোই জানেন, পায়রাডাঙায় বদলি হওয়া মানে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ওঃ মশাই, আপনি নির্ঘাৎ অন্তর্যামী। এত খবর রাখেন দেখে আমি কেবল অবাকের পর অবাক হচ্ছি। সত্যিই মশাই, গণেশবাবুর মতো এমন অকৃতজ্ঞ লোক হয় না। এই তো গত ইয়ার এন্ডিং—এ গণেশবাবুর মান বাঁচাতে পরপর চারদিন অফিসের সময় পার করেও দু—তিন ঘণ্টা করে বেশি খেটে তাঁর কাজ তুলে দিয়েছি। এই কি তার প্রতিদান? আর ভুলটাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। সেদিন জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্নে যাব বলে একটু তাড়াহুড়ো ছিল। বিকেল ছ'টা ছাব্বিশের ট্রেন ধরব বলে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সামান্য একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল।

সেই কথাই তো বলছি। তারপর ধরুন, এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড়ে কী কাণ্ডটা হল?

কিছু হয়েছিল নাকি? কী হয়েছিল বলুন তো?

সে কী মশাই, এত বড় ঘটনাটা ভুলে মেরে দিলেন! আপনার তো এখনও ভীমরতি ধরার বয়স হয়নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর তিন মাস, এর মধ্যেই স্মৃতিবিভ্রম তো ভালো কথা নয়। অবশ্য জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিলে অনেক সময় শরীরে নানারকম কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়, তাতে স্মৃতিবিভ্রম হওয়াও বিচিত্র নয়।

আমি যে জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিয়েছিলাম এ খবরও আপনি জানেন দেখছি। নাঃ, আমার আরও অবাক হওয়ার উপায় নেই মশাই। ইতিমধ্যে অবাক হওয়ার অপটিমামে পৌঁছে গেছি।

আহা, অবাক হওয়ার দরকারটাই বা কী আপনার! এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড় দিয়ে আসার সময় আপনি যে দূরে শ্যামদাস মিত্তিরকে দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে 'শ্যামদাস, ওহে শ্যামদাস' বলে চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিলেন, তা কি আপনার মনে নেই?

দোষটা কিন্তু শ্যামদাসেরই, বুঝলেন মশাই, গত অক্টোবরে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বলে আমার কাছে দূরবিনটা ধার চেয়েছিল। দূরবিনটা আমার ঠাকুরদার। সাবেক জিনিস, একটা স্মৃতিচিহ্নও বটে। কিন্তু শ্যামদাস এমন বেআক্কেলে যে, দূরবিনটা ছ'মাসের মধ্যে ফেরত দিল না। চাইলেই বলে, দেব দিচ্ছি। তারপর শুনলুম তার বড় শালা নাকি দূরবিনটা তার কাছে চেয়ে নিয়ে গেছে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবে বলে। বলুন তো, টেনশন হওয়ার কথা নয়! তাই সেদিন তাকে দেখে ওরকম ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলুম।

আর তার ফলেই না আপনি রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে ফেললেন। আর কুকুরটাও ঘ্যাঁক করে আপনার ডান পায়ে কামড় বসিয়ে দিল।

ওঃ, সে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনাই বটে। তবে আপনি যে অন্তর্যামী সে বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই। এসব ঘটনা আমার বাড়ির লোক আর অফিসের কলিগরা ছাড়া কেউ জানে না। কুকুরের

কামড়ের চেয়েও অনেক বেশি যন্ত্রণা হল পেটে অতগুলো ইনজেকশন নেওয়া। সে কী অসহ্য অবস্থা তা কহতব্য নয়!

না হরিপদবাবু, আপনি নবুবাবুর কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার দুর্ভোগের জন্য নবুবাবুর অবদানের কথাটাও একটু ভাবুন। সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় নবুবাবুর ছেলে গজা অঙ্কে বাইশ পেয়েছিল। নবুবাবু তখন আপনাকে গজার প্রাইভেট টিউটর রাখেন। অঙ্কের মাস্টার হিসেবে আপনার খুবই সুনাম। গজাকে অঙ্ক শেখানোর জন্য আপনাকে নবুবাবু মাসে সাতশো টাকা দিতেন। তা দেবেন নাই বা কেন। নবুবাবুর টাকার লেখাজোখা নেই, আর গজাও তার একমাত্র ছেলে। কিন্তু হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে এগারো পেল এবং অ্যানুয়েলে পেয়েছিল মাত্র তিন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নবুবাবু আপনাকে ছাড়িয়ে তো দিলেনই, তার ওপর প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করলেন। অভিযোগ ছিল, আপনি ইচ্ছে করেই গজাকে ভুলভাল শিখিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর গোয়ালে আগুন লাগানোর অভিযোগে এক দফা, তাঁর বুড়ি পিসির মৃত্যু হওয়ায় সেটাকে খুনের মামলা সাজিয়ে আর এক দফা, তাঁর বাড়িতে যে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল সেই বাবদে তিনি আর এক দফা আপনাকে অভিযুক্ত করে এফআইআর করেন। পুলিশ একবার আপনাকে নিয়ে গিয়ে থানার লক আপে এক রাত্রি আটকেও রাখে। ঠিক কি না?

আর বলবেন না মশাই, আমার দোষ কী বলুন! গজা বেশিরভাগ দিনই অঙ্ক কষতে বসে ঘুমিয়ে পড়ত বা পেট ব্যথা বলে আমাকে বিদায় করে দিত। নবুবাবুকে বলেও লাভ হত না। বলতেন, ছেলেমানুষ, ওরকম তো একটু করবেই। ওই ফাঁকে—ফাঁকে শিখিয়ে দেবেন। কী কুক্ষণে যে গজাকে পড়াতে রাজি হয়েছিলুম কে জানে। নবুবাবু আমার জীবনটাই অসহ্য করে তুলেছেন।

সম্প্রতি তিনি আপনার বিরুদ্ধে একটা জালিয়াতির মামলা করার জন্যও তৈরি হচ্ছেন বলে শুনেছি।

ওরে বাবা!

তাই তো বলছি, আপনি কেমন আছেন সেটা জানা বড় দরকার।

যে আজ্ঞে। ভেবেচিন্তে মনে হচ্ছে আমি বিশেষ ভালো নেই। আমার ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না। বুক দুরদুর করে, শরীর দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে।

আহা, তার জন্য চিন্তা কী হরিপদবাবু। আমি তো আছি।

আপনি আছেন, কিন্তু কীভাবে আছেন?

আপনার দুঃখ দুর্দশা দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল বলেই তো হিমালয়ে পাহাড়িবাবার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম।

বলেন কী? আমার জন্যে আপনি হিমালয় ধাওয়া করেছিলেন? আপনি তো অতি মহৎ মানুষ মশাই। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিও না!

তাতে কী? আমার চেনা—অচেনা ভেদ নেই। আপনার দুঃখের কথা পাহাড়িবাবার শ্রীচরণে নিবেদন করতেই উনি টানা পাঁচ বছরের ধ্যানসমাধি থেকে জেগে উঠে খুব চিন্তিত মুখে বললেন, তাই তো? হরিপদর সময়টা তো বিশেষ ভালো যাচ্ছে না! এর একটা বিহিত করতেই হয়।

বলেন কী মশাই?

তবে আর বলছি কী! পাহাড়িবাবার মহিমা তো জানেন না। সাক্ষাৎ শিবস্বয়ম্ভো! তিনি প্রসন্ন হলে আর চিন্তা কীসের? তা তিনি সব শুনেটুনে আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েই এই একস্ট্রা স্পেশাল বগলামুখী কবচখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা দুধ, দই আর গঙ্গাজলে শোধন করে ধারণ করবেন। দেখবেন সব গ্রহ—বৈকল্য কেটে গিয়ে আপনি একেবারে অন্য মানুষ।

আপনি তো বড় পরোপকারী মানুষ মশাই।

আর লজ্জা দেবেন না। মানুষের জন্য আর কতটুকুই বা করতে পারি। যাই হোক, প্রণামী বাবদ সামান্য পাঁচ হাজার টাকা ফেলে দিলেই হবে।

অ্যা!
অ্যাঁজ্ঞে হ্যাঁ।

মাসির বাড়ি

নবাবগঞ্জে পৌঁছে সে শুনল, মাদলপুরের শেষ বাস সন্ধেবেলা ছেড়ে গিয়েছে। রাতে ওদিকে যাওয়ার যানবাহন বলতে কিছু নেই।

শুনে অগাধ জলে পড়ল গয়ারাম। ট্রেনটা তিন ঘণ্টা লেট না করলে এতক্ষণে তার মাসির বাড়িতে পৌঁছে বিকেলের ফলার সেরে ওঠার কথা। খিদেও বড় কম পায়নি। মাত্র বাইশ বছর বয়স। গোবিন্দপুর গাঁ থেকে টানা তিন মাইল হেঁটে এসে ট্রেন খারাপ। রাস্তায় একটু বাদামভাজা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। পয়সা বেশি নেইও সঙ্গে। রাস্তায় চোরে—ডাকাতে কেড়ে নেবে বলে মা রাস্তা খরচটুকু ছাড়া আর মাত্র পাঁচটা টাকা দিয়েছেন। অবশ্য মাসির বাড়ি পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু পৌঁছনো নিয়েই চিন্তা।

তার মাসতুতো দাদা কালীশঙ্করের বিয়ে। কাল ভোরবেলা বরযাত্রীরা বর নিয়ে রওনা হয়ে যাবে। কালীদার ভাবী শ্বশুরবাড়ি নাকি একবেলার পথ। খানিকটা নৌকোয় গিয়ে তারপর হাঁটাপথ। অবশ্য বরযাত্রীদের জন্য গোরুর গাড়ি আর বরের পালকিও থাকবে। আর বরযাত্রী যাওয়ার জন্যই তাড়াহুড়ো করে আসা। মাসি পইপই করে আসার জন্য চিঠি লিখেছেন।

কিন্তু গয়ারাম এখন করে কী?

নবাবগঞ্জ জায়গা মন্দ নয়, দোকান—বাজার আছে, স্টেশন আছে, পোস্ট অফিস আছে। মাদলপুর অবশ্য নিকষ্যি গাঁ। নবাবগঞ্জ আর মাদলপুরের মাঝখানে একখানা পেল্লায় জলা জমি আছে। লোকে বলে পেতনির জলা। ভূতপ্রেতের কথা ছেড়ে দিলেও, এই শীতে সন্ধের পর রোজই বাঘ বের হয়। কমলপুরের জঙ্গল থেকে বুনো কুকুরের ঝাঁকও কখনও—কখনও হানা দেয়। তারা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

বাজারের প্রান্তে অশ্বত্থ গাছটার তলায় বাঁধানো চাতালে বসে যখন গয়ারাম সাত—পাঁচ ভাবছে, তখনই হঠাৎ টের পেল, চাতালের ওদিকটায় অন্ধকারে বসে দু'টো লোক গভীর শলাপরামর্শ করে যাচ্ছে। দু'একবার 'গুণময় রায়' আর 'মাদলপুর' শব্দ দু'টো কানে এল। সে একটু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

একজন বলল, ''শোন পচা, বুক ঠুকে কাজটা করে ফেলতে পারলে আমার আর চিন্তা নেই। ধর, যদি গয়না বেচে বিশ—ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাই, তা হলে দু'জনে মিলে নবাবগঞ্জে মনোহারি দোকান দেব। কথা দিচ্ছি, আর জীবনে চুরি—জোচ্চুরি করব না, এই একবারটি ছাড়া।''

''দ্যাখ গদা, আমি জীবনে কখনও ওসব করিনি, ওসব করলে ভগবান পাপ দেয়।''

''আহা, বলছি তো এবারকার মতো পাপটা করে ফেলে একটা প্রায়শ্চিত্তির করে নিলেই হবে। ওরে, ভগবান তো পাপীদের জন্যই আসেন। তাই তো বলে 'পতিতপাবন'।''

''যদি ধরা পড়ে যাই?''

''সে ভয় নেই। বিয়েবাড়ি বলে কথা! লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। ডেকরেটরের লোক, জেনারেটরের লোক, না হয় তো রান্নার জোগালি, যা হোক একটা ভেক ধরে নিলেই হবে। চার মাইল তো মোটে রাস্তা। টুক করে কাজ সেরে ফিরে আসব।''

এরা তার মাসির বাড়িতে চুরি করার মতলব আঁটছে দেখে গয়ারাম খুশিই হল। এলাকার ছেলে, সুতরাং পথঘাট চেনে, তা ছাড়া পথের সাথীও পাওয়া যাবে।

গয়ারাম একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, ''ভায়ারা, একটু আনাড়ি মনে হচ্ছে।''

ছোকরা দু'জন তার দিকে ফিরে চেয়ে বলল, ''তুমি কে?''

গয়ারাম হাতে হাত ঘষে বলল, ''দাশরথী পয়মালের নাম জানা আছে?''

পচা আর গদা তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার দু'পাশে জেঁকে বসে বলল, ''না ভাই তিনি কে?''

''এ লাইনে তিনিই শেষ কথা! অত বড় গুণী আর এ লাইনে নেই। কুঞ্জপুরের কাছে থাকেন, একেবারে সাধুসন্তের মতো জীবন! পাপের টাকা ভোগ করেন না, বিলিয়ে দেন। তাঁর ছেলেরা অবশ্য ওই কর্ম করেই খাচ্ছে।''

পচা বলল, বটে! কিন্তু ভাই, তুমি তো এ তল্লাটের লোক নও। কী মতলবে উদয় হয়েছ?''

''আমাদের কি তল্লাট বলে কিছু আছে? পেটের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবে দাশরথী পয়মালের চেলা তো, পেটে বিদ্যেটা আছে বলে অসুবিধে হয় না।''

গদা খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলল, ''এই তোমার মতোই একজন সঙ্গীকে আমরা খুঁজছি। আজ রাতে মাদলপুরের এক বিয়েবাড়িতে একটা বড় দাঁও আছে। শুনেছি মেলা গয়নাগাঁটি আর টাকাপয়সার ব্যাপার আছে।''

গয়ারাম খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। ভাবখানা ছোটখাটো কাজে তার গা নেই। বলল, ''তা ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে? ছেলের বাড়িতে তো বিশেষ গয়নাগাটি থাকবার কথা নয়। মেয়ের বাড়ি হলেও না হয় কথা ছিল।''

পচা মাথা চুলকে বলে, ''ছেলের বাড়িই বটে। তবে গুণময় রায় ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ লাখ তুলেছে, আর মদন স্যাকরাকে বিস্তর গয়নার বরাত দিয়েছে, এটা পাকা খবর।''

গয়ারাম বলল, ''রাস্তা চেনা আছে? শুনেছি মাদলপুর যেতে বড় একটা জলা পড়ে!''

''ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। রাতবিরেতে আমাদের ওদিকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়।''

গয়ারাম নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলল, যাক বাবা, চার—পাঁচ মাইল রাস্তা যে এই অন্ধকারে একা ঠ্যাঙাতে হবে না, এটাই যথেষ্ট। গয়ারাম বলে, ''তা না হয় হল, কিন্তু পেটে যে ছুঁচো ডন মারছে, খালি পেটে কি আর হাত—পা সচল থাকে?''

এবার গদা বলল, ''এই বাজারেই আমার পিসেমশাইয়ের পাইস হোটেল, আমিই এবেলা ম্যানেজারি করেছি। খাওয়ার ভাবনা কী?''

গয়ারাম ফের আরামের শ্বাস ছাড়ল। ভগবান একেবারে ছপ্পড় ফুঁড়ে দিচ্ছেন।

খাওয়াটা মন্দ হল না। ডাল, ভাত আর নিরামিষ তরকারি, সঙ্গে এক বাটি মাংস। চেটেপুটে খেয়ে তিনজন রওনা হয়ে পড়ল।

ভূতনির জলা মাঠ ঘোর অন্ধকার। তবে পচা আর গদা পথঘাট ভালোই চেনে। ঝোপ—জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তায় ডাঙা জমি দিয়ে দিব্যি যাচ্ছে। পিছনে গয়ারাম।

কিন্তু খানিকটা হাঁটার পরই গয়ারাম শুনতে পেল, অন্ধকারে এই নির্জন পথে তারা ঠিক একা নয়। আশপাশে যেন আরও লোকজন চলেছে এবং তাদের ফিসফাস কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।

গয়ারাম একটু ঠাহর করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল এবং একটু বাদেই শুনতে পেল, হাত দশেক তফাতে বাঁ ধারে এক বুড়ো মানুষের কাশির শব্দ। তারপরই ঘড়ঘড়ে গলায় কেশো লোকটা কাকে যেন

বলল, ''বুঝলি গাব্বু, এই কাশির জন্যই চুরি করা ছাড়তে হয়েছিল আমাকে। চোর কাশলেই সর্বনাশ। অথচ এমন দাঁওটাই কি ছাড়া যায়, বল তো!''

''আহা, তোমার ভিতরে যাওয়ার কী দরকার? তুমি বাইরে বসে কাজের লোকেদের সঙ্গে গপ্পোসপ্পো কোরো। আমি ভিতরে ঢুকে কাজ সেরে আসব। গুণময় রায়ের বাড়ির আনাচকানাচ আমার চেনা।''

গয়ারাম প্রমাদ গনল, পচা আর গদাই শুধু নয়, আরও নিশিকুটুমরাও তার মাসির বাড়ি যাচ্ছে!

কয়েক কদম এগোতে না—এগোতেই পিছন থেকে কয়েক জোড়া দৌড় পায়ের আওয়াজ পেল গয়ারাম। তার ডান দিক দিয়ে মাত্র চার—পাঁচ হাত তফাতে গোটা কয়েক ছোকরা গোছের লোক ছুটে গেল। পিছনের জন একটু উঁচু গলায় বলল, ''মাদলপুরের শীতলতলায় গুণময় রায়ের বাড়ি, বুঝলি তো? ভুল বাড়িতে ঢুকিস না।''

তারা ছুটতে—ছুটতে এগিয়ে গেল।

পচা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ''এটা কী হচ্ছে বল তো?''

গয়ারামও অবাক। বলল, ''তাই তো? এরা কারা?''

বুড়োটা পুরনো চোর কাশি, সঙ্গে ওর নাতি গাব্বু, আর যারা ছুটে গেল, তারা পোড়াগাছতলার নন্দকিশোর সংঘের ছেলে, সব ক'টা চোর।

গদা বলল, ''সর্বনাশ! চল চল, পা চালিয়ে চল।''

পচা বলল, ''দৌড়তে হবে, নইলে পারব না।''

তিনজনে যথেষ্ট বেগে দৌড়তে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, দৌড়তে—দৌড়তে আরও তিনটে দলকে একে—একে ছাড়িয়ে গেল তারা। কিন্তু চতুর্থ দলটাকে পারল না। হঠাৎ পটাপট ল্যাং মেরে তিনজনকেই ফেলে দিল জনাদশেক চোরের একটা দল।

মুখে টর্চ মেরে একটা লোক বলল, ''অ্যাই খবরদার, আমাদের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করলে লাশ পুঁতে দেব। আমরা গিয়ে আগে চেঁছেপুঁছে নিই, তোরা পরে প্রসাদ পাবি।''

তিনজনে চিঁচিঁ করতে লাগল পড়ে থেকে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন তারা মাদলপুরে পৌঁছল, তখন তাদের দম বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা।

কিন্তু মাদলপুর পৌঁছে তাদের চক্ষু চড়কগাছ। রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। এই সময় গাঁ—গঞ্জের লোকের নিশুত রাত। কিন্তু কোথায় কী? গাঁয়ে ঢোকার মুখেই বটতলায় বেশ কয়েকটা হ্যাজাক জ্বলছে। আর সারি—সারি টেবিল—চেয়ার পেতে গাঁয়ের ছেলেছোকরারা বসে কীসের যেন টিকিট বিক্রি করছে। বিভিন্ন টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক লোক টিকিট কাটছে। গয়ারাম অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, ''এ কীসের লাইন দাদা?''

''ওসব চোরেদের লাইন।''

''কেন, কেন, চোরের আবার লাইন কীসের?''

''আহা, গুণময়বাবুর ছেলের বিয়ে শুনে চার দিক থেকে চোরেরা হাজির হচ্ছিল যে! নানারকম ভেক ধরেই আসছিল। ধরা পড়ে পেটাইও হচ্ছিল। কিন্তু গুণময়বাবুর দয়ার শরীর তো! তাই তিনি বললেন, 'ওরে বাপু, চোরেদেরও তো করে খেতে হবে। চুরি করতে চায় তো চেষ্টা করুক না। তবে বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তাও দেখতে হবে। তাই টিকিটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দু'টাকার টিকিট কাটলে চুরি করার জন্য এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। তবে চুরির সময় ধরা পড়লে পাঁচ টাকা ফাইন।''

পচা আর গদা করুণ মুখে বলল, ''আমরা কি পারব? কত বড়—বড় নামজাদা সব চোরদের দেখতে পাচ্ছি।''

গয়ারাম দমে গিয়ে বলল, ''তাই তো হে!''

অগত্যা টিকিট কেটেই তারা তিনজন গাঁয়ে ঢুকল। গিয়ে দ্যাখে, গুণময়বাবুর বাড়ির সামনেও বেশ লম্বা লাইন। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। পেল্লায় বাগান, দু'মহলা বাড়ি, চার দিকে দাসদাসী, লোকলস্করের অভাব নেই।

চোরেদের সঙ্গে লাইন দিয়ে নিজের মাসির বাড়িতে ঢুকতে গয়ারামের প্রেস্টিজে লাগছিল। কিন্তু উপায় বা কী? সুতরাং পচা আর গদার পিছনে সেও লাইনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

একটা ছোকরা চোর একটা শসা, একটা পাতিলেবু চুরি করে বেরিয়ে এল। একজন আধবুড়ো লোক একটা পুরনো গামছা পেয়ে সেটা পতাকার মতো নাড়তে—নাড়তে বিদেয় হল। একজন একটা নারকেল পেয়ে সেটাকেই চুমু খেয়ে সবাইকে হাত উঁচু করে দেখাল। একজন পেয়েছে একমুঠো কাঁচা লঙ্কা, তার মুখখানা ভারী বেজার। বুড়ো চোর শশীপদ এখন চোখেও কম দ্যাখে, কানেও কম শোনে। সে একগাছা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে বিড়বিড় করতে—করতে খুঁড়িয়ে—খুঁড়িয়ে বাড়িমুখো রওনা হল। তবে এর মধ্যেই এক ছোকরা চোর একখানা তাঁতের শাড়ি বগলে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতেই পচা বলল, "ওই হচ্ছে পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান চোর, ফটিক।"

ঘণ্টাখানেক বাদে তাদের পালা আসতেই তিনজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ি—ঘর—দেওয়ালের মধ্যে।

সামনেই মেসোমশাই গুণময় রায়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গয়ারাম তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রণাম করল। কিন্তু গুণময়বাবু তাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে বললেন, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।"

"মেসোমশাই, আমি গয়ারাম।"

"আয়ারাম গয়ারামদেরই তো দেখছি রে বাবু।"

ভাগ্য ভালো, ঠিক এই সময়েই মাসি কী একটা কাজে মেসোকে ডাকতে এসেছিলেন। গয়ারাম চেঁচিয়ে উঠল "মাসি।"

মাসি হাঁ করে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলেন, "মরণ! তুই এই চোরেদের দলে কেন রে মুখপোড়া? তোর চেহারাটাও তো চোর—চোর দেখাচ্ছে। আয় আয়, ঘরে আয় বাবা। মুখখানা একদম শুকিয়ে গিয়েছে।"

পচা আর গদা গয়ারামের কাণ্ড দেখে হাঁ। পচা বলে উঠল, "সে কী হে ভায়া, তুমি চোর নও?"

ভারি লজ্জা পেয়ে গয়ারাম আমতা আমতা করে বলল, "ইচ্ছে যে ছিল না তা নয়। তবে এ যাত্রায় আর হয়ে উঠল না। ভায়ারা, তোমরা বরং চেষ্টা করে দ্যাখো।"

পচা আর গদা ভারি দুঃখিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। গদা বিড়বিড় করে বলল, "নেমকহারাম আর কাকে বলে!"

রাজার হেঁচকি

এই যে বলাইবাবু, নমস্কার! তা খবরটবর সব ভালো তো?''

''হ্যাঁ, তা খবর তেমন খারাপও কিছু নয়। বাজারে নতুন ফুলকপি উঠেছে, রাঙা মুলো পাওয়া যাচ্ছে, সরেস নলেনগুড়ও এসে গিয়েছে। টাটকা কই মাছের আমদানিও ভালো। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক ঠিক চিনলাম না।''

''আপনি কি নবকিশোর রায়কে চেনেন?''

''নবকিশোর! না মশাই, নবকিশোর নামে কাউকে তো মনে পড়ছে না।''

''তা হলে বটকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্যে?''

''উঁহু, বটকৃষ্ণ নামটা শোনা—শোনা হলেও চেনা—চেনা লাগছে না তো।''

''মহানন্দ তলাপাত্র নামের কাউকে কি চেনা ঠেকছে?''

''না মশাই, মহানন্দ নামটা শুনেছি বলেই মনে পড়ছে না।''

''মুশকিল কি জানেন বলাইবাবু, আপনি না চিনলেও এঁরা সব আছেন কিন্তু! এই আপনার মতোই সকালে বাজার করছেন, দশটায় অফিসে যাচ্ছেন, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি খাচ্ছেন, লুঙ্গি পরে রকে বসে আড্ডা দিচ্ছেন।''

''অ, তা হবে, কিন্তু এদের কাউকেই আমি চিনি না মশাই।''

''আজ্ঞে, তাই তো বলতে চাইছি বলাইবাবু, দুনিয়ার ক'টা লোককেই বা আপনি চেনেন? চেনা তো বড় সহজ কাজও নয়। লোকও যে হাজারে—বিজারে, লাখো—লাখো, কোটি কোটি। কোন মহাপুরুষ যেন বলেছেন, লোক না পোক। তা এত অচেনা লোকের মধ্যে এক—আধজনকে মাঝে—মাঝে চেনা করে নিতে ইচ্ছে যায় না আপনার? এই ধরুন, নবকিশোরকে আপনি চেনেন না, কিন্তু নবকিশোরের ছেলে কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে ফস করে যদি আপনার মেয়ে টেঁপির বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে নবকিশোর কি আর আপনার অচেনা থাকবে?''

''টেঁপির বিয়ের কথা উঠছে কেন মশাই? টেঁপির তো মোটে এগারো বছর বয়স!''

''আহা, কথার কথা বলছি আর কী! কৃষ্ণকিশোরেরও মোটেই বিয়ের বয়স হয়নি, সবে সতেরোয় পড়েছে। তাই বলছিলুম অচেনা লোক বলে কি দূরে ঠেলে রাখা ভালো? কার সঙ্গে কখন কোন সূত্রে চেনা—পরিচয় হয়ে যায় তার তো কোনো ঠিক নেই। এই যে আমি, গতকাল পর্যন্তও কি আমার সঙ্গে আপনার চেনা ছিল? আজ কেমন হুট করে চেনা হয়ে গেল বলুন তো!''

''না মশাই, চেনা এখনও হয়নি, আপনাকে আমি মোটেই চিনি না।''

''ওই তো আপনার দোষ বলাইবাবু! চিনবেন না বলে গোঁ ধরে থাকলে কি আর চেনা যায়? আমি হলুমগে গোবিন্দলাল।''

''অ। তা ভালো। পরিচয় পেয়ে বড় খুশি হলুম। আমি তা হলে আসি?''

''বিলক্ষণ। আসবেন বইকি। তা চলুন, আমিও ওইদিকেই যাব কিনা! যেতে—যেতে দু'টো সুখ—দুঃখের কথাও বলা যাবে। তবে আমার আবার দুঃখের পাল্লাটাই ভারী কিনা!''

''দেখুন গোবিন্দবাবু, দুঃখটুঃখ আমাদের সবারই আছে। এখন ওসব হাপরহাটি শোনার আমার সময় নেই। অফিসের দেরি হয়ে যাবে।''

''তা তো বটেই। তবে কিনা আজ একটু দেরি হলেও তেমন ক্ষতি নেই। রোববারের অফিস তো!''

''আজ রোববার বুঝি? একেবারেই খেয়াল ছিল না। অফিস না থাকলেও আমার অনেক কাজ আছে গোবিন্দবাবু।''

''সে আর বলতে! রোববার তো আপনার গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার কাচার দিন এ কেন না জানে? এ ছাড়া করালীবাবুর সঙ্গে জমিতে বেড়া দেওয়া নিয়ে বকেয়া ঝগড়াটাও মুলতুবি রয়েছে। রোববারে কিস্তির কাজিয়াটাও সারতে হবে। তারপর ধরুন বেলা এগারোটায় লক্ষ্মীকান্তবাবুর সঙ্গে একপাত্তি দাবা খেলা আছে। রোববারে যে আপনার দম ফেলার সময় থাকে না এও সবাই জানে কিনা!''

''আপনি তো খুব ঘড়েল লোক মশাই! আমার সম্পর্কে এত খবর পেলেন কোথায়? আপনি পুলিশের চরটর নন তো?''

''ঘাবড়াবেন না বলাইবাবু। আমি আসলে একজন দুঃখী লোক। একটা খারাপ খবর দিতেই আপনার কাছে আসা।''

'খারাপ খবর? কীরকম খারাপ খবর মশাই? কাটোয়ায় আমার নব্বই বছরের বুড়ি পিসি থাকেন, তা পিসি হঠাৎ মারাটারা যাননি তো? আমার রাঙামামার ক্যানসার হয়েছিল বলে একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম, তাঁর কিছু হলটল নাকি? হ্যাঁ মশাই, টাটা কোম্পানির শেয়ারের দর কি হঠাৎ পড়ে গিয়েছে? আমার চিরশত্রু কালোবরণ কি লটারি পেয়েছে? নাকি ট্যারাকেষ্ট জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে? সে বলেছিল বটে, জেল থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে নেবে। হ্যাঁ মশাই, বিষ্টুবাবু কি তাঁর দু'হাজার টাকা ধার আদায় করতে আসছেন? আমার নামে হুলিয়া জারি হয়নি তো? নাকি কেউ আমাকে মারার জন্য গুন্ডাদের সুপারি দিয়েছে?''

''না, মশাই না। খবরটা খারাপ হলেও আপনার ভয় নেই। কথাটা হল আমার চাকরিটা গিয়েছে।''

''যাক বাবা, বাঁচা গেল! খারাপ খবরের কথা শুনলে আজকাল বড় বুক ধড়ফড় করে। তা আপনার চাকরি গেলে আমার কী যায়—আসে বলুন! আমি মশাই বড্ড ছাপোষা লোক, সাহায্যটাহায্য চেয়ে লজ্জা দেবেন না!''

''আরে না, আপনাকে লজ্জা দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। দুঃখের কথা কইলে বুকটা একটু ঠান্ডা হয়, এই যা।''

''তা অবশ্য ঠিক। তা আপনি কোথায় চাকরি করতেন গোবিন্দবাবু?''

''রামনগর রাজবাড়ির কথা জানেন কি?''

''রামনগর রাজবাড়ি! না মশাই, ঠিক মনে পড়ছে না।''

''আপনার জানা না থাকলেও রামনগরের রাজবাড়ি খুবই বিখ্যাত।''

'তা হতেই পারে। কত কিছুই তো আমাদের জানা নেই।''

''অতি সত্যি কথা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই রাজবাড়িতে আমার একটি চাকরি হয়েছিল।''

''রাজবাড়ির চাকরি! কিন্তু শুনতে পাই, আজকাল আর রাজাগজাদের দিন নেই। রাজবাড়িগুলো সব মিউজিয়াম বা সরকারি দপ্তর হয়ে গিয়েছে।''

''তা গিয়েছে বটে। তবে দেশের সব চোর—ডাকাত যেমন জেলে যায় না, পুকুর বা নদীর সব মাছই যেমন ধরা পড়ে না, দেশলাইয়ের সবক'টা কাঠিই যেমন জ্বালানো যায় না, তেমনই রাজবাড়িগুলোরও কয়েকটা এখনও টিকে আছে। রামনগরে শুধু রাজবাড়িই নেই, জরির পোশাকপরা মুকুট মাথায় বুড়ো রাজা

আছেন, তাঁর তিন রানি, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেপাই—সান্ত্রী সব আছেন। সকালে রোজ দরবার বসে, সেখানে অপরাধীদের বিচারও হয়। সভাগায়ক, সভাকবি পর্যন্ত আছেন।

"বলেন কী মশাই? এ তো আষাঢ়ে গল্প! তা সেখানে যাওয়া যায়?"

"খুব যাওয়া যায়। রাস্তাটা একটু প্যাঁচালো, এই যা!"

"তা আপনি সেখানে কী চাকরি করতেন গোবিন্দবাবু?"

"চাকরিটা বেশ গুরুতরই ছিল মশাই। সকালে শয্যাত্যাগের পর থেকে রাতে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত রাজামশাই ক'বার কাশলেন, ক'বার হাঁচি দিলেন, ক'বার হাই বা ঢেকুর তুললেন এবং ক'টা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তার হিসেব রাখা। কাশি হলে ক্রশচিহ্ন, হাঁচি হলে ঢ্যাড়া, ঢেকুর তুললে গোল্লা, হাই তুললে দাঁড়ি, আর দীর্ঘশ্বাস ফেললে ভাগচিহ্ন। রাত্রিবেলা বুড়ো রাজবৈদ্য সেগুলো যোগ দিয়ে হয়তো দেখলেন, রাজামশাই বাইশবার কেশেছেন, এগারোটা হাঁচি দিয়েছেন, একশো বত্রিশটা ঢেকুর আর তেরোটা হাই তুলেছেন, সেই বুঝে তিনি রাজার জন্য নানা ওষুধের ব্যবস্থা করতেন।"

"এ তো ভারি মজার চাকরি মশাই!"

"না মশাই, মোটেই মজার চাকরি নয়। রাজার হাঁচি—কাশির হিসেব রাখতে গিয়ে আমার নিজের নাওয়া—খাওয়া শিকেয় উঠল। সারাক্ষণ রাজামশাইকে নজরে—নজরে রাখতে হত। একটা হাঁচি—কাশির এদিক—ওদিক হলে বেতন কাটা যেত।"

"তা রাজবাড়িতে বেতনটা কীরকম ছিল গোবিন্দবাবু?"

"তা সেটা খুব মন্দ ছিল না। মাসে পাঁচ মোহর।"

"মোহর? মানে সোনার মোহর?"

"আজ্ঞে, সেখানে এখনও মোহরেরই চল ছিল কিনা! রাজামশাই তো সোনা—রুপো ছাড়া আর কোনো ধাতু ছুঁতেন না। তাঁর তলোয়ারের হাতলটাও রুপো—বাঁধানো। গাড়ু, পিকদানি, থালা—গেলাস, সবই রুপোর!"

"ওঃ, এ তো ভাবা যায় না মশাই! মাসে পাঁচ মোহর মানে তো পঞ্চাশ—ষাট হাজার টাকা! রীতিমতো শাঁসালো চাকরি মশাই? তা সেটা খোয়ালেন কী করে?"

"সেটাই তো দুঃখের কথা মশাই! একদিন রাতে রাজামশাই খেতে বসেছেন। কাশ্মীরি পোলাওয়ের সঙ্গে মাছের নবরত্ন কালিয়া, মোগলাই দমপুক্ত, মাংস, মুড়িঘণ্ট, মুর্গমসল্লম, চিংড়ির মালাইকারি, আলুবখরার চাটনি, নলেনগুড়ের পায়েস, রাবড়ি, রাঘবশাহি আর সরভাজা।"

"এ যে এলাহি ব্যবস্থা মশাই! বলি রাজাগজাদের কি ব্লাডসুগার, কোলেস্টেরল, হার্ট ডিজিজের ভয় নেই, নিদেন গ্যাস, অম্বল অথবা ডিসপেপসিয়া তো হতেই হবে।"

"আপনার—আমার মতো চুনোপুঁটি তো নন, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ইয়া বুকের ছাতি, পেল্লায় ভুঁড়ি, থামের মতো পা, মুগুরের মতো হাত।"

"বুঝেছি, বুঝেছি। তারপর কী হল বলুন?"

"হ্যাঁ, সেই দুঃখের কথাটাই বলি। মাংস চিবোতে গিয়ে রাজামশাই একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছিলেন। সে এমন ঝাল লঙ্কা যে, রাজামশাই একেবারে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। ঝালের চোটে হেঁচকি উঠে গেল। আর সে কী হেঁচকি মশাই। হেঁচকির চোটে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। রাজবৈদ্য ছুটে এলেন, মন্ত্রী এলেন, সেনাপতি এলেন, বিদূষক এলেন। ঘটি—ঘটি জল খাওয়ানো হল, নানা মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা হল, বিদূষক নানা রসিকতা করলেন, কিছুতেই কিছু হয় না। রাজামশাই হিচিক—হিচিক করে কেবল হেঁচকি তুলে যাচ্ছেন। তখন আমি বললাম, 'মন্ত্রীমশাই আমি একটু চেষ্টা করে দেখব?' মন্ত্রী বললেন, 'অবশ্য—অবশ্য। রাজাকে আরোগ্য করলে পারিশ্রমিক পাবে।' আমি দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গিয়ে কী করলাম জানেন? রাজার গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে দিলাম!"

''বলেন কী মশাই! এঃ হেঃ, এটা খুব ভুল করলেন। রাজার গালে চড় মারলে কি কারও চাকরি থাকে?''

''থাকে। আমারটা অন্তত ছিল। কারণ, সামান্য একজন নফরের হাতে আচমকা চড় খেয়ে রাজা এমন চমকে গেলেন যে, তাঁর হেঁচকি সেরে গেল। গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, 'এই ছোকরা কে?' মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, এ আপনার হাঁচি—কাশির হিসেবরক্ষক।' রাজা থমথমে মুখে একটা 'হু' দিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন। হেঁচকি সেরে যাওয়ায় আমি একথালা রুপোর টাকা বকশিশ পেলাম। কোম্পানির আমলের অ্যান্টিক জিনিস।''

''তা হলে চাকরি গেল কীসে?''

''পরদিন আমাকে বরখাস্ত করে যে চিঠিটা দেওয়া হল, তাতে লেখা ছিল, 'রাজা ক'টা হেঁচকি তুলেছিলেন তার হিসেব রাখোনি বলে তোমাকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।''

''এ তো বড় অন্যায় মশাই! হেঁচকির হিসেব রাখবার তো কথা ছিল না আপনার?''

''সেই দুঃখের কথাই তো বলতে এত দূর আসা মশাই! তা বলাইবাবু, আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই রুপোর টাকাগুলোর কীরকম দাম হবে বলতে পারেন? ভাবছি, কয়েকটা বেচে দেব। যদুস্বর্ণকার পাঁচশো করে দিতে চাইছে। খুব ঠকা হবে কি? এই যে দেখুন না!''

''আহা, হাটেবাজারে এমন জিনিস বেচবার দরকার কি আপনার? এই দরেই আমি না হয় সবক'টা কিনে নিচ্ছি।''

''নেবেন? তা নিন। চেনা মানুষের কাছে দু'—পাঁচশো টাকা ঠকেও সুখ।''

''তা তো বটেই, তা তো বটেই!''

হর বনাম কালী

কালীপদ মন্ডলের আত্মাকে তাড়া করে—করে হর কাপালিক হাপসে পড়েছে। কালীপদ আজ সকালেই গত হল। তা গত হওয়ার আগেই সেই রাত বারোটার সময় কালীপদর বউ গিয়ে তার হাতে—পায়ে ধরে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, "মিনসে দু' কলস রুপোর টাকা আর দেড়শো মোহর কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কিছুতেই বলছে না, বাবাজি। যদি পটল তোলে তা হলে যে সব যাবে।"

হর কাপালিক গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "তা বন্দোবস্ত কীরকম হবে?"

কালীপদর বউ তখন চোখের জলে ভেসে বলেছিল, "দশটা রুপোর টাকা দেব বাবাজি, এর বেশি আর চেয়ো ন।"

হর হাঃ হাঃ করে হেসে বলেছিল, "ছুঁচো মেরে আমি হাত গন্ধ করি না। আর রুপো? ওর আর কী এমন দাম!"

তা দরদস্তুর একটা ঠিক হল। হদিশ হলে হর কাপালিক দশ মোহর আর বিশ রুপোর টাকা পাবে।

রাত দেড়টায় কালীপদর বাড়ি গিয়ে যা অবস্থা দেখল হর, তা সুবিধের নয়। কালীপদর বাক্য হরে গেছে, চোখ উলটে গোঁ—গোঁ করছে। হর অনেক মন্তর—তন্তর ছাড়ল বটে, তাতে সুবিধে হল না। কালীর মুখ থেকে বাক্যি বেরোল না। গোঁ গোঁ যে আওয়াজ বেরোচ্ছিল তার মর্মোদ্ধার করতে পারলে হয়তো হত। কিন্তু সে বিদ্যে হরর জানা ছিল না।

কালীর বউ দাক্ষায়ণী চেঁচাচ্ছিল, "বাবাজি, এ যে পটল তুলল বলে! ভালো করে মন্তর ঝাড়ো, নইলে যে সব গেল গো!"

হর দেখল, কালীর হয়ে এসেছে। আত্মাটা বেরোল বলে। এই অবস্থাতার মুখ থেকে বাক্যি বের করা অসম্ভব। তবে উপায় আছে। আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরোলে সেটাকে কপ করে ধরে একটু শোধন করে ফের শরীরের মধ্যে চালান দিলে কালী ধড়ফড় করে উঠে পড়বে। তখন বাক্যি বের করা জলবত্তরলং।

তক্কে—তক্কে ছিল হর। সকালের দিকটায় আত্মাটা প্রথম উঁকি মারল নাকের ফুটো দিয়ে। কিন্তু মুন্ডুটা বের করে হরকে দেখেই সুড়ুৎ করে ফের ভেতরে ঢুকে গেল।

দাক্ষায়ণী ফের চেঁচামেচি জুড়ে দেওয়ায় হর একটা পেল্লায় ধমক দিল, "চোপ! অম চেঁচামেচি করলে আত্মাটা যে ভিরমি খাবে বাপু! তখন এমন ডুব মেরে থাকবে যে, টিকিটারও নাগাল পাওয়া যাবে না।"

আর ঘণ্টাটাক বাদে আত্মাটা কালীর বাঁ কানের ভিতর থেকে উঁকি দিতেই হর কপাত করে থাবা মারল। কিন্তু অল্পের জন্য হল না। আত্মাটা টুক করে মুন্ডু সরিয়ে নিল।

বারবার তিনবার। হর কাপালিক বাঘের মতো খাপ পেতে বসে ছিল। এবার যাতে আর ব্যাটা ঢুকতে না পারে।

কিন্তু কী হল, এই সময়ে একটা নচ্ছার মশা কোথা থেকে এসে নাচতে—নাচতে কালীর নাকের মধ্যে ঢুকে গেল। আর তাই সর্বনাশ। মশার তাড়নায় মৃতপ্রায় কালীও হঠাৎ প্রবল একখানা হ্যাঁচ্চো দিয়ে ফেলল। আর তখনই আত্মাটা গুড়ুলের মতো মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পাঁই পাঁই করে পালাতে লাগল।

তা হরও ছাড়বার পাত্র নয়। "ধর! ধর!" বলে করল তাড়া।

তা ধরা কি সহজ? কালীর আত্মা এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে গিরীশ নন্দীর আমবাগানে ঢুকে পড়ল। তারপর একটা গাছের ডালে চড়াই পাখিটির মতো বসে ইতি—উতি চাইতে লাগল।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে হর কাপালিক প্রথমটায় চোখ রাঙিয়ে খুব ধমকাল, "নেমে আয়! নেমে আয় বলছি! নইলে কী হবে জানিস তো? এমন ঝাঁটাপেটা আর সর্ষেপোড়া দেব যে, আবার তোর মরতে ইচ্ছে করবে।"

কিন্তু ধমকে কাজ হল না। কালীর আত্মা দিব্যি ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের ডালে বসে রোদ পোহাতে—পোহাতে চারদিকের দৃশ্য দেখতে লাগল।

হর তখন কাকুতিমিনতি করতে লাগল, "নেমে আয় বাপু, নেমে আয়। অমন মগডালে বসে থাকিসনি। পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে রে? মরবি মর, তা বলে পরিবারটাকে ভাসিয়ে যাওয়াটা কি ভালো কাজ হচ্ছে রে! নরকে যাবি যে! আয় বাপু, নেমে আয়, আবার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়, কত আনন্দ হবে দেখিস।"

তা কালীর আত্মা তাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে ফের উড়ল। তারপর উড়তে—উড়তে পুরনো জমিদারবাড়ির মস্ত উঁচু দেউড়ির মাথায় যে পাথরের পরিটা আছে তার মাথায় বসে যেন মনের আনন্দে গান গাইল কিছুক্ষণ। না, গানটা অবশ্য শুনতে পেল না হর। সে আঠাকাঠি, জালদড়ি নিয়ে নানারকম কসরত করতে লাগল। যদি আত্মাটাকে নামিয়ে এনে ঝোলায় পোরা যায়।

কিন্তু কালীর আত্মা মহা ট্যাটন। কিছুক্ষণ গানটান গেয়ে আবার উড়ল। হর দৌড়তে লাগল পিছু—পিছু। শুধু কি দৌড়! কখনও পুকুরে নামতে হল, কখনও খালের জলে পড়ল, কখনও কাঁটাগাছে ক্ষতবিক্ষত হতে হল।

শেষে তেপান্তরের মাঠের মতো একটা ফাঁকা মাঠে একটা সজনে গাছের ডাল ধরে কালীর আত্মা দিব্যি ঝুল খেতে—খেতে তাকে মুখ ভেংচে বলল, "তোমার কেরদানি জানা আছে।"

হর হাঁফাতে—হাঁফাতে বলল, "নেমে আয় বাপু, তোর গায়ে আঁচড়টিও কাটব না। ভালো করে ধুইয়ে মুছিয়ে শরীরটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। তারপর তোর ছুটি।"

"হেঁঃ হেঁঃ। অত সোজা নয় হে। ফের শরীরের মধ্যে ঢোকাব আর দাক্ষায়ণী দু'বেলা আমাকে উস্তম—কুস্তম করে ভূত ঝাড়বে তা আর হচ্ছে না। এই যে বেরিয়ে পড়েছি, কী যে আনন্দ হচ্ছে তা বলার নয়। এখন খাবদাব, মজা করে ঘুরব।"

"তোর আক্কেলের বলিহারি যাই। আত্মা অবার খায় নাকি? খেতে হলে মুখ চাই, পেট চাই, দাঁত চাই, জিভ চাই। তা তুই সেসব পাবি কোথায়? ছেলেমানুষি করিস না, নেমে আয়। শরীরে ঢুকলে সব পাবি। দাঁত, জিভ, পেট সব। তখন কত খাবি দেখিস।"

"হ্যাঁ, দাক্ষায়ণী আমাকে খাওয়াবে! বেঁচে থাকতে কী খেতে দিত জানো? কচু ঘেঁচু আর আলুপোড়া। যা হে বাপু, এই আমি বেশ আছি।

"না রে না, তুই মোটেই বেশ নেই। বাপু রে, এরকম বাউন্ডুলে ঘুরে বেড়ানো কি ভালো? ঝড়বৃষ্টি শীতে কষ্ট পাবি যে। ছাতা পাবি না, কম্বল পাবি না। তার ওপর যমদূতেরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেলেই ধরে যমরাজের কাছে হাজির করবে। বড্ড হেনস্তা হবি যে। নেমে আয় বাপু।"

"না হে না, ওসব হচ্ছে না। তোমার মতলব বেশ জানি। দু'ঘড়া রুপোর টাকা আর দেড়শো মোহরের লোভেই এসব করছ তো! অত সোজা নয়। সে—খবর আমি কাউকে দেব না।"

"তবে রে!" বলে হর ফের তাড়া করল। কালীর আত্মা ফুড়ুত করে উড়ে পালাল।

ছুটতে ছুটতে হর কাপালিকের ঘাম ছুটে গেল। পা আর চলে না। চোখে সর্ষেফুল নৃত্য করতে লাগল। হর কাপালিক একটা গাছতলায় বসে অনেকক্ষণ দম নিল হ্যা—হ্যা করে। কালীর আত্মা পগারপার হয়েছে।

ল্যাংচাতে—ল্যাংচাতে, কাঁকালে ব্যথা নিয়ে হর কাপালিক যখন ফিরে আসছিল তখন হঠাৎ দূর থেকেই শুনতে পেল, কালীপদর বাড়িতে খুব শোরগোল হচ্ছে।

হর গিয়ে কালীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে গেল। কালী দিব্যি বসে—বসে ফলার করছে আর দাক্ষায়ণী দাঁড়িয়ে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে তাকে।

হর বলল, "অ্যাঁ! আত্মাটা তা হলে ঢুকে গেছে দেখছি! ঢুকবেই জানতাম। যা তাড়া করেছিলাম তা আর বলার নয়!"

দাক্ষায়ণী বলল, "বাবাজির যেমন কথা! আত্মা ঢুকবে কী গো! সেই যে হাঁচি দিল তাইতে তুমি তো ভয় খেয়ে পালালে। আর ওই হাঁচির পরই তো ইনি দিব্যি উঠে বসলেন।"

"অ্যাঁ!"

"হ্যাঁ।"

"ও তা হলে মন্তরেই কাজ হয়েছে। ঠিক আছে, এবার তা হলে ভাগজোখ হয়ে যাক।"

কালীপদ খেঁচিয়ে উঠে বলল, "কীসের ভাগজোখ হে! অ্যাঁ! কীসের ভাগজোখ?"

হর একটু দমে গিয়ে বলল, "আমার কিছু পাওনা হয়।"

"কচু হয়। যাও, যাও, এখন বিরক্ত কোরো না। অনেকদিন পর বাড়িতে একটু আদরযত্ন পাচ্ছি।"

হর কাপালিকের ইচ্ছে হল, হাতের চিমটেটা দিয়ে কালীকে ঘা কতক দেয়। তারপর আত্মাটাকে বের করে কমন্ডলুতে পুরে নিয়ে যায়। কিন্তু সেসব করতে সাহস হল না। দাক্ষায়ণী তার দিকে যে চোখে চাইছে তা সুবিধের নয়। ট্যা—ফোঁ করলে হয়তো পাখার বাঁট দিয়ে ঘা কতক বসিয়ে দেবে! কালীর বেঁচে থাকা মানে দু'ঘড়া রুপো আর দেড়শো মোহর।

হর কাপালিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রওনা দিল।

সময় সরণী

আচ্ছা, এটা কি সুধীরবাবুর বাড়ি? হ্যাঁ, আমিই সুধীর ভটচায। আপনি কে বলুন তো?

আমাকে ঠিক চিনবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আসা। ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন।

এখানে বোধহয় দরজার বাইরে চটি ছেড়ে ঢোকার নিয়ম, তাই না?

তা নিয়ম একটা আছে বটে, যদি আপনার অসুবিধে না হয়, তাহলে—

না, না, ঠিক আছে। চটি ছেড়েই আসছি।

আসুন, বসুন।

আপনাদের এ জায়গাটা বেশ গরম।

তা তো বটেই। গ্রীষ্মকালে এ দেশে গরম পড়ে। আপনি কি এ দেশে থাকেন না?

না, না, আমিও এ দেশেই থাকি। মাত্র কয়েক মাইল তফাতে। তবে আমাদের ওখানে বিশেষ গরম নেই।

কয়েক মাইলের তফাতে তো আর দার্জিলিং পাহাড় নয় মশাই।

না, না, অত দূরের কথা বলছি না। আমি শ্যামবাজারের দিকটায় থাকি।

তা শ্যামবাজারে গরমের অভাব কি? কালও তো হাতিবাগানে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছি। আপনি বোধহয় এয়ার কন্ডিশনে থাকেন।

খানিকটা তাই।

তাই বলুন।

তবে সেটা ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশনিং।

সেটা আবার কীরকম?

এমন সব গাছ আছে যা কুলিং সিস্টেমের কাজ করে।

গাছ! শ্যামবাজারে আবার গাছ কোথায় পেলেন?

সে কথা থাক। আগে জরুরি কথাটা সেরে নিই।

হ্যাঁ বলুন।

এখন ঘড়িতে বাজছে সকাল ন'টা। ঠিক তো!

হ্যাঁ। কাঁটায় কাঁটায়।

ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এ বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটবে। আর সেইজন্যই আমার আসা।

ঘটনা! কী ঘটনা বলুন তো! দিনে দুপুরে ডাকাত পড়বে নাকি?

না, না। অত বড় ঘটনা হয়। খুবই তুচ্ছ একটা ঘটনা, কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর।

আপনি কি জোতিষী?

আজ্ঞে না। তবে আমি লজিক্যাল।

তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি কি পাগল?

দাঁড়ান, আমার কথাগুলো একটু হেঁয়ালির মতো হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আসলে এখানকার বাংলা ভাষায় কথা বলতে তেমন অভ্যস্ত নই তো, তাই।

আপনি কি বাঙালি নন?

বাঙালিই, তবে একটু অন্যরকম বাঙালি। আমাদের বাংলাটা একটু অন্যরকম।

তা হতেই পারে। শুনেছি চট্টগ্রাম বা সিলেটের বাংলা বেশ অন্যরকম।

প্রবলেমটা অনেকটা সেরকমই। যাই হোক, একটু বুঝিয়ে বলছি।

বলুন।

আপনার ছেলের নাম কিংশুক ভট্টাচার্য তো?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তাকে চিনলেন কী করে?

তিনি আমার দাদু।

দাদু! বলেন কি মশাই! আপনার মাথায় তো বেশ গন্ডগোল! আমার ছেলের বয়স মাত্র আট মাস। আর কিংশুক নামটাই যে শেষ অবধি রাখা হবে তারও ঠিক নেই।

প্লিজ। দয়া করে ওঁর নাম কিংশুকই রাখবেন। দু'হাজার বাষট্টি সালে কিংশুক ভট্টাচার্য নামেই উনি নোবেল প্রাইজ পাবেন। নাম পাল্টালে অনেক গন্ডগোল হয়ে যাবে।

আচ্ছা মশাই, আপনি এখন আসুন। আমার অনেক কাজ আছে।

ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই। আমি সত্যিই কিংশুক ভট্টাচার্যের নাতি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবেন।

আপনি কি টাইম মেশিনের গপ্পো ফাঁদবেন? ভবিষ্যৎ থেকে উড়ে এসেছেন! ওসব গুলগপ্প আমাদের ঢের জানা আছে। আমরা ঘনাদার গল্প অনেক পড়েছি। স্টিফেন হকিং বলেই দিয়েছেন টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। মিচকি মিচকি হাসছেন যে!

স্টিফেন হকিং তো আর সব সত্যের সন্ধান জানতেন না, অধিকাংশ সত্যই হল আপেক্ষিক। এক এক দেশে এক এক সময়ে এক এক পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এক একটা জিনিসকে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। আমি সত্যিই সময়ের সরণী বেয়ে এসেছি। আমি সম্পর্কে আপনার ছেলে কিংশুকের নাতি, আপনার পুতি।

হাঃ হাঃ, মশাই, বেড়ে গল্প ফেঁদেছেন। আসল কথাটা কী বলুন তো!

সেই কথা বলতেই আসা। নইলে আমরা সহজে টাইম ট্রাভেল করি না, তাতে অনেক রকম বিপত্তি হয়। যা বলছি দয়া করে শুনুন। বেলা দশটা কুড়ি মিনিট নাগাদ আপনার বন্ধু বঙ্কুবিহারী আর অরূপ মাইতি আসবেন। দশটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ আপনার স্ত্রী তাঁদের দুজনকে দুটি করে শিঙাড়া পরিবেশন করবেন। শিঙাড়াগুলো আপনি গতকালই একটি মাড়োয়ারি দোকান থেকে কিনে এনেছেন, কিন্তু অত্যধিক ঝাল বলে খেতে পারেননি, ফ্রিজে রেখে দেওয়া আছে। আপনার স্ত্রী সেগুলোই মাইক্রোওয়েভে গরম করে দেবেন। দশটা বত্রিশ নাগাদ অরূপ ও বঙ্কুবিহারী ঝালে হাঁসফাঁস করতে করতে ঠান্ডা জল চাইবেন। আপনার স্ত্রী ফ্রিজের জল নিয়ে এ ঘরে আসবার উপক্রম করবেন। আর তখনই ঘটনাটা ঘটবে। আপনি ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

একটু অবাক হচ্ছি। সিঙাড়ার ঘটনাটা সত্যি। বাকিগুলো সত্যি কিনা—

সত্যি। একটু বাদেই বুঝবেন।

আচ্ছা বেশ। কিন্তু ঘটনাটা কী?

আপনার স্ত্রীর হাত থেকে একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে ভাঙবে এবং গেলাসের জল পড়ে পিছল মেঝেতে আপনার স্ত্রী আছাড় খেয়ে পড়ে ফিমার বোন ভাঙবে।

সর্বনাশ!

আরও সর্বনাশ হল ফিমার বোন ভেঙে আপনার স্ত্রী শেষ অবধি পঙ্গু হয়ে যাবেন এবং তার ফলে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না।

চিনাংশুক! সে কে?

কিংশুকের ছোট ভাই।

বলেন কী?

যা বলছি দয়া করে শুনুন। চিনাংশুক না জন্মালে খুবই গন্ডগোল হয়ে যাবে।

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। আপনি নিজে তো পাগল বটেই, কিন্তু আপনার পাগলামির চোটে যে আমারও পাগল হওয়ার জোগাড়। কী সব আবোল—তাবোল বকছেন?

রেগে যাবেন না, মাথা ঠান্ডা করুন। সমস্যাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

সমস্যাটা কী?

সমস্যা হচ্ছে এক গেলাস জল। ওই এক গেলাস জলই ভাবীকালের ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে। আর সেইজন্যই আমার আসা।

আপনার গুলগল্পে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আসুন এখন।

আপনার যাতে বিশ্বাস হয় সেইজন্য দু'হাজার বাষট্টি সালের একটি খবরের কাগজ আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এটি অবশ্য আপনাদের সংবাদপত্রের মতো নিউজপ্রিন্টে ছাপা নয়, এটি ছাপা হয়েছে সিনথেটিক পেপারে। এই যে ফ্রন্ট পেজে বড় হেডিং—এ খবরটা দেখুন।

ও বাবা! এ তো দেখছি কিংশুক ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যায় সত্যিই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে! এটা জালি ব্যাপার নয় তো!

ওই খবরের কাগজটা যে মেটেরিয়ালে ছাপা হয়েছে তা আপনি কখনও দেখেছেন?

না মশাই! এ তো ভারি নরম অথচ মোলায়েম জিনিস। আর ছাপাও তো দারুণ সুন্দর। কিন্তু ভাষাটা একটু যেন কেমন কেমন। সব বাক্য ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

ভাষা এক নিরন্তর পরিবর্তনশীল জিনিস। আমাদের আমলে ভাষা অনেক সংকেতময় হয়েছে।

তাই দেখছি।

এখন কি একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে?

আমি ধাঁধায় পড়ে গেছি। তা আপনি যদি টাইম ট্রাভেলার হয়েই থাকেন তাহলে আপনার গাড়ি কই?

টাইম ট্রাভেল করতে গাড়ি লাগে নাকি?

সিনেমায়—টিনেমায় তাই তো দেখি।

ও তো আজগুবি ব্যাপার। তবে গাড়ি না হলেও একটা শ্যাফট বা লম্বা নলের মতো জিনিস আছে! ওর টেকনোলজি আপনি ঠিক বুঝবেন না। তবে শ্যাফটাও আপনার বাড়ির সামনের ওই খেলার মাঠটায় রয়েছে। ওটা দেখতে পাবেন না, কারণ ওটা ওখানে রয়েছে রাত তিনটের স্লটে। দিনে—দুপুরে শ্যাফটটা দেখতে পেলে লোকের অনাবশ্যক কৌতূহল হবে।

যাক গে, এখন খোলসা করে বলুন ব্যাপারটা কী।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল, সময়ের শরীরে মাঝে মাঝে এক—আধটা কুঞ্চন দেখা দেয়। ওই কুঞ্চনের ফলে অনেক সময়ে পরবর্তী ঘটনাবলিতে প্রভাব পড়ে। আমরা তেমন বিপজ্জনক কুঞ্চন দেখলে সেটাকে একটু মসৃণ করে দিই মাত্র। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিংশুক ভট্টাচার্য দু'হাজার বাষট্টি সালে যে গবেষণার জন্য

নোবেল পুরস্কার পাবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার স্ত্রীর যদি আজ ফিমার বোন ভাঙে এবং চিনাংশুক না জন্মায় তাহলে কিংশুক ভট্টাচার্য সেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করতে পারবেন না।

কেন মশাই?

তার কারণ কিংশুক একমাত্র সন্তান হলে তাকে আপনারা অত্যধিক আদর দেবেন এবং অতি আদরে সে অলস অপদার্থ এবং বখা হয়ে যাবে। ফলে তার পক্ষে আর আবিষ্কারটা সম্ভব হবে না। চিনাংশুক জন্মালে কিন্তু আপনাদের মনোযোগ সে অনেকটাই কেড়ে নেবে এবং কিংশুক ভট্টাচার্যও অ্যাকটিভ থাকবেন।

বটে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার।

হ্যাঁ। কিন্তু দশটা পনেরো বাজে। প্রস্তুত হোন।

কী করতে হবে মশাই?

আপনি কিছুই করবেন না। শুধু আপনার স্ত্রী যখন জলটা আনবেন তখন উঠে গিয়ে আপনি ওঁর হাত থেকে গেলাস দুটো নিয়ে নেবেন। টাইমিংটা কিন্তু খুব জরুরি। এক সেকেন্ড আগে বা পরে হলেই ব্যাপারটা কেঁচে যাবে।

বুঝেছি।

খুব সাবধান। ওই ডোরবেল বাজছে, আপনার বন্ধুরা এসেছেন।

দরজা কি খুলে দেব?

দিন। আমার নাম অশঙ্ক ভট্টাচার্য। আমাকে আপনার দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে পারেন বন্ধুদের কাছে।

তাই হবে। বলে গিয়ে সুধীরবাবু দরজা খুলে দেখলেন সত্যিই বঙ্কু আর অরূপ এসেছে।

তার পরের ঘটনাগুলো ঠিক যেমনটি অশঙ্ক বলেছিল তেমনই ঘটতে লাগল। ঝাল শিঙাড়া খেয়ে দুজনেই বলে উঠল, বউদি, ঠান্ডা জল দিন।

অশঙ্ক চোখের ইশারা করে সুধীরবাবুকে বলল এইবার। খুব সাবধান কিন্তু—

সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং তাঁর স্ত্রী যখন ফ্রিজের বোতল বের করে গেলাসে জল ঢালছেন তখনই গিয়ে বললেন, দাও গেলাস দুটো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি! তুমি নেবে কেন?

আহা, দাও না। তুমি পড়ে—টড়ে গেলে যে সর্বনাশ!

পড়ব। আমি পড়ব কেন?

পড়ারই কথা কিনা। আর তুমি পড়লে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না। তাহলে যে সর্বনাশ।

বলি সকালেই কি গাঁজা টেনেছ নাকি? কী সব বাজে বকছ! সরো, জল আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আহা—হা, করো কী, করো কী!

বলে সুধীরবাবু তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে গেলাস দুটো একরকম কেড়েই নিতে গেলেন। আর টানা—হ্যাঁচড়ায় একটা গেলাস হাত ফসকে পড়ে শতখান হয়ে ভাঙল। এবং স্ত্রী নয়, সুধীরবাবু নিজেই পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলেন।

স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন। বন্ধুরা ছুটে এল। সঙ্গে অশঙ্কও। ধরাধরি করে তোলা হল তাঁকে। বাঁ হাতটায় প্রচণ্ড লেগেছে।

বঙ্কু ডাক্তার। হাতটা ভালো করে দেখে বলল, কনুইয়ের কাছটা তো ফ্র্যাকচার হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ভোগাবে।

সুধীরবাবুর মুখে অবশ্য হাসি। অশঙ্কের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, কী হে বাপু, কেমন সামলে দিয়েছি?

অশঙ্ক মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, সময়ের যে কুঞ্চনটা ছিল সেটা এখন সটান হয়ে গেছে।

ডবল পশুপতি

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালোমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মনটা বড় ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়।

পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময় বেশ ভালোই ছিল। তাঁর ঠাকুরদা পুরনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো—মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহু লোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডনবৈঠক দেন, কল—ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকা—পয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোট লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবু ভালোই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "এই যে পশুপতিবাবু নমস্কার। কেমন আছেন?" তখন পশুপতিবাবুর ভারি সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ—পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, "বোধহয় ভালোই।" কিংবা, "মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।" অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, "পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?"

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু "হুম, হুম" শব্দ করতে লাগলেন।!

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিবাবুকে দেখে একগাল হেসে বলল, "ব্যায়াম করছেন? খুব ভালো। ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুন্ডা—বদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।"

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সি রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন।

লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, ''লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহংকারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনো কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভালো দিকটাও দেখতে হবে, লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।''

পশুপতিবাবু রাগবেন কি খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, ''তা মহেন্দ্র তবু, বলে বসল, 'ওহে নিতাই, তোমার পুরনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালোটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কীসের? বাপ—পিতেমোর অত বড় বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কষ্টে এখানে—সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।''

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, ''আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটা দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই—পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর—ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তা হলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।''

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভুজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, ''আমি বলি কি, পশুপতিবাবু কি আর আমার প্রস্তাব ফেলতে পারবেন। তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকি। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, 'তুমি পারবে না হে নিতাই,' তখন আমিও বললুম, 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা—রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমি ফিরে যাওয়ার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে—গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পুব—দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।'

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, ''না না, আপনাকে ভাবতে হবে ন। মালপত্র ঠেলাওলারাই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।''

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালোমানুষ হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। এ—লোকটা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন বাস্তবিকই তিন—চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদ্বেগে হুটোপাটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, ''ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?''

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হইহট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছেন যে, মাথাটা আর ভাবতেও পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলার বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন—সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দু'জন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু'হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকেই একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, ''পশুপতি এসে গেছ! বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।''

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁহাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ—পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারি শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড় মেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজো ছেলে এসে দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারি অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

''কাজটা কি ঠিক করলে পশুপতিভায়া?''

পশুপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কোন কাজের কথা হচ্ছে।

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, ''ভাড়া না হয় আরও দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনো দরকার ছিল কি? কাজটা কি ঠিক হল হে পশুপতি?''

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, ''আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ঘাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।''

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

''বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো! ঢের—ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুড়ছিলেন? তাও ছোটখাটো ঢিল নয়, এত বড় বড় পাথর। তার দু'খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কি পাগল না পাজি?''

পশুপতি এবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, ''আমিও দুর্গা—দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফের ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব।''

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খেয়ে নেবেন দুপুরবেলাটায়।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো—কাঁদো মুখে বলল, ''গায়ের জোর থাকলেই কি গুন্ডামি করতে হবে ভাই?''

পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নিতাই বলল, ''না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বসলে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কি ঠিক? তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।''

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা গলায় বলল, ''আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসে ছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায় তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজো ছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের মতোই, কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছে, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো না তা তো আর বেচারা জানত ন।''

পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, ''বাবা রে মেরে ফেললে।'' আর একজন বলে উঠল, ''এসব কি ঠিক কাজ হচ্ছে?'' আর একজন, ''ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে!'' আর একজন, ''আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা!'' সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, ''ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এমুখো হব না।''

পশুপতি ভাবতে—ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন। সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।

পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনো কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে—মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।

হনুমান ও নিবারণ

নিবারণবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উটকো উৎপাত তিনি পছন্দ করেন না। তবু তাঁর কপালেই হালে এক ঝামেলা এসে জুটেছে। বাড়ির সামনেই একখানা পেল্লায় জাম গাছ। সেই গাছে দু তিন দিন আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশাল জাম্বুবান কেঁদো হনুমান এসে থানা গেড়েছে। এ তল্লাটে হনুমান বাঁদর ইত্যাদি কোনো কালেই ছিল না। হনুমানটা যে কোথা থেকে উটকো এসে জুটল তা কে জানে!

তা হনুমান আছে থাক, নিবারুণবাবুর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। হনুমান হনুমানের মতো থাক, তিনি থাকবেন তাঁর মতো। কিন্তু এই ব্যাটাচ্ছেলে হনুমান কী করে যেন টের পেয়েছে যে, এ পাড়ায় সবচেয়ে নিরীহ ভালো মানুষ হল এই নিবারণ ঘোষাল। হতচ্ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না, কারও দিকে দৃকপাত অবধি নেই। কিন্তু নিবারণবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেই জামগাছে তুমুল আলোড়ন তুলে হুপহাপ দুপদাপ করে দাপাদাপি করতে থাকে।

প্রথম দিকের ঘটনা। শান্ত শরৎ কালের মনোরম সকাল। সোনার থালার মতো সূর্য উঠেছে। চারদিকে একেবারে আহ্লাদী রোদ। একটানা কোকিলও কুহুস্বরে ডাকছিল। নিবারণবাবু থলি হাতে প্রশান্ত মনে বাজার করতে বেরিয়েছেন। দুর্গানাম স্মরণ করে চৌকাঠের বাইরে সবে পা রেখেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জামগাছটায় ওই তুমুল কাণ্ড। নিবারণবাবু সভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ভারি ভিতু লোক।

গিন্নি বললেন, কী হল, ফিরে এলে কেন?

নিবারণবাবু আমতা আমতা করে বললেন, জাম গাছে কী যেন একটা কাণ্ড হচ্ছে।

গিন্নি হেসে বললেন, ও তো একটা হনুমান। কাল আমিও দেখেছি। পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল মারছিল।

নিবারণবাবু একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলো। হনুমান। জাম গাছতলা দিয়েই রাস্তা আর রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাতায়াত করছে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, বাজারমুখো এবং বাজারফেরত মানুষ ঝাড়ুদার। হনুমান কাউকে দেখেই উত্তেজিত নয়, কিন্তু যেই নিবারণবাবু ফের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন অমনি লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেল। নিবারণবাবু তখন সাহসে ভর করে একটু দৌড়ে পায়েই জাম গাছটা পেরিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কেন যেন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

তবে সেদিন বাজারে গিয়ে মনটা ভারি ভালো হয়ে গেল। সস্তায় বেশ বড় বড় পাবদা মাছ পেয়ে গেলেন। মরশুমের প্রথম ফুলকপি একটু দর করতেই দাম নেমে গেল, আর এক আঁটি ধনেপাতা কিনে ফেললেন মাত্র চার আনায়। বাজার সেরে যখন ফিরছেন তখন আর হনুমানটার কথা তাঁর খেয়াল নেই। যেই আনমনে জামগাছটার কাছাকাছি এসেছেন অমনি ডালপালায় তুমুল শব্দ করে হনুমানটা নেমে এল একেবারে নিচে। একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজখানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয়—ছোঁয়। নিবারণবাবু জীবনে দৌড়ঝাঁপ বিশেষ করেননি, তবু হনুমানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সেদিন এমন দৌড় দিলেন যে তাঁর ছোট ছেলে বিশু অবধি পরে প্রশংসা করে বলেছিল, বাবা, তুমি যদি সিরিয়াসলি দৌড়তে

তাহলে অলিম্পিক থেকে প্রাইজ আনতে পারতে। চটি পরা পা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে যে কেউ অমন দৌড়তে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

দৌড়টা যে ভালোই হয়েছিল তা নিবারণবাবুও জানেন, তবে শেষ অবধি চটিজোড়া পায়ে ছিল না, ছিটকে পড়েছিল। আর বাজারের ব্যাগ হাতছাড়া হয়ে সাধের পাবদা মাছ চারটে কাকে নিয়ে গেল, ছ'খানা ডিম ভাঙল আর রাস্তার একটা গরু দু'খানা ফুলকপি চিবিয়ে খেয়ে নিল।

দ্বিতীয়বার ঘটনাটা ঘটল অফিসে বেরোনোর সময়। নিস্তব্ধ জামগাছতলা দিয়ে বিস্তর লোক বিষয়কর্মে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু টিফিনকৌটা ছাতা বাগিয়ে গালে পানটি পুরে দুর্গানাম স্মরণ করে যেই নিবারণবাবু বেরোলেন অমনি জামগাছে যেন ঝড় উঠল। হনুমানটা এ ডালে ও ডালে ভীষণ লাফালাফি করতে করতে হুপহাপ করে বকাঝকাই করতে লাগল বোধহয়।

কিন্তু অফিসে তো আর কামাই করা যায় না, নিবারণবাবু ছাতাখানা ফট করে খুলে তার নিচে আত্মগোপন করে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন, জামগাছটা পেরোনোর সময় হনুমানটা তাঁর ছাতায় একটা খাবলা মারল।

গত তিনদিন ধরে নিবারণবাবুর জীবনে আর শান্তি নেই। আসতে হনুমান, যেতে হনুমান। হনুমানটা কেন যে শুধু তাঁর পিছনে লাগছে তা চিন্তা করে করে তিনি হয়রান। খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন না, তিনদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে কানু আর বিশু হনুমানটাকে তাড়ানোর জন্য বিস্তর ঢিল আর গুলতি ছুড়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। হনুমানটা গাছের মগডালে উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। ইট—পাটকেল তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

গিন্নি বললেন, পূর্বজন্মে ও তোমার ভাই ছিল, তাই এত টান। নিবারণবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হনুমানের ভাই হতে আমি যাব কেন?

দুশ্চিন্তা নিয়েই নিবারণবাবু রাতে শুয়েছেন। তবে ঘুম আসছে না। মাথাটা বেশ গরম। কাল সকালেই আবার বাজার আছে, অফিস আছে। জামগাছতলা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে পুরী বা ওয়াল্টেয়ার ঘুরে আসবেন কিনা তাও ভাবছেন। হঠাৎ একটা বিকট হুপ শব্দে নিস্তব্ধ রাতটা যেন কেঁপে উঠল। নিবারণবাবু চমকে উঠে বসলেন আতঙ্কে। অন্ধকার ঘর, তবু জানলার দিকে চেয়ে তাঁর বুক হিম হয়ে গেল। জানলাটা অর্ধেক ভেজানো ছিল। এখন জানলাটা পুরো খোলা। আর গ্রিল ধরে সেই অতিকায় হনুমানটা দাঁড়িয়ে। দু'খানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেলেন নিবারণবাবু যে, কাউকে ডাকতে পারলেন না,গলা দিয়ে স্বরই বেরোল না তাঁর। কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলেন।

হঠাৎ একটা বেশ ভরাট গমগমে গলা বলে উঠল, ভয় পাবেন না... ভয়ের কিছু নেই...

বিস্ময়ে হতবাক নিবারণবাবু কে কথা বলল, তা চারদিকে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কারও থাকার কথা নয়। কণ্ঠস্বরটি ফের বলে উঠল, রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর দূত মাত্র।

নিবারণবাবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্বপ্ন দেখছেন কিনা তা বুঝবার জন্য হাতে একখানা রাম চিমটি কেটে নিজেই উঃ করে উঠলেন।

গলাটা বলল, স্বপ্ন নয়। যা দেখছেন, যা শুনছেন সব সত্যি। নিবারণবাবু হনুমানের দিকে চেয়ে কাঁপা—কাঁপা গলায় বললেন, কথাগুলো কি আপনিই বলছেন? মানুষের ভাষায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিশেষ নেই। রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে ভালোবাসেন না।

রামচন্দ্র কে?

আমার প্রভু।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?

আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

ও বাবা! আমি পারব না, আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কীসের?

আমার ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।

গোলমালের কিছু নেই। চলে আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নিবারণবাবু বুঝলেন, এসব ভূতুড়ে কাণ্ড। এবং বেশ জবরদস্ত ভূতের পাল্লায় তিনি পড়েছেন। তবে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। তিনি ঘুমন্ত গিন্নিকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে কানু আর বিশুকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। সে এমন রামধাক্কা আর বিকট চেঁচানি যে মরা মানুষেরও উঠে বসবার কথা। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দই পেলেন না।

হনুমান বলল, ওদের ঘুম এখন ভাঙবে না। বৃথা চেঁচামেচি করছেন।

ভয়ে নিবারণবাবুর শরীর প্রথমে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তার ভয়ে আবার কলকল করে ঘাম হতে লাগল। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে, যে, হার্টফেল হওয়ার জোগাড়।

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, এসব আমার ভালো লাগছে না।

নিবারণবাবু শুয়ে পড়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলেন।

হনুমান বলল, নিবারণবাবু, প্রভুর হুকুম তামিল না করে আমার উপায় নেই। আপনি সহজে না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

এই বলে হনুমান চুপ মারল। নিবারণবাবু চোখ মিটমিট করে দেখতে পেলেন, হনুমান দু'হাতে গ্রিল ধরে টানাটানি করছে। শক্ত লোহার গ্রিল, ভাঙতে পারবে বলে মনে হল না নিবারণবাবুর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হনুমান মাত্র একটা হ্যাঁচকা টানেই পুরো গ্রিলটা জানালার ফ্রেম থেকে উপড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলল।

নিবারণবাবু এত ভয় পেয়েছেন যে, আরও বেশি ভয় পাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মজা হল ভয় যখন সাংঘাতিক বেশি হয় তখন মানুষের একটা মরিয়া সাহসও আসে। চোর তাড়ানোর জন্য খাটের মাথার কাছে একখানা মোটা বেতের লাঠি রাখা থাকে। আজ অবধি সেটা কোনো কাজে লাগেনি। আজ লাগল। নিবারণবাবু ভাবলেন, এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি, সুতরাং আর ভয়ের কী? যা থাকে কপালে—ভেবে লাফিয়ে উঠে তিনি লাঠিটা নিয়ে প্রবল বিক্রমে হনুমানের মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বসালেও লাঠিটা ঠিকমতো বসল না। হনুমান খুব আলগা হাতে লাঠিটা কেড়ে নিল হাত থেকে, তারপর সেটাকে প্যাঁকাটির মতো ভেঙে ফেলে বলল, কেন ঝামেলা করছেন? প্রভু রামচন্দ্র ডাকছেন, এ আপনার মহা সৌভাগ্য।

নিবারণবাবু যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হনুমানটা লম্বায় তাঁর সমান। আর চওড়ায় কুস্তিগীরদের মতো। এত বড় হনুমান তিনি এর আগে আর দেখেননি। বিপদে পড়ে মাথাটা একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি হনুমানের কথাগুলো শুনেও বুঝবার চেষ্টা করেননি। এবার তাঁর হঠাৎ মনে হল, এ কি সেই রামচন্দ্রের হনুমান নাকি? হনুমান তো অমর, তার এখনও পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকবার কথা। আর প্রভু রামচন্দ্র তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে এসব হচ্ছেটা কী? রামচন্দ্র তাঁর ভক্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ডাকবার জন্য? কিন্তু কেন? তিনি তো তেমন উঁচুদরের ভক্ত বা ধার্মিক নন!

হনুমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, আমার লেজটা ধরুন।

ভয়ে ভয়ে নিবারণবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে লেজটা ধরলেন আর ধরতেই যেন চৌম্বক আকর্ষণে হাতদু'টো লেজের সঙ্গে আটকে গেল। আর দাঁড়ানোর উপায় রইল না।

তারপর যে কী হল তা নিবারণবাবু ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। হনুমান তাঁকে জানালা গলিয়ে বাইরে এনে ফেলল এবং তারপর ইনজিনের মতো ছুটতে শুরু করল। এত ছুট জীবনে কখনও ছোটেননি নিবারণবাবু। তবে কেন যেন তাঁর হাঁফ ধরছিল না। চোখের পলকে নিজেদের তল্লাট এবং শহর ছাড়িয়ে

খোলা মাঠঘাটে এসে গেলেন তাঁরা। হনুমান মস্ত মস্ত লাফ মেরে ঢেউয়ের মতো চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দশ বারো হাত দূরে দূরে এক একবার পা মাটিতে ঠেকছে।

অনেকটা চলে আসার পর একটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তাঁরা। তারপর একটা ফাঁকা চত্বর। জঙ্গলঘেরা জায়গাটায় একটা লোক পিছনে হাত রেখে মৃদুমন্দ পায়চারি করছে। লোকটা বেঁটে এবং দেখতে একটু কিম্ভূত। পরনে একটা পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো পোশাক, মাথায় সরু টুপি। লোকটার গোল মুখখানায় চোখ নাক কান কোনোটাই ঠিক জায়গায় নেই বলে মনে হল দূর থেকে।

কাছে গিয়ে হনুমান লোকটাকে প্রণাম করে বলল, প্রভু এনেছি।

লোকটা নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, মুখটা ভালো করে দেখে আঁতকে উঠলেন নিবারণবাবু। এর চোখ দুটো দুই গালে। ঠোঁট দু'টো নাকের ওপরে। আর গলা বলে কিছু নেই। কান দু'টো গরুর কানের মতো। এই কি রামচন্দ্র? এত বিচ্ছিরি দেখতে?

রামচন্দ্র লোকটা ডান গালের চোখটা দিয়ে নিবারণবাবুকে দেখে নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, পেন্নাম করলে না?

যে আজ্ঞে! বলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র খকখক শব্দ করে হেসে বললেন, শোনো হে বাপু, আমি সত্যিই কিন্তু তোমাদের সেই রামায়ণের রামচন্দ্র নই। তার গল্পটা বেশ লাগে, তাই ভাবলুম রামচন্দ্র নামটা নিলে মন্দ হয় না।

আপনি আসলে কী তাহলে?

লোকটা মাথাটা একটু নেড়ে বলে, সে বাপু অনেক কথা। তবে সোজা কথায় আমি এ তল্লাটের লোক নই, এই দেশের, এমনকী এই হতচ্ছাড়া নোংরা গ্রহেরও নই। অনেক দূরের পাল্লা রে বাপু। আর আমার এই হনুমানটিও আসল হনুমান নয়। কলের হনুমান। তবে কল হলেও ও বড় খুঁতখুঁতে, সবাইকে পছন্দ করে না। দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মাত্র একটা লোককেই ও বেছে বের করেছে। সে হল তুমি।

নিবারণবাবু ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছিলেন। প্রত্যয় হচ্ছে না। যা শুনছেন সব সত্যি নাকি? এসব তো কল্পবিজ্ঞানে থাকে।

রামচন্দ্র বলল, তোমাদের গ্রহটা নোংরা হলেও মহাকাশে আমার কাজের পক্ষে সুবিধেজনক। আমার হনুমানকে তাই তোমাদের গ্রহে পাকাপাকি ভাবে রেখে যেতে চাই। সমস্যা হল, ওকে ঠিকমতো দেখাশুনা করার লোক চাই। ও তোমাকে খুঁজে বের করেছে, কাজেই ওর ভার তোমাকেই নিতে হবে। নিবারণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, যে আজ্ঞে, তবে কেমন যত্নআত্তি করতে হবে?

খুব সোজা, ওর মাথায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, চাঁদির একেবারে মাঝখানে। এই তেলের কৌটোটা নাও, মাসে একবার ওই ফুটোর মধ্যে দু'ফোঁটা তেল ঢেলে দিলেই হবে। আর তোমার বাড়ির জাম গাছটাতেই ও থাকবে। ওকে যেন কেউ বিরক্ত না করে দেখো। বেশি বিরক্ত করলে কিন্তু ও গা থেকে এমন রশ্মি বের করতে পারে যা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

নিবারণবাবু শিউরে উঠে বললেন, যে আজ্ঞে।

আর তুমি ইচ্ছে করলে ওকে ফাইফরমাশ করতে পারো, ওর সঙ্গে হিল্লি—দিল্লি বেড়িয়ে আসতে পারো।

নিবারণবাবু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, যে আজ্ঞে।

তাহলে এসো গিয়ে। কোনোরকম গোলমাল কোরো না কিন্তু।

আজ্ঞে না।

লোকটা অর্থাৎ রামচন্দ্র গটগট করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শিস দিল। অমনি মাটির তলা থেকে একটা কিম্ভূত পটলাকৃতি মহাকাশযান বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

নিবারণবাবু এখন বেশ আছেন। হনুমানটা জাম গাছেই থাকে। তবে তাকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মাঝরাতে হনুমানটা এসে তাঁর সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিয়ে যায়। ঘরের কাজকর্মও অনেক করে দেয়। গিন্নি তো পছন্দ করেনই, বিশু আর কানুরও সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে। হনুমানকে তেল দিতে নিবারণবাবুর একবারও ভুল হয় না।

ঘুড়ি ও দৈববাণী

অঘোরবাবু নিরীহ মানুষ। বড়ই রোগা—ভোগা। তাঁর হার্ট খারাপ, মাজায় সায়াটিকার ব্যথা, পেটে এগারো রকমের অসুখ। অফিসে তাঁর উন্নতি হয় না। কেউ পাত্তা দেয় না তাঁকে।

অঘোরবাবু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই ভালোবাসেন। তাঁর শখ—শৌখিনতা বলতে ওই একটাই। ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরি করেন। মস্ত মস্ত ঘুড়ি। মোটা সুতো আর মস্ত লাটাই দিয়ে অনেক ওপরে ঘুড়ি ভাসিয়ে দেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাটাই ধরে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকেন।

সেদিন একটা কাণ্ড হল। বিকেলবেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘড়ি ওড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে আসায় লাটাই গুটিয়ে যখন ঘুড়িটা ছাদ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হল, ঘুড়ির গায়ে একটা কিছু যেন লেখা আছে। ঘরে এসে আলো জ্বেলে দেখলেন, সাদা ঘুড়িতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা, আগামী সতেরো তারিখে আপনার মৃত্যু হবে, যদি না একখানা আস্ত গায়ে—মাখা সাবান খেয়ে ফেলেন।

অঘোরবাবু ঘোরতর অবাক। প্রায় আধ কিলোমিটার ওপরে উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে এই বিদঘুটে কথাটা লিখল কে? ভৌতিক কাণ্ড নাকি? মহা ভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। পাশের বাড়িতেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরঞ্জয় প্রামাণিক থাকেন। অঘোরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ডেকে ঘুড়ির গায়ে লেখাটা দেখিয়ে বললেন, এটা কী করে সম্ভব হল?

পরঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে সাবানটা খেও না, সাবান খেলে পেট খারাপ হয়। মনে হচ্ছে কেউ রসিকতা করেছে।

অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু আকাশের অত ওপরে কোনো রসিকের তো থাকার কথা নয়। রসিকদের কি আজকাল ডানা গজাচ্ছে?

পরঞ্জয় এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অঘোরবাবু হিসেব করে দেখলেন সতেরো তারিখের আর মোটে সাত দিন বাকি। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে একখানা গায়ে—মাখা সাবান অত্যন্ত কষ্ট করে খেয়ে ফেললেন। সাবান যে খেতে এত বিচ্ছিরি তা তাঁর জানা ছিল না।

পরঞ্জয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন অঘোরবাবু পেটের গোলমালে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। দুদিন লাগল বিছানা ছেড়ে উঠতে। বিকেলে তিনি আবার ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে উঠলেন। এবং যথারীতি লাটাই গোটানোর পর দেখলেন ঘুড়ির গায়ে লেখা রয়েছে, আগামী সতেরো তারিখে আপনি মারা যাবেন, যদি না কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলে দেন।

কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ সে হল এ পাড়ার কুখ্যাত গুন্ডা। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। গায়ে যেমন জোর তেমনি বদমেজাজ। অঘোরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই অনৈসর্গিক

আদেশ অমান্য করতেও তাঁর সাহস হচ্ছে না। সতেরো তারিখের আর দেরিও নেই। আজ চোদ্দো তারিখ।

সন্ধের পর তিনি সোজা গিয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হলেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু তখন একটা মস্ত বড় ছোরা ধার দিচ্ছিল। তাঁকে দেখে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, কী চাই?

অঘোরবাবু কাঁপতে কাঁপতে সামনে গিয়ে আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাঁ কানটা মলে দিয়েই দৌড় লাগালেন।

কিন্তু দৌড়ে পারবেন কেন? কৃষ্ণ কুণ্ডু ছুটে এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে উঠোনে এনে ফেলল। তারপর মুগুরের মতো দুখানা হাতে গদাম গদাম করে ঘুসি মারতে লাগল। তিনি ঘুসি খেয়ে উপুর হয়ে পড়ায় পিঠের ওপর একেবারে তবলা লহরার মতো কিল—চড়—ঘুসি পড়তে লাগল। জীবনে এরকম সাংঘাতিক মার কখনও খাননি অঘোরবাবু। যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

ফের দুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল। তারপর অঘোরবাবু ফের একদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ালেন। আজও ঘুড়ি নামিয়ে দেখলেন তাতে লেখা, সতেরো তারিখে মৃত্যু অবধারিত, যদি না বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন।

বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার আদেশের চেয়ে মৃত্যুদণ্ডই বোধহয় ভালো। কারণ অঘোরবাবুর অফিসের বড় সাহেব খোদ আমেরিকার রাঙামুখো সাহেব। যেমন রাশভারী, তেমনি শৃংখলাপরায়ণ। পান থেকে চুন খসতে দেয় না। তাছাড়া বড় সাহেবের নাগাল পাওয়াও কঠিন। আলাদা ঘরে বসেন, বাইরে আর্দালিরা পাহারায় থাকে।

কিন্তু ঘুড়ির আদেশ অমান্য করতে সাহস হল না তাঁর। দোকান থেকে দই আনিয়ে গেলাসভর্তি ঘোল তৈরি করে একটা ফ্লাস্কে ভরে অফিসে গেলেন অঘোরবাবু। খুবই অন্যমনস্ক, বুকটা দুরদুর করছে। বড়বাবুকে গিয়ে একবার বললেন, বড়সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেবেন?

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিচ্ছ কেন? বড় সাহেব কি হেঁজিপেঁজির সঙ্গে দেখা করেন? আর করেই বা লাভ কী। সাহেবের আমেরিকান ইংরেজি কি তুমি বুঝবে? বুকনি শুনলে ভড়কে যাবে যে!

বেজার মুখে ফিরে এলেন বটে, অঘোরবাবু, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে বেরিয়ে করিডর ঘুরে সোজা বড় সাহেবের খাস কামরার সামনে হাজির হলেন। দেখলেন বড় সাহেবের ঘর থেকে কয়েকটা লালমুখো সাহেব বেরিয়ে আসছে। আর্দালি দুটো তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

অঘোরবাবু সুট করে ঢুকে পড়লেন। বিশাল চেহারার বড় সাহেব মন দিয়ে একটা কাজ করছিলেন। মাথায় মস্ত গোলাপি রঙের টাক। অঘোরবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাবু?

অঘোরবাবু ফ্লাস্কটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে ঘোলটা ঢেলে দিলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় নেমে একটা বাসে উঠে পড়লেন।

চাকরি তো যাবেই, পুলিশও ধরতে পারে। তা হোক, তবু অনৈসর্গিক ওই আদেশ লঙ্ঘন করেনই বা কী করে?

সতেরো তারিখ এগিয়ে আসছে। আগামী কালই সতেরো তারিখ। বিকেলে অঘোরবাবু ফের ঘুড়ি ওড়ালেন। অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে নানা কথা ভাবছিলেন। বুকটাও দুরদুর করছে। তারপর ধীরে ধীরে লাটাই গোটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুড়িটা নেমে এল। ঘুড়িটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা, আগামী সতেরো তারিখে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না এক্ষুণি তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন।

অঘোরবাবুর হাত—পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। তিনতলা থেকে লাফ দিলে যে মৃত্যুর জন্য আর সতেরো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু করেনই বা কী? ঘুড়ি মারফত দৈববাণীই হচ্ছে বলে তাঁর স্থির প্রত্যয় হয়েছে, দৈববাণীর আদেশ না মানলে যদি ভগবান চটে যান?

অঘোরবাবু চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করলেন। শেষবারের মতো চারদিকটা জল—ভরা চোখে একবার দেখে নিলেন। এইসব কাজে বেশি দেরি করতে নেই। দেরি করলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বিধা আসে। অঘোরবাবু ধুতির কোঁচা এঁটে ছাদের রেলিঙের ওপর উঠে দুর্গা বলে নিচে লাফিয়ে পড়লেন।

পড়ে মাজার ব্যথায়, ঘাড়ের ঝনঝনিতে, কনুইয়ের খটাং—এ, মাথার কটাং—এ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে মূর্ছা গেলেন। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক সব দৌড়ে এল, কান্নাকাটি পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। প্রায় পনেরো দিন সেখানে পড়ে থাকতে হল। তারপর বাড়িতে এনে ফের কিছুদিন চিকিৎসা চলল তাঁর। পারিবারিক ডাক্তার অভয়বাবু তাঁর বন্ধুও বটে। অভয়বাবু কয়েকদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করার পর একদিন বললেন, বুঝলে অঘোর, একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।

অঘোরবাবু ভয় খেয়ে বললেন, কী ঘটেছে ভাই?

তোমার হার্ট একদম ভালো হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে হল?

ওই যে কেষ্ট গুন্ডার কাছে মার খেয়েছিলে, মনে হচ্ছে সেই শক থেরাপিতেই হার্টটা ঠিকঠাক চলতে শুরু করেছে। হার্টের একটা ভালভ কাজই করছিল না। এখন করছে। আরও একটা ব্যাপার!

আবার কী?

তোমার পেটে এগারো রকমের অসুখ ছিল। এখন একটাও নেই।

বলো কী হে!

হ্যাঁ। ওই যে সাবান খেয়েছিলে, ওর ঠেলাতেই পেটের সব রোগ—জীবাণু বেরিয়ে গেছে। এখন লোহা খেলেও তোমার হজম হবে। আরও একটা ব্যাপার।

অঘোরবাবু অবাকের পর আরও অবাক হয়ে বললেন, আরও?

হ্যাঁ। তোমার সায়াটিকা সেরে গেছে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ওই যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলে তারই চোটে সায়াটিকা উধাও হয়ে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার।

হ্যাঁ খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

কিন্তু সব হলেও চাকরিটা তো আর থাকছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অঘোরবাবুর খুব দুঃখ হল। দিব্যি বাঁধা চাকরি ছিল। বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার পর আর কোনো আশা নেই।

অঘোরবাবু যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, একটু পায়চারি—টায়চারি করতে পারছেন তখন একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ির সামনে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে এক লালমুখো বিশাল সাহেব নেমে এল। অঘোরবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু অল্পবয়সি সাহেবটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দ করতে লাগল যে সেই ভীম আলিঙ্গনে অঘোরবাবুর প্রাণ যায় আর কী।

তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সাহেব বলল, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপাতত তোমাকে তিন গুণ প্রমোশন দিয়ে আমার অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার করে নিচ্ছি। তোমার দু হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়িও দেওয়া হবে।

অঘোরবাবু স্বপ্ন দেখছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখলেন, জেগেই আছেন। তাহলে এসব কী হচ্ছে?

সাহেব নিজে থেকেই বলল, তোমার মতো গুণী মানুষ দেখিনি। টাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। টাকের জন্য কত ওষুধ খেয়েছি, কত চিকিৎসা করেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু তুমি সেদিন আমার মাথায় কী একটা ওষুধ ঢেলে দিয়ে এলে, এই দেখ এখন আমার মাথাভর্তি সোনালি চুল।

তাই বটে! ইনি তো বড় সাহেবই বটে। মাথাভর্তি চুল হওয়ায় এতক্ষণ চিনতে পারেননি অঘোরবাবু। গদগদ হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

বড় চোর ছোট চোর

হরেকেষ্ট বোষ্টমের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকতে যাবে এমন সময় শীতল সাধুখাঁর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি। নবু দাস কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "শীতলদাদা যে!"

শীতল একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, "দিনকাল কী পড়ল রে নবু, মগজ পাকল না, হাত মকশো হল না, গুরুবরণ হয়নি, দুধের ছোকরারা সব লাইনে নেমে পড়ল! ছি ছি! বিদ্যেটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল রে!"

শীতল দাস মান্যগণ্য লোক। লাইনে তার খুব নামডাক। বয়সেও বড়। তবু কথাগুলো শুনে নবুর ভারি আঁতে লাগল। বলল, "দ্যাখো শীতলদাদা, আমাদেরও ঘর—সংসার আছে, আমাদেরও পেট চালাতে হয়। একজন লুটেপুটে খাবে, আর আমরা আঙুল চুষব, এ তো নিয়ম নয়। আর মগজ পাকার কথা বলছ? মগজ কি আর ঘরে বসে থাকলে পাকবে? কাজে নামলেই মগজ খোলে। আর হাত পাকানোর কথা যদি বলো, তা হলে আমিও বলি, গেল হপ্তায় কি আমি বিদ্যেধর মণ্ডলের লোহার সিন্দুক ভাঙিনি?"

শীতল কঠিন হাসি হেসে বলল, "তা ভেঙেছিস! তবে পেয়েছিলি তো লবডঙ্কা! সিন্দুকের জিনিস সেদিনই বিদ্যেধর সব সরিয়ে ফেলেছিল। তোর বরাতে জুটেছিল এক বান্ডিল দস্তাবেজ, এক পুঁটুলি তামার পয়সা আর পঁচিশটি টাকা।"

নবু বলল, "সেটা বড় কথা নয় শীতলদা। সিন্দুক যে ভেঙেছিলাম, সেটা তো স্বীকার করবে?"

এইভাবে দু'জনের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল। তবে কোনো চেঁচামেচি নেই, ঝগড়া হচ্ছিল ফিসফিস করে, যাতে গেরস্তর ঘুম না ভেঙে যায়! ফিসফিস করে ঝগড়া করা সোজা কথা নয়। এলেম লাগে।

শীতল বলল, "দ্যাখ নবু, বড়দের মুখে—মুখে যে কথা বলতে নেই, এই শিক্ষেটেও তোর হয়নি দেখছি। চোর—ডাকাত যা—ই হোস, মানীর মানটা তো দিবি! যাকগে, এখন তুই কেটে পড়। সামনের ফাল্গুনে আমার ছোট মেয়ের বিয়ে। পাত্রপক্ষ ছ' হাজার টাকা পণ চেয়েছে। তার উপর সোনাদানা। বিয়ের খরচখরচা তো বড় কম নেই! তুই বরং শিবু হালুইয়ের বাড়িতে গিয়ে কাজ সেরে আয়। সকালে গোরু কিনতে প্রতাপপুরের গোহাটায় যাবে বলে শিবু সাত হাজার টাকা জোগাড় করে রেখেছে। খাটের নিচে মেটে হাঁড়িতে আছে। যা, গিয়ে হাসিল করে আয়।"

প্রেস্টিজে লাগলেও নবু আর কথা বাড়ায়নি। শীতলদাকে চটিয়ে লাভ নেই। বুড়ো চোরদের একটা জোট আছে। সে নতুন লাইনে নেমেছে, ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করলে, বিপদ হতে কতক্ষণ? বুড়ো চোরদের সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু এটা মানে যে, শীতল সাধুখাঁ, বিরিঞ্চি মণ্ডল, বিরু গায়েন, হরিপদ কীর্তনীয়ার মতো ওস্তাদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। ওদের দোষ একটাই। নবুকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।

একটু দাঁড়িয়ে শীতল সাধুখাঁর হাতের কাজ আর কৌশলটা দেখার ইচ্ছে ছিল নবুর। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে বলে আর দাঁড়ায়নি।

মুশকিলটা হল, শিবু হালুইয়ের বাড়িতে ঢুকতে যেতেই, শিবুর মেজোখুড়ো যে একটু মাথাপাগলা লোক, এটা তার খেয়াল ছিল না। লোকটার দোষ হল, দাওয়ায় বসে সারারাত বকবক করে। লোকে বলে, পবনখুড়ো নাকি ভূতপ্রেতের সঙ্গে কথা কয়।

দাওয়ার দিকটায় সুবিধে নেই দেখে, নবু পিছন দিকটায় কচুবন পেরিয়ে গিয়ে জানালা ফাঁক করল বটে, কিন্তু কাজটা মোলায়েম হল না।

দু'বার দু'টো খটাং আর মচাৎ শব্দ করে ফেলল। শীতল সাধুখাঁ ভুল বলেনি। এখনও তার সত্যি হাত মকশো হয়নি, গুরুমারা বিদ্যেও নেই। তবে পাকা মাথা হলে ভালো করে সুলুকসন্ধান আর আপৎকালের ফন্দিফিকির জেনে—বুঝে আসত। বিপদটা হল, ওই শব্দে সামনের দাওয়ায় পবনখুড়োর বকবকানি বন্ধ হয়ে গেল। আর ঘরের ভিতর থেকে শিবু হালুই ঘুমজড়ানো গলায় একটা হাঁক মারল, "বলি ও মেজোখুড়ো, কথা কইছ না যে বড়! তোমার কথা বন্ধ হলে যে আমার ঘুমের অসুবিধে হয়।"

পবনখুড়ো বলল, "এই একটু জল খেলুম বাপ। কথা তো সেলাই করতে হয় কিনা, তাই গলাটা শুকিয়ে যায়। টেনে ঘুম দে বাপু। কথা আর থামাচ্ছি না।"

পবনখুড়ো ফের বকবক শুরু করল। শিবু হালুইয়েরও নাক ডাকতে লাগল। নবু ডিং মেরে জানলা গলিয়ে ঘরের ভিতর সেঁধিয়ে গেল। কিন্তু খাটের নিচে নজর করে বড্ড দমে গেল সে। মেটে হাঁড়ির যেন হাট বসে গিয়েছে। গিজগিজ করছে মেটে হাঁড়ি। এর কোনটায় হালুয়ের পো—র সাত হাজার টাকা আছে, তা কে জানে? প্রথম হাঁড়ির মুখ থেকে মালসা সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখল, গলা অবধি ধান। পরেরটায় চিটেগুড়। তার পরেরটায় তিসির তেল। কিন্তু হাল ছাড়লে তো হবে না! পরের হাঁড়িটা হাতড়ে দেখে নবু বুঝল, জায়গাটা ফাঁকা। কিন্তু হাঁড়ি রাখার বিঁড়েটা পড়ে আছে। অর্থাৎ চার নম্বর হাঁড়িটা যথাস্থানে নেই। তা হলে কি হাঁড়ি নিয়ে কেউ হাওয়া হয়েছে? গুটিদশেক হাঁড়ি তল্লাশের পর হাল ছাড়তে হল। কারণ, পবনখুড়োর বকবকানি থেমেছে এবং শিবু হালুইয়ের ঘুমও ভেঙেছে। সে হাঁক দিল, "এ খুড়ো! ফের চুপ মেরে গেলে কেন?"

"চুপ কি আর সাধে মারি বাপ? তোর ঘরে যে ইঁদুর ঢুকেছে। বেজায় কুটুর—কুটুর শব্দ শুনছি। বলি, টাকাগুলো যদি কেটে রেখে যায়, তা হলে কাল সকালে কী দিয়ে গোরু কিনবি বাপু?"

"তাই তো!" বলে শিবু ধড়মড় করে উঠে পড়ল। নবু লহমায় জানলা গলে বাইরে লাফ মেরে পড়ল। পড়েই ছুটতে যাবে, এমন সময় জানলা গলে আর—একটা লোকও লাফিয়ে নেমে এসে ক্যাঁক করে তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, "আহাম্মক কোথাকার! আর—একটু হলেই যে কাজটা কাঁচিয়ে দিয়েছিলি রে হারামজাদা!"

লোকটাকে চিনতে পেরে নবু নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। শত্রুপক্ষের লোক নয়। এ হল নিবারণ সরকার। তা নিবারণদাদারও হাতযশ আছে। নিবারণদাদার বউ রিকশা করে বাজারে যায়। তার খোকাখুকিরা প্রাইভেট মাস্টারের কাছে পড়ে। বাড়িতে টিউবওয়েল আছে। দোহাত্তা কামায়।

নবু হাত কচলে দেঁতো হাসি হেসে বলল, "পাকা খবর পেয়েই ঢুকেছিলাম। তবে ফসকে গেল!"

নিবারণ অবাক হয়ে বলল, "কীসের পাকা খবর রে? সেই গোরু কেনার সাত হাজার টাকা নাকি? সে তো আমি কখন গস্ত করে বসে আছি। সাত হাজার তো এখন আমার ট্যাঁকে। একটা হাঁড়িতে খানিক আমসত্ত্ব পেয়ে গেলাম বলে এই দেরি। ও জিনিস তো আর হালুমহুলুম করে খাওয়া যায় না। চিবিয়ে রসস্থ করে খেতে হয়। তা তোর জ্বালায় কি আর শান্তিতে বসে খেতে পারলুম!"

নবু লজ্জায় নতমুখ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

নিবারণ বলল, "ওরে, মন খারাপ করিস না। রাত কাবার হতে এখনও মেলা দেরি। নন্দরামের ছেলের বিয়ে গিয়েছে পরশুদিন। শুনেছি পণের নগদ টাকা নন্দরামের বালিশের তলায় আছে, তা কম হবে না, হাজার দশেক তো বটেই। বেশিও হতে পারে। দ্যাখ চেষ্টা করে।"

নবু প্রমাদ গনল। একসময় নবু নন্দরামের বাড়িতে মুনিশ খাটত। হাড়ভাঙা মেহনত করে মাসকাবারে তিরিশটি টাকা মাত্র জুটত। তার ওপর নন্দরাম ভারি রাগী মানুষ, রেগে গেলে হাতের কাছে যা পাবে তাই ছুড়ে মারবে। গোরু হারিয়ে যাওয়ায় নবুর ওপর রেগে গিয়ে তার দিকেও ছুড়ে মেরেছিল বটে, তবে তখন নন্দরামের জলখাবারের সময় বলে হাতে ছিল একটা লুচিতে জড়ানো রসগোল্লা। তাই বরাতজোরে নবু বেঁচে যায়। আর সেই প্রথম রসগোল্লা দিয়ে লুচি খেতে কেমন লাগে তা টের পেয়েছিল। স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। সুবিধে শুধু এইটুকু যে, নন্দরামের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা তাকে খুব চেনে। আর বাড়ির সুলুকসন্ধানও নবুর জানা।

দেওয়াল টপকে বাগানে ঢোকা জলের মতো সহজই হয়ে গেল। কুকুরটা তেড়ে আসতেই নবু 'আমি রে, আমি' বলে তার গায়ে—মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সেটা লেজ নেড়ে তার হাত—পা চেটে দিতে লাগল। সাফাইয়ের লোক ঢোকার ছোট দরজাটার ছিটকিনি বরাবর নড়বড়ে ছিল। বাইরে থেকে সেটা খুলে দেখতে কোনো মেহনতের দরকার হল না। গ্রিলের তালাটা মটকে দোতলায় উঠে যাওয়া অব্দি গা মোটে ঘামলই না নবুর। তবে তার তো কপালটা বিশেষ ভালো নয়, শেষ রক্ষে হলে হয়!

মুখখানা গামছায় ভালো করে জড়িয়ে নিল নবু। তারপর নন্দুরামের শোওয়ার ঘরের দরজাটায় হাত লাগাল। পাকা হাত হলে কোনো সমস্যাই নয়। কিন্তু মুশকিল হল, নবুর হাত এখনও নিতান্তই কাঁচা। শিক ঢুকিয়ে ভিতরের ছিটকিনি খুলবার কসরত করার সময় একটা ঢপ এবং একটা ঠং শব্দ সে সামাল দিতে পারল না। আর কপালের এমনই ফের যে, দরজার পাল্লাটা খুলতে যেতেই কবজায় এমন বিকট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হল যে, তাতে পাথরেরও ঘুম ভেঙে যায়।

আর হলও তাই। কাঁচা ঘুম ভেঙে নন্দুবাবু উঠে বসলেন। গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, ''কে রে? কার এত সাহস? কার ঘাড়ে দু'টো মাথা যে, এই অসময়ে আমাকে বিরক্ত করিস?''

নবু বুঝল, এই মওকাটাও গেল। শীতলদাদা যা বলেছিল তা হাড়েহাড়ে সত্যি। সে এখনও দুধের শিশু। বারবার তিনবার কাজ ফসকে যাওয়ায় মাথাটাও যেন কেমনধারা হয়ে গেল নবুর। সে হঠাৎ বলে বসল, ''কাজের সময় অত চ্যাঁচামেচি করবেন না তো মশাই। ওতে ভারি অসুবিধে হয়।''

একথা শুনে নন্দরাম এমন হতবাক হয়ে গেল যে, প্রথমটায় মুখে বাক্য সরল না। তারপরই হঠাৎ ''তবে রে,'' বলে একটা হুংকার ছেড়ে উঠে হাতের কাছে যা ছিল তাই তুলে ছুড়ে মারল নবুর দিকে। বরাবরই নন্দরামের হাতের টিপ খুব ভালো। লুচিতে জড়ানো রসগোল্লাটাও নবুর কপালে এসে লেগেছিল, এটাও লাগল। নবু দু'হাতে কপাল চেপে ধরে ''আঁক'' শব্দ করে বসে পড়ল, কিন্তু বসে পড়েই বুঝতে পারল, তার হাতের কোষে এক বান্ডিল নোট।

ধুতির কষি আঁটতে—আঁটতে নন্দরাম খাট থেকে নামবার আগেই অবশ্য নবু একলাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে দুদ্দাড় সিঁড়ি ভেঙে, বাগান পেরিয়ে, দেওয়াল ডিঙিয়ে হাওয়া।

পরদিন কালুচরণের দোকানে ঢুকেই নবু টের পেল, বুড়ো চোরেরা তাকে আড়ে—আড়ে দেখছে। তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবটা আর যেন নেই বলেই মনে হচ্ছে। শীতল সাধুখাঁর চোখে একটু শ্রদ্ধার ভাবও যেন দেখতে পাচ্ছিল নবু। তা সে যাই হোক, নবু বেশ বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করেই বসে রইল।

ধুলোটে কাগজ

নিরাপদর মা মারা যাওয়ার পর তার আর কেউ রইল না। বড্ড একা পড়ে গেল সে। মাকে ভালোবাসতও খুব। মা ছাড়া কেউ ছিল না কিনা! কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সারাদিন। বাড়িতে মন টিকতে চায় না মোটে। তার ঠাকুরদার আমলের এই বাড়িখানায় পাঁচ—ছ'টা ঘর। সব পুরনো জিনিসে ঠাসা। পুরনো আমলের বাক্সপ্যাঁটরা, তোরঙ্গ, কৌটোবাউটো, রাজ্যের ন্যাকড়া—ট্যাকরা, ভাঙা লণ্ঠন থেকে ডালাকুলো সব ডাঁই হয়ে আছে সারা বাড়িতে। মা যক্ষীর মতো এসব আগলে রাখত। কোন কাজে লাগবে কে জানে! কিন্তু নিরাপদ যেদিকেই তাকায় অমনি মায়ের কথা মনে পড়ে, আর বড্ড হু হু করে বুক।

গাঁয়ের বন্ধুরা আর পাড়াপ্রতিবেশীরা অবশ্য তাকে নানা কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখল।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর গাঁয়ের মহাজন এবং মাতব্বর পশুপতি রায় একদিন গম্ভীরমুখে এসে বললেন, "ওরে নিরাপদ, বাড়িটার বিলিব্যবস্থা কী করলি? তোর মা যতদিন বেঁচে ছিল কিছু বলিনি। অনাথা বিধবা মানুষ, তার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? কিন্তু টাকাগুলো তো আর ফেলে রাখতে পারি ন। সুদে—আসলে যে অনেক দাঁড়িয়ে গেছে রে!"

নিরাপদ হাঁ। বলল, "কীসের টাকা?"

পশুপতি রায় একখানা ধুলোটে কাগজ বের করে দেখাল, "এই দেখ, তোর বাপের সই। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। বিশ হাজার টাকা হাওলাত নিয়েছিল বাড়ি আমার কাছে বাঁধা রেখে। সুদে—আসলে দেড় লাখ ছাড়িয়ে গেছে।"

বাবাকে নিরাপদর মনেই নেই। সে যখন ছোট ছিল, তখন মারা যায়। বাপের সইসাবুদও তার চেনার কথা নয়। কিন্তু পশুপতি ডাকসাইটে মানুষ। তার দাপটে সবাই তটস্থ। পশুপতি রায়ের সুনাম নেই বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করার সাহস পায় না।

নিরাপদ মিনমিন করে বলল, "তা আমাকে কী করতে হবে?"

পশুপতি রায় ভ্রূ কুঁচকে বলল, "পিতৃঋণ শোধ করা পুত্রের অবশ্য—কর্তব্য। তা, তুই যদি বাপের ধার এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা শোধ করে দিতে পারিস তা হলে আর ঝামেলায় পড়তে হয় না।"

নিরাপদ ঢোক গিলে বলে, "টাকা! টাকা কোথায় পাব? আমার তো খাওয়াই জুটছে না।"

"তা হলে তো বাপু বাড়িখানা ছাড়তে হচ্ছে। এই পুরনো ঝুরঝুরে বাড়ির দাম তিরিশ—চল্লিশ হাজার টাকা ওঠে কি না সন্দেহ। কিন্তু কী আর করা, কিছু টাকা বোকাদণ্ডই যাবে আমার। দু'দিন সময় দিলুম। পরশু দিন সকালে এসে বাড়ির দখল নেব। আর শোন, আমার দুটো পাইক পাহারায় থাকবে। বাড়ির কোনো জিনিস পাচার করা চলবে না। বাড়ি থেকে তো দাম উঠবে না, পুরনো মাল বেচে যদি আরও কিছু উসুল হয়।"

পশুপতি চলে গেল। কিন্তু দুটো ষণ্ডামার্কা পাইক বাড়ির বারান্দায় লাঠি হাতে বহাল রইল। দু'জনেই ভারি গম্ভীর।

নিরাপদ বুঝে গেল, সে চিপিকলে পড়ে গেছে। পশুপতি রায়ের থাবা থেকে বাড়িটা বাঁচানোর কোনো উপায় নেই। মুচকুন্দপুর গাঁয়ে বা তার আশপাশে এমন কেউ নেই যে পশুপতির সঙ্গে এঁটে উঠবে।

নিরাপদ একটু ভালোমানুষ আর একটু বোকা, আর একটু ভিতুও বটে। তাই সে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। বাড়ি ছাড়তে হলে সে যাবেই বা কোথায়, খাবেই বা কী? মা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন পশুপতি কেন উদয় হয়নি কে জানে? আর মা থাকতে তার খাওয়াপরারও অভাব ছিল না। মা কীভাবে চালাত তা অবশ্য সে জানে না। কখনও জিজ্ঞেস করারও দরকার হয়নি।

পাইক দু'জন তার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে দেখে সে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

পশুপতিকাকা ঘরের জিনিসপত্র সরাতে বারণ করে যাওয়ায় আরও ফাঁপরে পড়ে গেছে সে। ঘরের চাল—ডালে টান পড়েছে। ভেবেছিল দু'—একটা পুরনো বাসন বেচে দিয়ে চাল—ডাল কিনবে, এখন তো তাও হবে না। নিরাপদ এখন করে কী? কুয়ো থেকে জল তুলে একপেট জল খেয়ে সে ভিতরের দিকের দাওয়ায় বসে রইল চুপ করে। সামনে দেওয়াল—ঘেরা ছোট উঠোন। দুটো পেঁপে গাছ। একটা আম আর পেয়ারা গাছ। আমগাছে বসে দুটো কাক সমানে ডাকছে। নিরাপদর মাথায় কোনো মতলব আসছে না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে। তবু উঠে দুটো ভাত ফুটিয়ে নেওয়ার গরজও নেই তার। মনটা বড্ড খারাপ।

এমন সময় সদর দরজায় প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলেই দু'পা পিছিয়ে এল নিরাপদ। দুটো মুসকো পাইক রাগে গজরাচ্ছে। প্রথমজন বলল, "তোর এতবড় সাহস যে, তুই পিছন থেকে আমাকে লাথি মেরে পালিয়ে এসেছিস!"

অন্যজন বলল, "বেয়াদপ, নচ্ছার, এত তোর বুকের পাটা যে, পিছন থেকে আমার মাথায় গাট্টা মারলি!"

নিরাপদ ভয় পেয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলে, "আ—আমি! কাকুরা কী যা—তা বলছেন? আমি মারব আপনাদের? আমি তো পিছনের দাওয়ায় বসে ছিলাম!"

প্রথম পাইকটা খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে বলল, "অন্যায় করে ফের মিথ্যে কথা! দেব ঘাড়টা মটকে?"

প্রথম পাইকটা দ্বিতীয় পাইকটাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "দে না আমার হাতে ছেড়ে, গাট্টা কাকে বলে আমি ছোঁড়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

নিরাপদ জীবনে কারও কাছে মারধর খায়নি। সে ভয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু তাতে ভবি ভোলার নয়। দ্বিতীয় পাইকটা তার ঘাড় ধরে হেঁটমুন্ডু করে পেল্লায় একটা গাট্টা বসিয়ে দিল। নিরাপদর মাথাটা ঝিনঝিন করে উঠল।

এই সময় তাকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাইকটা প্রথম পাইকটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "এই বিষ্টু, তুই আমার পিঠে কিল মারলি কেন রে?"

লোকটা অবাক হয়ে বলে, "আমি কিল মারলাম। বলিস কী? আমি তো তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছি। মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাস না!"

"মিথ্যে কথা! কিল মেরে ফের ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে! বুঝেছি, একটু আগে যখন আমি বারান্দায় বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে একটু ঢুলে পড়েছিলাম, তখনই তুই গাট্টা মেরে গিয়ে ভালোমানুষের মতো তফাতে বসে পড়েছিলি।"

"দেখ পটা, বেশি বাড় ভালো না। জষ্টিমাসে কর্তাবাবুর বাগানের কাঁঠাল চুরি করে খেয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলি, সেকথা আমি ভুলিনি। হিরু পাইকের নাগরা জুতো হারিয়ে ফেলে আমাকে চোর বলে বদনামও তুই—ই তা হলে রটিয়েছিলি! আজ তোকে ছাড়ছি না।"

''দেখ বিষ্টু, লাই দিলে কুকুরও মাথায় চাপতে চায়। তোর বহুত বেয়াদপি এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। আজ তোর শেষ দেখে ছাড়ব।''

এই বলতে বলতে দু'জনের মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই লেগে গেল। নিরাপদ খিদে—তেষ্টা ভুলে দুই পাইকের লড়াই দেখতে লাগল। মারামারি করতে করতে দু'জনে জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হইহই শুনে লোকজন ছুটে এসে ভিড় করে ফেলল। যত লড়াই—ই একসময় শেষ হয়। এটাও হল। আধ ঘণ্টাটাক বাদে ধুলোমাখা দুটো পেল্লাই চেহারার লোক ছেঁড়া চুল, ফোলা চোখ, নড়া দাঁত আর রক্তমাখা ঠোঁটে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে যে যার বাড়ি চলে গেল। নিরাপদর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু কী নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়াটা লাগল, সেটা নিরাপদ বুঝতেই পারল না। তবে সে মনের আনন্দে রাত্রিবেলা ডাল—ভাত রান্না করে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোল।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় সদলবলে এসে হাজির। চোখ পাকিয়ে হুংকার ছেড়ে বলল, ''তুই নাকি আমার পাইকদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস! এত আস্পদ্দা তোর হয় কী করে?''

নিরাপদর একগাল মাছি। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, ''কর্তাবাবু, আপনার পাইকদের মারধর করার মতো অবস্থাই আমার নয়। আমি তাদের ভয়ে দরজায় খিল এঁটে ছিলাম।''

পশুপতি ফের হুংকার দেয়, ''মিথ্যে কথা! পাঁচজনে দেখেছে, তুই দুটো পাইককে উস্তমফুস্তম করে মেরেছিস। একজনের একটা চোখই বোধ হয় গেছে। পটার দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আমি থানায় এত্তেলা দিয়ে এসেছি, তোকে তারা এসে হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে। সাতটি বছর যাতে জেলের ঘানি টানতে হয় তার ব্যবস্থা করে রাখছি।''

নিরাপদ ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মিনমিন করে তবু বলল, ''আজ্ঞে, তারা যে নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছিল, নিজের চোখে দেখা।''

''এখন নিজের পিঠ বাঁচাতে গল্প ফাঁদছিস? যাকগে, যা বলার আদালতে দাঁড়িয়ে বলিস। বাঘা উকিলের জেরায় সব কথা বেরিয়ে পড়বে। আজ থেকে চারজন পাইক এ বাড়িতে মোতায়েন থাকবে। গড়বড় দেখলেই লাঠিপেটা করার হুকুম দিয়ে যাচ্ছি।''

এবার আরও বড় মাপের চারজন পাইক বহাল হল। তাদের চেহারা দৈত্য—দানবের মতো। তারা বড় বড় সড়কি আর রামদা হাতে নিয়ে সামনের বারান্দায় এঁটে বসল।

নিরাপদ ফের কাঁপতে কাঁপতে দরজায় খিল তুলে ভিতরের বারান্দায় বসে রইল। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

একটু বাদেই বাইরের দিকে প্রবল হুটোপাটি আর চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল সে। দৌড়ে গিয়ে জানলায় উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে শরীর হিম হয়ে গেল তার। দেখল, একটা কুড়ি—একুশ বছরের রোগাভোগা চেহারার ছেলে চারজন দৈত্য—দানবের মতো পাইককে দমাদম লাটিপেটা করছে। পাইকরাও লাঠি, সড়কি, দা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু ছেলেটার তাতে কিছুই হচ্ছে না। বরং উলটে ছেলেটার লাঠির ঘায়ে পাইকদের কারও মাথা ফাটছে, কারও কনুই ভাঙছে, কেউ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে, আর সবাই মিলে আর্ত চিৎকার করছে, ''বাঁচাও, বাঁচাও, মেরে ফেললে, কেটে ফেললে...!''

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লড়াই শেষ। চারটে পাইক চিতপটাং হয়ে পড়ে রইল, সাড়া নেই। ছোকরাটাকে ভারি চেনা চেনা ঠেকল নিরাপদর, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সে বলল, ''তুমি কে ভাই?''

কিন্তু কোথায় কে? ছোকরার চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তার পরিত্যক্ত লাঠিটা পড়ে আছে বারান্দায়। লাঠিটা তুলে নিয়ে নিরাপদ হাঁ করে চেয়ে রইল। হঠাৎ শিউরে উঠে সে বুঝতে পারল, ছোকরাটা হুবহু তারই মতো দেখতে। আয়নায় সে নিজের চেহারাটা যেমন দেখেছে, অবিকল সেই চেহারা। তাই অত চেনা চেনা ঠেকছিল বটে!

স্তম্ভিত হয়ে সে যখন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেই সময়ই একটা পুলিশের জিপ এসে বাড়ির সামনে থামল। দারোগাবাবু এবং জনাচারেক সেপাই নেমে এসে থমকে দাঁড়াল। চারজন ভূপতিত পাইক আর তার দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে দারোগাবাবু বললেন, "ওঃ, তা হলে যা শুনেছি তা মিথ্যে নয়!"

তাড়াতাড়ি লাঠিটা ফেলে দিয়ে নিরাপদ হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে দারোগাবাবু, কোথা থেকে উটকো ছেলে এসে এই কাকুদের খুব মারধর করে গেছে। আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই।"

দারোগাবাবু থমথমে মুখ করে বললেন, "বটে? তা, ছোকরাটা কে?"

"চিনি না।"

"তুমি না চিনলেও আমরা যে তাকে বিলক্ষণ চিনি হে। তার নাম নিরাপদ সরকার, তাই না?"

নিরাপদ কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, এই পাইক কাকুদের ধারেকাছেও আমি আসিনি। আমি দরজায় খিল দিয়ে..."

দারোগা হাত তুলে বললেন, "আর বলতে হবে না। এবার আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো থানায় চলো তো। তোমাকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। আমাদের ওপরেও হামলা করতে পারো। তাই আগেই সাবধান করে দিচ্ছি। বেগড়বাঁই দেখলে কিন্তু গুলি চালিয়ে দেব।"

অগত্যা থানাতেই যেতে হল নিরাপদকে।

থানায় একজন মস্ত গোঁফওয়ালা হোমরাচোমরা গোছের লোক বসে ছিলেন। চোখে ভ্রূকুটি, আর খুব রাশভারী মুখ। দারোগাবাবু তাঁকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি এখানে?"

"হ্যাঁ, আমি। ফোনে বড়কর্তার জরুরি হুকুম পেয়ে আসতে হল। তা, এই ছেলেটা কে? ধরেই বা এনেছেন কেন?"

দারোগাবাবু তখন সবিস্তার নিরাপদর গুন্ডামির কথা বলে গেলেন। শুনে রাশভারী লোকটা আপাদমস্তক নিরাপদকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বয়স কত?"

ভয়ে নিরাপদর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "আজ্ঞে, কুড়ি—একুশ হবে।"

"বলি, পুলিশে চাকরি করবে?"

নিরাপদ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে গোলমেলে মাথা নিয়ে চুপ করে রইল। ভুলই শুনে থাকবে। সে আজকাল ভুল শুনছে। ভুল দেখছেও।

রাশভারী লোকটা বলল, "পুলিশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের খুব অভাব। আমরা তোমার মতো বাহাদুর ছেলেই চাই। দেরি নয়, আজকেই জয়েন করো। আজই সদরে গিয়ে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সবাই এমন হাঁ করে রইল যে, সুচ পড়লে শোনা যায়।

পরদিন সকালেই পশুপতি রায় এসে হাজির। গোঁফ ঝুলে গেছে। চোখে করুণ দৃষ্টি। জোড়হাতে বলল, "বাবা নিরাপদ, এবারের মতো মাপ করে দে বাপ। জালিয়াতির দায়ে যদি জেল খাটাস, তা হলে এই বুড়ো বয়সে কি বাঁচব? মাপ করে দে বাপ। এই তোর বাপের ধারের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি!"

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "লে হালুয়া!"

বাঘের দুধ

তদানীন্তনবাবুর যে বাঘের সঙ্গে দিব্যি খাতির, তা লোকে জানে। খাতির মাগনা হয়নি। একবার নাকি পাতানাতা খুঁজতে ভুটভুটের জঙ্গলে ঢুকে ভারি ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। কানাওলা নামে একরকম ভূত আছে, তারা এমনিতে ফট করে কারও সামনে আসে না কিংবা শব্দ—সাড়াও করে না। তাদের কাজ হল মানুষের মগজে ঢুকে স্রেফ তার কাপাসটাকে অকেজো করে দেওয়া। ব্যস, সেই লোক আর কিছুতেই চেনা রাস্তাও চিনতে পারবে না, নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে দশবার যাতায়াত করেও বাড়ি ঠাহর করতে পারবে না, একেবারে ভজঘট্টে, ব্যাপার বাধিয়ে দেবে। তা ভুটভুটের জঙ্গলে তেমনধারা কানাওলা বিস্তর ছিল। তদানীন্তনবাবু পড়লেন তারই একটার পাল্লায়। জঙ্গল থেকে আর কিছুতেই বেরোতে পারেন না। ওদিকে অন্ধকারও নেমে এল। আর সেই আমলে ডুয়ার্স ছিল এক উদ্ভুটে জায়গা। ভূতপ্রেত দত্যিদানা তো ছিলই, আর ছিল বিস্তর বাঘ, হাতি, গন্ডার, বুনো শুয়োর, সাপখোপের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আর কে না জানে, জঙ্গলের মধ্যে সন্ধেবেলার চেয়ে ভয়ের সময় আর নেই।

তদানীন্তনবাবু তখন ছোকরা মানুষ। সবে কবরেজিতে পসার হতে শুরু করেছে। ডাক্তার—কবরেজদের এই শুরুর দিকটাই যা বিপদের। প্রথম দিকেই দু'চারটে ভোজবাজি দেখিয়ে দিতে পারলে রুগির একেবারে গাদি লেগে যায় চেম্বারে। পসার হয়ে যাওয়ার পর রুগি মরলেও আর কেউ কিছু মনে করে না। যে—কটা ভালো হয়, সেগুলোর কথাই লোকে ফলাও করে বলে বেড়ায়। তা তদানীন্তনবাবু গোটা দুয়েক ভোজবাজি ইতিমধ্যে দেখিয়েছেনও। মহাজন রামপ্রসাদের পেটে একটা টিউমার হয়েছিল। ডাক্তার বলেছে, অস্ত্র করতে হবে। রামপ্রসাদ অস্ত্র করার নামে এমন ভয় খেয়ে গেল যে, তার নাওয়া—খাওয়া বন্ধ হল। সেই টিউমার শেষে কমল তদানীন্তনের দেওয়া ওষুধে। রামপ্রসাদ খুশি হয়ে বলল, "তোমাকে কত দিতে হবে বলো, যা চাও তা—ই দেব।" কিন্তু লোভ তদানীন্তনের ধাতেই নেই। তার ওপর গুরুর বারণ আছে, চিকিৎসা মানে লোকসেবা, লোভ করতে যেও না বাপু! তদানীন্তন তাই দুটি টাকা আর ওষুধের দামটুকু নিয়েছিলেন। এতে সবাই বেশ বাহবা দিলে তাঁকে।

এরপর হেড পণ্ডিতের বউয়ের ভূতে ধরার ঘটনা। সে এক বিদঘুটে ব্যাপার। পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নি রাখালরানি মহা খাণ্ডার। তাঁর ভয়ে বাড়ির বেড়ালটা অবধি তটস্থ। অমন যে দাপটের পণ্ডিতমশাই, যাঁর ভয়ে ছাত্ররা একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকে, সেই—হেন পণ্ডিতমশাই রাখালরানির কথায় ওঠেন বসেন। রাখালরানিকে যে ভূতেরাও ধরার সাহস রাখে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। তবু ধরল, সবাইকে অবাক করে দিয়েই ধরল। আর কী ধরা বাপ। সাঁঝবেলায় পুকুরঘাটে গা ধুতে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন অন্য মানুষ। এক গলা ঘোমটা, নববধূর মতো হাবভাব, কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ ফুচফুচ করে কাঁদতে থাকেন, আবার যখন—তখন খিলখিল করে হেসে ওঠেন। অদৃশ্য সব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। গলা

ছেড়ে বিদঘুটে সব গান গাইতে লাগলেন। একদিন দিনে—দুপুরে একটা মোষের পিঠে চেপে খানিকটা ঘুরে এলেন। এইসব কাণ্ড দেখে ডাক্তার—বদ্যি ডাকা হল। তারা ফেল মারলে ডাকা হল ওঝা। রাজ্যের লোক ভেঙে পড়ল কাণ্ডটা দেখতে। ওঝা যখন হার মেনে চলে গেল, তখন তদানীন্তনবাবুর ডাক পড়ল।

তা তদানীন্তনের কপাল ভালোই বলতে হবে। খুঁজে পেতে লাগসই গাছগাছড়া পেয়ে ওষুধ বানিয়ে ফেললেন। আর তা লেগেও গেল। সাত দিনের মধ্যে রাখালরানি আবার সেই আগের মতোই খান্ডারনি হয়ে উঠলেন। তদানীন্তনের বেশ নাম হল। শুধু কে জানে কেন, পণ্ডিতমশাই বিশেষ খুশি হলেন না। কেবল বলতে লাগলেন, 'কবিরাজ না কপিরাজ, হুঁঃ, উনি আবার চিকিৎসা করবেন, লোকচরিত্রই জানে না লোকটা! কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সেই জ্ঞানই হয়নি।'

তৃতীয় যে রুগি হাতে এল, তিনি বলতে গেলে এলাকাটার রাজা। শোনা যায়, নরহরিবাবুর একসময়ে নাম হয়েছিল থরহরি বলে। তা কথাটা মিথ্যেও নয়। নরহরি প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। তাঁর হাতে মেলা লোক মরেছে, মেলা লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে। যথেষ্ট টাকাপয়সা হাতে এসে যাওয়ার পর নরহরি ডাকাতি ছেড়ে ব্যবসাতে মন দিলেন, জমি—জায়গাও কিনে ফেললেন বিস্তর। তাতে অবস্থাটা ফুলে—ফেঁপে উঠল, খুব নামডাকও হল। এখন উনি ডাকাতি করেন না বটে, কিন্তু হাতে মাথা কাটেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ। একদিন তদানীন্তনকে ডেকে পাঠালেন দরবারে। বিশাল ঘর, ঝাড়বাতি, কিংখাব কী নেই সেই ঘরে! তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। তদানীন্তনকে বললেন, ''দ্যাখো হে বাপু, ইদানীং মনে হচ্ছে আমি কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। এত টাকাপয়সা, ধনদৌলত, আমি বুড়ো হলে ভোগ করবে কে? অ্যাঁ! বুড়ো হব মানে? এ কি ইয়ার্কি নাকি? এখনও তেমন বয়স হল না, বুড়ো হলেই হল? তা তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে...''

শুনে তদানীন্তন মাথা চুলকোলেন। বুড়ো হওয়াটা কোনো রোগ নয়, তবে অকালবার্ধক্য হলে অন্য কথা। তিনি যতদূর শুনেছেন, নরহরির বয়স সত্তরের ওপর, চুলে এখনও পাক ধরেনি, শরীরটাও টানটান আছে। একখানা ছোটখাটো পাঁঠা, আস্ত কাঁঠাল বা সেরটাক রাবড়ি হাসতে হাসতে খেয়ে ফেলতে পারেন। কিলিয়ে পাথর ভাঙা নরহরির কাছে এখনও কিছু নয়। কিন্তু তা বলে তো আর জরা—বুড়ি ছাড়বে না। সে একদিন ধরবেই মানুষকে।

তদানীন্তনকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে নরহরি বললেন, ''দ্যাখো হে, রোগটা যদি সারাতে পারো তো তোমাকে আর ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। রাজা করে দেব। আর যদি না পারো তবে কী হবে, সেটা উহ্য থাক...''

তদানীন্তন বুঝলেন।

বুড়ো—হওয়া ঠেকানোর ওষুধ যে নেই, তা নয়। তবে বেশিরভাগ লোকই এটাকে রোগ বলে মনে করে না, চিকিৎসাও করাতে আসে না। আর ওষুধ জোগাড় করাও বেশ শক্ত। বাঘের দুধ, ব্রহ্মকমলের বীজ এবং আরও নানা দুষ্প্রাপ্য জিনিস লাগবে।

তদানীন্তন বললেন, ''দেখি।''

''দ্যাখো, বেশ ভালো করে দ্যাখো। এইটে তোমার অগ্নিপরীক্ষা, এই কথাটা মনে রেখেই কাজ করো বাপু।''

''যে আজ্ঞে।''

এটা যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি তা বুঝতে কষ্ট হল না তদানীন্তনের। ভারি চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। তবে তিনি এটাও জানেন যে, নরহরির চিকিৎসা যদি লেগে যায়, তা হলে পসারের জন্য আর ভাবতে হবে না।

ভাবতে ভাবতে তদানীন্তন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। রোজ সকালে নরহরির দুটো যমদূতের মতো পাইক সড়কি হাতে এসে হেঁড়ে গলায় হাঁক মারে, ''কই কবরেজমশাই, ওষুধ জোগাড় হল? বাবু যে হেঁদিয়ে পড়লেন। রোজ রাতে পনেরোখানা পরোটা খান, কাল রাতে চোদ্দর বেশি পারেননি। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।''

তদানীন্তন কবিরাজ অমায়িকভাবে বলেন, ''হচ্ছে বাবারা, হচ্ছে।''

তা দৌড়ঝাঁপ করে, নানা ফন্দিফিকির খাটিয়ে, কিছু—কিছু জিনিস পেয়েও গেলেন তদানীন্তন। এখন বাঘের দুধটা হলেই হয়। কিন্তু সেটা কী হবে? কথাতেই আছে 'বাঘের দুধ'। অভাবে গোরু বা মোষের দুধ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হবে না।

তা সে যা—ই হোক, নানা ভাবনাচিন্তায় পড়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বেঘোরে তো অন্ধকার নেমে এল। চারদিকে নানারকম জন্তু—জানোয়ারের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। তদানীন্তন অগত্যা একটা বেশ বড় গাছে উঠে পড়লেন। বিশ হাত—মতো উঠে তিনটে শাখার সংযোগস্থলে দিব্যি একটা রাত কাটানোর মতো ফাঁদালো জায়গাও জুটে গেল। সেখানে বসে—বসে আকাশ—পাতাল ভাবতে লাগলেন। পেটে খিদে, শরীরটার ওপর দিয়ে ধকলও গেছে কম নয়। তার ওপর কাঠপিঁপড়ে আর মশার কামড়েও জ্বালাতন হচ্ছেন।

ক্রমে রাত বেশ নিশুতি হয়ে এল। তদানীন্তনের একটু ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ শুনলেন, গাছের তলায় কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন কান্নাকাটি করছে বলে মনে হল। তবে মানুষ নয়।

তদানীন্তন অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে একটু ঝুঁকলেন। আর সঙ্গে—সঙ্গে তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর ঘাড়ে একটা ধাক্কা মেরে টালমাটাল করে দিল।

হড়াস করে তদানীন্তন গাছ থেকে পড়লেন। তবে সোজাসুজি নয়। সোজা পড়লে ঘাড় ভেঙে যেত নির্ঘাত। ডালপালায় আটকে এবং গোঁত খেয়ে—খেয়ে যখন নিচে এসে পড়লেন, তখন ঘাড় না হোক হাড়পাঁজর কিছু না কিছু ভাঙারই কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভাঙা তো দূরের কথা, ব্যথাটুকুও টের পেলেন না তিনি।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে হঠাৎ বোঁটকা গন্ধটা পেলেন। আঁতকে উঠে দেখলেন— যা দেখলেন, তা প্রত্যয় হল না।

একটা বিশাল বাঘ। বাঘ যে এতবড় হয়, তা ধারণাতেই ছিল না তদানীন্তনের। লেজ থেকে মাথা অবধি বোধহয় হাত দশেক হবে। উঁচুও একটা বড় মোষের সমান। বাঘটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর একটা অদ্ভুত শব্দ করে গোঙানি ছাড়ছে।

এরকম অবস্থায় তদানীন্তন আর পড়েননি কখনও। শত্রুও যেন না পড়ে।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ভরে বাঘটার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর কানে তাঁরই বিবেক যেন বলে উঠল, 'তুমি না চিকিৎসক! চিকিৎসক কি রুগি বাছে? জীব কষ্ট পাচ্ছে, তোমার কাজ তুমি করো।'

তদানীন্তনের ভিতরের সুপ্ত কবিরাজটি জেগে উঠল। তিনি যন্ত্রণাকাতর বাঘটার কাছে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, তদানীন্তন একটু চেষ্টা করতেই বাঘটার সামনের ডান পায়ের থাবার কিছু ওপরে নাড়িটাও টের পেলেন। বেশ চঞ্চল নাড়ি। বুঝতে পারলেন, বাঘটার পিত্ত কুপিত হয়েছে। বাঘটা হ্যাহ্যা করে হাঁফাচ্ছিল, আর জ্যোৎস্নাটাও নিশুতরাতে বেশ জোরালো হয়ে পড়েছে বলে জীব পরীক্ষা করতেও বেগ পেতে হল না। চোখ টেনে চোখের কোলটাও পরীক্ষা করে নিলেন।

জঙ্গলে গাছগাছড়ার অভাব নেই। মোক্ষম ওষুধটি খুঁজে বের করতে কষ্টও হল না। এনে খাইয়ে দিলেন। বাঘটাও, আশ্চর্যের বিষয়, খেল।

তারপর বাঘটা একটু আরাম বোধ করে শুয়ে পড়ল। তদানীন্তন তার পিঠ চুলকে দিলেন। কানে সুড়সুড়ি দিলেন। বাঘটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

এরপর বাঘের দুধ জোগাড় করতে আর কষ্ট পেতে হয়নি তাঁকে।

লোকে দেখেছে, সন্ধেবেলা বাঘটা এসে তদানীন্তনের গোয়াল—ঘরে ঢুকত, আর তদানীন্তন বালতি নিয়ে গিয়ে সের—সের দুধ দুইয়ে নিতেন। লোকে বলে, সেই দুধ থেকে ছানা, দই, এমনকী ঘি অবধি তৈরি করতেন তদানীন্তন। নিজে তো খেতেনই, চড়া দামে বিক্রিও করতেন।

কিন্তু যে—কথাটা বলার জন্য এই এত কথা, তা হল নরহরিকে নিয়ে।

তদানীন্তনবাবু তো বাঘের দুধ ও আর সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে বার্ধক্য ঠেকানোর ওষুধ তৈরি করলেন। তারপর গিয়ে হাজির হলেন নরহরির দরবারে।

নরহরি ওষুধের শিশিটা খুলে নাকের কাছে ধরে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ''এঃ, বিচ্ছিরি গন্ধ। এতে কাজ হবে তো হে কবরেজ? নইলে কিন্তু...''

কাজ হল কি না, তা ঠিক বোঝা গেল না।

তবে ক'দিন বাদে একদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা। তদানীন্তন তাঁর গাছগাছড়ার খোঁজে যাচ্ছিলেন। আর ঘোড়া দাপিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নরহরি।

একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন।

''এই যে কবরেজ। কী খবর?''

তদানীন্তন তটস্থ হয়ে বললেন, ''যে আজ্ঞে। খবর ভালোই। তা আপনাকে বেশ ছোকরা ছোকরা দেখাচ্ছে কিন্তু।''

এ—কথায় হঠাৎ ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলেন নরহরি। তারপর গাঁক—গাঁক করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ''এ—কথাটা আজকাল আমাকে সবাই বলে কেন বলো তো! এ কি ইয়ার্কি নাকি?''

''আজ্ঞে না, ইয়ার্কি হবে কেন? যথার্থই বলে।''

নরহরি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, ''ইয়ার্কি পেয়েছ। ছোকরা দেখালেই হল? বয়স কত হয়েছে তা খেয়াল আছে? একাত্তর ছাড়িয়ে বাহাত্তরে পড়লুম, আর ছোকরা দেখাবে মানে? বয়সের গাছপাথর নেই, তা জানো? ওসব কবরেজি একদম করবে না আমার কাছে। বুড়ো বয়সে বুড়ো হওয়াটাই ধর্ম, বুঝলে? ছোকরা দেখানোটা কাজের কথা নয়।''

''যে আজ্ঞে।''

''চুলে পাক ধরেছে, দেখেছ? কষের দাঁত পড়েছে জানো? আজকাল দশখানা পরোটার বেশি পারি না, খবর রাখো?''

''আজ্ঞে না।''

''খুব কবরেজ হয়েছে! পণ্ডিত ঠিকই বলে, কবিরাজ না কপিরাজ।'' এই বলে ফের ঘোড়া ছোটালেন নরহরি।

তদানীন্তন হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

ভূতের ভবিষ্যৎ

বাসবনলিনী দেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল—কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যে—সব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু'হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড় কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পাল্টাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর—সংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমতো বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র—কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে "নাড়ু খাব, নাড়ু খাব" বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড় ছেলের ছোট ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন ছেলের কোন ছেলের কোন ছেলে, বা কোন মেয়ের কোন মেয়ের কোন মেয়ের মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন ছেলের কোন মেয়ে বা কোন ছেলের কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন মেয়ে, সে—সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কমপিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ—মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন।

কাজেই অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোনটা খেতে ভালোবাসে; কোনটা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে—ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কমপিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, "মা নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব?"

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললে, "তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি!"

"ভুল হয়ে গেছে মা।"

"অত ভুল হলে চলে কী করে? দেখছিস তো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি, দে তো একটা।"

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, "খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।"

"আচ্ছা মা।" বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক করে একটা কাশির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক—ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, "আবার এ—ঘরে ছোঁক ছোঁক করছ কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন?"

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই—খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার—পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বলেন, "ছোঁকছোঁক করি কি আর সাধে? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার—মার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরি কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।"

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, "ওরে বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।"

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু'খানা দু'গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, "তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?"

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন "ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস?"

"যাই মা।" বলে সাড়া দিয়ে একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, "বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি!"

"খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।"

"তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভালো করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।"

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই—খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।"

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও?"

"কেন কী হয়েছে?"

"সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারি ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত—মস্ত হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।"

"তাই যাও। কিন্তু সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।"

''হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব?''

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, ''এবার অটোবড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভালো করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয়!''

''দিচ্ছি মা।''

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানলা খুলে দেখলেন, বাইরে সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাচের ঢাকনাওলা বড়ি—বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি—বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি—বেলুন দিব্যি গড় গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল—পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি—বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু—তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি—বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশগুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি—বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি—বেলুনে একটা পাহারাদার কমপিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি—বেলুন সাঁত করে প্রয়োজন মতো ডাইনে—বাঁয়ে বা ওপরে—নিচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানালার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতে সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালোবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাবল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাবল বা বুদবুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।

বুদ্বুদবন্দি হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোট ছোট ট্যাবলেট বা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনো ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলেই জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে—হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দমতো আলু—কুমড়ো—পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটি দরকার হয় না। শূন্যে নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নিচে চমৎকার আলু থোকা—থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন—পটল—ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনো বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোট—ছোট ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তার। কোনো অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি—বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারেজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য—পানীয়ের একখানা ছোট আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই—চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদ্বুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড় বড় উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনো পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে নিচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড—স্কিও করছে। কেউ—কেউ। হাওয়াই বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক—ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি—বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, "কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?"

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভটচাযের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম জাম কাঁঠাল কিচ্ছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটে কোনো অসুবিধেই হত না। এই বড়ি—বেলুনে রোদে—দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড় কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, "আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব'খন।"

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।"

"কেন রে কী হল?"

"আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিওতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারি বেয়াড়াপনা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।"

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলিস কী! এ তো সব্বোনেশে কাণ্ড।"

রেমো একটু হেসে বলল, "তোমরা পুরনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ—যুগের কোনো খবরই রাখো না। তবে ভালোর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবারে—দাবারে বিষটিস মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।"

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললেন, "তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়া খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।"

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, ''তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কব্জায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতি ভাই, তলায় তলায় সকলে সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যান্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনোনি?''

''না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।''

''যাই ঠাকুমা, মা—বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।''

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখন বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অক্সিজেন—রুমাল মাঝে মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই—জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউ ঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা, যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট—কাজের—লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট—গয়লা, রোবট—ধোপা, রোবট—নাপিত, রোবট—ফেরিওয়ালারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট—ডাক্তার, রোবট—নার্স। বাসবনলিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজি গলায় বলেছিলেন, ''ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো কায় পাকাড়কে অ্যায়সা মোচড় দেগা যে, আক্কেল গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস?''

গঙ্গারাম একটু বোকা গোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খান না। ওদের এতকাল কোনো নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, ''শোনো, এখন চাকর—বাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পাল্টে গেছে।''

আশুবাবু রেগে গিয়ে বললেন, ''কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?''

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, ''আঃ, আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?''

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, ''শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আশকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যান্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।''

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, ''সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?''

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, ''অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।''

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, ''কী ওষুধ?''

আশুবাবু খুব হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, ''আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।''

''বলো কী? চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।''

''দেখাব, কিন্তু পাঁচ—কান করতে পারবে না। তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।''

''না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।''

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, ''বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ভয়—টয় পেতে পারো।''

''জিনিসটা কী?''

''দেখলেই বুঝবে।''

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভূত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, ''ওঁ ফট, ওঁ ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া...'' ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে?''

আশুবাবু হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, ''এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হ'ত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।

''কিন্তু লোকটা আসলে কে?''

এ—কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো—করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, ''এজ্ঞে, আমি হলুম, গে ভূত। এক্কেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখা—সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলুম, হচ্ছিল না, তা এজ্ঞে, এবার এ—বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।''

শুনে বাসবনলিনী গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, ''আর ভয় নেই গিন্নি ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদের টিট করবে ওরাই।''

কেলে ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ''এজ্ঞে, এক্কেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব, কোনো চিন্তা করবেন না।''

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''বেঁচে থাকো বাবারা।''

জকপুরের হাটে

নটবর সাউ সন্ধে লাগতেই দোকান বন্ধ করে হাট করতে বেরিয়ে পড়ল। শেষ হাটে জিনিসপত্র বেজায় সস্তায় পাওয়া যায়। দোকানিরা ঝপাঝপ মাল বেচে হাল্কা হয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন।

জকপুরের হাট বেশি দূরেও নয়। আকন্দপুরের খালটা যেখানে মাওবেড়ের দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে শিবতলার মাঠে বিরাট জায়গা জুড়ে হাট। হ্যাজাক, টেমি, কারবাইডের আলো চারিদিকে ঝলমল করছে যেন। কেউ কেউ দোকান গুটিয়ে ফেলেছে, কেউ কেউ গোটাচ্ছে আবার কোথাও রমরম করে বিকিকিনি চলছে।

ব্যাপারীরা বেশিরভাগই নটবরের মুখ চেনা। এই যেমন রায়দিঘির বিখ্যাত বেগুন নিয়ে আসে মুকুন্দ পাল। সোনার গাঁয়ের ফুলকপি নিয়ে বসে শিবু গায়েন, চণ্ডীগড়ের বড় বড় লাল মুলো বেচতে আসে হারান দাস। নটবরের অবশ্য আজ অন্য দরকারেও আসা। হাটের পশ্চিম ধারে এক বুড়ো মতো মানুষকে মাঝে মাঝে টেমি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। তার লম্বা সাদা দাড়ি, বিশাল গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বয়স হেসেখেলে অন্তত পঁচাশি হবে। মুখখানার চামড়ায় অনেক ভাঁজ, মাথায় একটা সাদা টুপিও থাকে। মাঝে মাঝে গায়ে লাল রঙের কাপড় জুড়ে তৈরি একটা জোব্বা মতো। এই সাংঘাতিক শীতে খোলা মাঠের দিকে বুড়ো কিছু পুঁথি—পুস্তক বিক্রি করতে বসে থাকে। গাঁয়ের লোক বই টই বেশি পড়ে না। তাই বুড়োর বিক্রিবাট্টাও নেই। তবুও বুড়ো বসে থাকে। হাটে এসে কৌতূহলের বশে নটবর তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল, বিচিত্র সব নাম— 'মহাকাশের হাতছানি', 'পৃথিবীতে আজব মানুষের আগমন', 'সহজ উড়ন শিক্ষা', 'জাদুবলে রোগ আরোগ্য', 'দ্রব্যগুণের সাহায্যে গগনে বিহার'।

সবই বুজরুকি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৌতূহল এক সাংঘাতিক ব্যাপার, ঝোঁক চাপলে মাথাটা যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে যায়। নটবর কেনাকাটা সেরে বুড়োর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। টেমির আলোয় ম্লান পুরোনো বইগুলো হলদেটে দেখাচ্ছে। বুড়ো শীতে জবুথবু হয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বইটই আগের দিনই দেখে পছন্দ করে রেখেছিল নটবর—'সহজ ভূত নামাইবার কৌশল'।

'ও দাদু!'

বুড়ো চোখ চেয়ে নটবরকে দেখে বেজার মুখে বলে, 'কী চাই?'

'এই বইখানার কত দাম?'

'এক টাকা।'

'বইতে যা লেখা তাতে কাজ হয়?'

'কে জানে বাপু, আমি তো পরখ করিনি!'

'কাজ না হলে বই ফেরত দেব কিন্তু?'

'না বাবু, ওসব ফেরতটেরত হবে না। নিলে নাও, না নিলে পথ দেখ।'
'আহা, এসব তো বুজরুকিও হতে পারে?'
'তা হতে পারে!'
নটবর একখানা টাকা ঠকাং করে ফেলে বইখানা তুলে নিল। গেল একখানা টাকা। তা আর কী করা যাবে।
বইখানা পকেটে পুরে নটবর বাড়ি রওনা হল।
না, ভূতে নটবরের বিশ্বাস নেই। সে ভূতটুত মানে না। এই নিয়ে বন্ধু ভজহরির সঙ্গে তার প্রায়ই তর্ক হয়। ভজহরি আবার ঘোরতর ভূতে বিশ্বাসী। প্রায়ই বলে, 'এখন মানছ না, কিন্তু একদিন ঠেলায় পড়ে মানবে।'
ভূত না মানলেও কৌতূহলকে তো আর ঠেকানো যায় না।
আজ বড়ই শীত পড়েছে। তার গ্রাম শামুকখোলা, একটু দূরেই। ভারী থলি দুখানা দুহাতে ঝুলিয়ে যথাসাধ্য জোরেই হাঁটছে নটবর। কুয়াশায় পথঘাট আবছা, তবে একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্না থাকায় তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। রথতলা ছাড়িয়ে আম বাগানের পাশের রাস্তায় সবে পা দিয়েছে— এমন সময় একটা লোক পিছন থেকে তার পাশাপাশি এসে পড়ল।
লোকটা বলে উঠল, 'শামুকখোলা যাচ্ছেন নাকি মশাই?
'হ্যাঁ।'
'ভালো ভালো। তা হাটে আজ কেমন কেনাকাটা হল?'
'এই টুকিটাকি।'
'মুলো, বেগুন সব পেলেন?'
'তা পেলুম।'
'বেশ বেশ।'
'তা আপনি কোন দিকে?'
'এই একটু বিষয়কার্যে এসে পড়েছিলুম এই দিকে। তা আর কী কিনলেন?'
'এই ঘরগেরস্থের টুকিটাকি জিনিস।'
লোকটা হেসে বলল, 'আছে কিন্তু।'
'কী আছে?'
'ওই যা বলছিলাম আর কী! আচ্ছা মশাই আসি, এই ডানহাতি আমার রাস্তা।'
নটবর ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারল না। উটকো লোকটা যে কোথা থেকে উদয় হল, কোথায় অস্ত গেল কে জানে।
সামনেই বাঁ ধারে কপালী দিঘি। চারধারে গাছগাছালি। দিঘির কোল ঘেঁষে রাস্তাটা পেরনোর সময় হঠাৎ নটবরের মনে হল সামনের ঘাটে কে যেন চান করছে। এই শীতের রাতে ঠান্ডা জলে চান করে কে?
ঘাটের কাছে পৌঁছে দেখল চান করে একটা মোটাসোটা লোক উঠে এল। গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে বলল, 'হাটে গিয়েছিলেন বুঝি?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আপনি এই শীতের রাতে চান করছিলেন যে?'
'চান না করলে শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করে। সারা দিনে আমি বার পঁচিশেক চান করি কি না!'
'বলেন কী? ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে যে?'
লোকটা একটু হেসে বলে, 'আরে না, নিউমোনিয়া কি আর সকলের হয়! তা হাটে কী কী পেলেন?'
'এই একটু শীতের শাকপাতা।'
'শুধু শাকপাতা?'

'আর এই টুকিটাকি?'

'শুধু টুকিটাকি।'

'এই সামান্য জিনিসপত্তর।'

লোকটি গা মুছতে মুছতে বলল, 'তা বলে ভাববেন না যে নেই।'

'কী ভাবব না?'

'এখনও আছে, অনেক আছে। যাই আর একবার ডুব দিয়ে আসি।'

লোকটা ফের জলে নেমে গেল। হ্যাঁ! আচ্ছা পাগল তো!

গাঁয়ের কাছ বরাবর চলে এসেছে নটবর। জটেশ্বরের খালের সাঁকোটা পেরোলেই গাঁয়ের সীমানায় ঢুকে পড়বে।

সাঁকোতে পা দিতেই নটবর দেখতে পেল সাঁকোর মাঝ বরাবর বাঁশের রেলিং—এর হাতে ভর রেখে একটা লোক জলের দিকে চেয়ে আছে। নটবর সাঁকোতে উঠতেই 'মচাৎ' করে শব্দ হওয়ায় লোকটা ফিরে তাকাল। চেনা মানুষ নয়।

'নটবরবাবু নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'হাট করে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?'

'মাছ ধরছি।'

'মাচ ধরছেন!' বলে নটবর হাঁ হয়ে গেল! সাঁকোর ওপর থেকে এই রাত্তিরে মাছ ধরা যায় বলে সে জন্মে শোনেনি। হেসে বলল, 'কীভাবে ধরছেন? মন্তর দিয়ে নাকি?'

'না ছিপ দিয়ে। দেখবেন?'

লোকটার হাতে যে ছিপ রয়েছে সেটা এতক্ষণ লক্ষ করেনি নটবর। এবার করল। লোকটা ডান হাতের ছিপটা হঠাৎ করে 'ছপাৎ' করে ওপরে তুলতেই দেখা গেল বঁড়শিতে বেশ বড়সড় একটা মাছ লাফঝাঁপ করছে। তাজ্জব ব্যাপার।

'দেখলেন তো নটবরবাবু?'

'দেখলাম। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার।'

'না, না, এ আর বিস্ময়ের কী? তা হাটে যা খুঁজতে গিয়েছিলেন তা পেলেন?'

'তা পেলাম, শীতের শাকসবজি আর কী!'

'উঁহু, ওসব নয়। আর যা খুঁজতে গিয়েছিলেন।'

'এই টুকিটাকি সব জিনিসপত্র। ঘরগেরস্থালীতে তো কত কিছুই লাগে।'

'সে আমি জানি। কিন্তু সে সব ছাড়া আর কিছু?'

'না, আর বিশেষ কী?'

'কী যে বলেন নটবরবাবু। যাকগে, কথাটা হল— ওসব নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানোই ভালো।'

'কী সব নিয়ে! কীসের কথা বলছেন?'

'বলছিলাম কি, দুতরফা নিজের নিজের মতো করে আছে। কাজ কী বলুন অন্য তরফের তল্লাশ নিতে যাওয়ার। ওতে অন্য তরফের বড্ড অসুবিধে হয় কি না।'

দুই তরফা! নটবর হঠাৎ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। কোন তরফের কথা বলতে চাইছে লোকটা?

'আচ্ছা আসি নটবরবাবু।' বলে লোকটা হনহন করে তার পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। তাকে ভেদ করেই গেল যেন! কিন্তু নটবরের গায়ে একটু ছোঁয়াও লাগল না। হঠাৎ নটবরের গা শিউরে উঠল।

'বাপরে!' বলে বাজারের থলি ফেলে নটবর প্রাণপণে ছুটতে লাগল। পড়ি কি মরি অবস্থা।

পরদিন সে ভজহরিকে গিয়ে বইখানা দান করে বলল, 'আছে রে ভাই আছে।'
ভজহরি একগাল হেসে বলল, 'বলেছিলাম কি না।'

আয়নার মানুষ

শক্তপোক্ত মানুষ হলে কী হয়, গদাধর আসলে বড় হা—হয়রান লোক। তিন বিঘে পৈতৃক জমি চাষ করে তার কোনোক্রমে চলে, বাস্তুজমি মোটে বিঘেটাক। তাতে তার বউ শাকপাতা, লাউ—কুমড়ো ফলায়। দুঃখে কষ্টে চলে যাচ্ছিল কোনোক্রমে। কিন্তু পরানবাবুর নজরে পড়েই তার সর্বনাশ।

পরানবাবু ভারি ভুলো মনের মানুষ। জামা পরেন তো ধুতি পরতে ভুলে যান, হাটে পাঠালে মাঠে গিয়ে বসে থাকেন, জ্যাঠামশাইকে 'ছোটকাকা' ডেকে বিপদে পড়েন। লোকে আদর করে বলে 'পাগলু পরান'। তবে পরানবাবু মাঝে—মাঝে অদ্ভুত—অদ্ভুত কথা বলে ফেলেন। একদিন গুরুপদকে বললেন, "ওরে সাধুচরণ, চারদিকে চোর। খুব চোখ রাখিস বাপু!"

তা সত্যিই সেই রাতে গুরুপদর বাড়িতে চোর ঢুকে বাসনপত্র নিয়ে গেল।

আর একদিন লক্ষ্মীকান্তকে বলে বসলেন, "রজনীকান্ত যে! তা বিষ্ণুপুরে বেশ ভালো আছ তো ভায়া!"

লক্ষ্মীকান্তর বিষ্ণুপুরে যাওয়ার কথাই নয়, যায়ওনি কোনোদিন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর কিছুদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরে একটা মাস্টারির চাকরি হয়ে লক্ষ্মীকান্ত চলে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকে বলে গেল, "পরানবাবু ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।"

অনেকেরই সে কথা বিশ্বাস হল। গাঁয়ের মাতব্বর শশিভূষণ একবার পরানবাবুর খোঁড়া কুকুর ভুলুকে প্রকাশ্যে 'ল্যাংড়া' বলায় খুব রেগে গিয়ে পরানবাবু বলেছিলেন, 'দ্যাখো নিশিবাবু, সব দিন সমান যায় না। ভুলু যদি ল্যাংড়া হয় তো তুমিও ল্যাংড়া।"

অবাক কাণ্ড হল, দিনসাতেক বাদে শশীবাবু গোয়াল ঘরের চালে লাউ কাটতে উঠে একটা সবুজ সাপ দেখে আঁতকে উঠে চাল থেকে পড়ে বাঁ পায়ের গোড়ালি ভাঙেন। মাসটাক তাঁকে নেংচে—নেংচে চলতে হয়েছিল।

তা সেই পরানবাবু একদিন গদাধরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি যেন কে হে! মুখখানা চেনা —চেনা ঠেকছে!"

"আজ্ঞে, আমি গদাধর লস্কর। চেনা না ঠেকে উপায় কী বলুন! এই গাঁয়েই জন্ম—কর্ম, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আপনার বাড়ির বাগান পরিষ্কার করতে কতবার গেছি, মনে নেই? পথেঘাটে হরদম দেখাও হচ্ছে।"

খুবই অবাক হয়ে পরানবাবু বললেন, "বটে! তা তুমি করো কী হে বাপু?"

"আজ্ঞে, এই একটু চাষবাস আছে। তিন বিঘে জমিতে সামান্যই হয়।"

নাক কুঁচকে পরানবাবু বললেন, "এঃ, মোটে তিন বিঘে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, ও বেচে দাও।"

"বলেন কী বাবু! বেচলে খাব কী?"

ভারি বিরক্ত হয়ে ভ্রু কুঁচকে পরানবাবু বললেন, "খাবে? কত খাবে হে হলধর? খেয়ে শেষ করতে পারবে ভেবেছ! হুঃ, খাবে!"

কথাটা অনেকের কানে গেল। গাঁয়ের মুরুব্বিরা বললেন, "ওরে গদাধর, পরান হল বাকসিদ্ধাই। যা বলে, তাই ফলে! ভালোয় ভালোয় জমিজমা বেচে দে বাবা।"

শুনে ভারি দমে গেল গদাধর। শুধু একটা খ্যাপাটে লোকের কথা শুনে এরকম কাজ করাটা কি ঠিক হবে? জমি সামান্য হোক, বছর বছর সামান্য যে ফসলটুকু দেয়, জমি বেচলে যে তাও জুটবে না।

তার বউ ময়না ভারি ধর্মভীরু মেয়ে। ঘরে লক্ষ্মীর পট বসিয়েছে, ষষ্ঠী, শিবরাত্রি ব্রত—উপবাস সব করে। সেও শুনে বলল, "পরানবাবু কিন্তু সোজা লোক নয়। যা বলে তাই হয়।"

এসব শুনে ভারি ধন্দে পড়ে গেল গদাধর। তার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি নেই, দূরদর্শিতা নেই, জমি চাষ করা ছাড়া আর কোনো কাজও সে পারে না। একটা পাগল লোকের কথায় ঝুঁকি নেওয়াটা ভারি আহাম্মকি হয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু গাঁয়ের পাঁচজনের তাড়নায় আর বউ ময়নার তাগাদায় অবশেষে সে জমি বেচে এক পোঁটলা টাকা পেল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। এই ক'টা টাকা কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরোবে। তারপর কী যে হবে! ভেবে বুক শুকিয়ে গেল তার।

বিপদ কখনও একা আসে না। জমিবেচা কয়েক হাজার টাকা বালিশের নিচে রেখে রাতে ঘুমিয়ে ছিল গদাধর। খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ, ঘুমটা বটে একটু গাঢ়ই হয় তার। কিচ্ছু টের পায়নি। সকালে উঠে বালিশ উলটে দেখল, তলাটা ফাঁকা। দরজার খিলও ভাঙা।

ফের মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল সে।

থানা—পুলিশ করে কোনো লাভ নেই। থানা পাঁচ মাইল দূর। তার মতো চাষাভুষো থানায় এত্তেলা দিলে কেউ পুঁছবেও না। তার কাছে টাকাটা অনেক বটে, কিন্তু পুলিশ শুনে নাক সিঁটকোবে।

ময়নারও মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মোলায়েম গলায় বলল, "ভেঙে পড়ার কী আছে! আমার লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে দু দিন তো চলুক।"

নুন—ভাত, শাক—ভাত খেয়ে ক'টা দিন কাটল বটে, কিন্তু তারপর আর চলছে না।

ময়না বলল, "চলো, অন্য গাঁয়ে যাই। দরকার হলে তুমি মুনিশ খাটবে। আমি লোকের বাড়িতে কাজ করব। এ গাঁয়ে ওসব করলে তো বদনাম হবে।"

"বাপ—পিতেমোর গাঁ ছেড়ে যাব?"

"তবে কি মরবে নাকি?"

কাহিল গলায় গদাধর বলল, "তাই চলো।"

পাছে কেউ দেখতে পায়, সেই ভয়ে সন্ধের পর দু'টি পোঁটলা নিয়ে দু'জন গাঁ ছেড়ে রওনা হল।

গাঁ ছেড়ে বেরোতে না—বেরোতেই প্রচণ্ড কালবোশেখির ঝড় ধেয়ে এল। আকাশে ঘন বিদ্যুতের চমক, বাজ পড়ার পিলে চমকানো আওয়াজ আর তুমুল হাওয়া। দু'জনে হাত ধরাধরি করে পড়ি কি মরি ছুটতে লাগল। অন্ধকারে পথের মোটে হদিশই পেল না। শুধু টের পাচ্ছিল, হাওয়া তাদের প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঝোপ, জঙ্গল, মাঠঘাট পেরিয়ে তারা দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে। বৃষ্টির তোড়ে তাদের জামাকাপড়, পোঁটলাপুঁটলি ভিজে জবজব করছে। দমসম হয়ে যাচ্ছে তারা। বাতাসের শব্দে আর বাজের আওয়াজে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। হাঁ করলেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

কালবোশেখির নিয়ম হল, সে বেশিক্ষণ থাকে না। আধঘণ্টা পরে ঝড় থামল, বৃষ্টি কমল। কিন্তু চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কোথাও কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না।

দু'জনে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গদাধর বলল, "এ কোথায় এলুম!"

ময়না বলল, "কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার ভয় করছে।"

জমিজমা আর টাকাপয়সা সব হাতছাড়া হওয়ায় গদাধরের আর ভয়ডর নেই। সে ময়নার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, "আর ভয়টা কীসের?"

ময়না বলল, "চলো, ফিরে যাই।"

গদাধর একটা শ্বাস ফেলে বলল, "ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? এ কোন জায়গায় এসে পড়লুম তাই বা কে জানে? পথঘাট আন্দাজ করা কি সোজা? ঝড়ের ধাক্কায় অনেকটা এসে পড়েছি। চলো, দেখি একখানা গ্রামট্রাম পাওয়া যায় কি না!"

অন্ধকারে ঝোপজঙ্গল ভেঙে তারা ধীরে—ধীরে এগোতে লাগল। গ্রাম বা লোকবসতি পেলেই যে আশ্রয় মিলবে এমন ভরসা নেই। উটকো লোককে কেই—বা আদর করে ঘরে জায়গা দেয়? আজকাল যা চোর ডকাতের উপদ্রব!

একটা জঙ্গলমতো জায়গা পেরোতেই সামনে একটা আলো দেখতে পেল গদাধর। বলল, "ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে! চলো, দেখা যাক, মাথা গোঁজার জায়গা মেলে কিনা!"

সামনে এগিয়ে একখানা মাঠকোঠা দেখা গেল বটে, তবে তার বেশ দৈন্যদশা। সামনের ঘরে একখানা হ্যারিকেন জ্বলছে। বন্ধ দরজায় খুটখুট শব্দ করে গদাধর ভারি বিনয়ের গলায় বলল, "আমরা বড় দুঃখী মানুষ। মশাই, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যাবে?"

ভিতর থেকে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল, "ভিতরে এসো, দরজা ভেজানো আছে।"

দু'জনে ভারি জড়সড়, ভয়ে—ভয়ে ভিতরে ঢুকল। ঘরের কোণে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, সামনে একটা তক্তপোশ, তাতে গোটানো বিছানা, কয়েকটা বাক্স—প্যাঁটরা, কিছু হাঁড়িকুড়ি। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

গদাধর গলাখাঁকারি দিয়ে ভারি নরম সুরে বলল, "আজ্ঞে, অপরাধ নেবেন না। উৎপাত করতেই এসেছি বলতে পারেন। তবে বিপদে পড়েই আসা। আমরা বড় দুর্দশায় পড়েছি কিনা!"

কে যেন ভরাট গলায় বলে উঠল, "দুর্দশার তো কিছু দেখছি না হে! কে বলল দুর্দশায় পড়েছ? একটু হাওয়া ছেড়েছিল আর দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে, এই তো! তা চাষিবাসীকে তো ঝড়ে—জলে কতই কাজ করতে হয়।"

"তা বটে," বলে গদাধর হাত কচলাতে—কচলাতে বলল, "যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দেন তো দাওয়াতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেব'খন।"

"দাওয়ায়! দাওয়ায় কেন হে? দিব্যি ঘরদোর রয়েছে, দাওয়ায় থাকবে কোন দুঃখে? ভিতরের ঘরে যাও, শুকনো কাপড়টাপড় পাবে। পরে নাও গে। উনুনে আঁচ দেওয়া আছে, খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।"

ময়না ফিসফিস করে বলল, "গলা পাচ্ছি বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন বলো তো!"

গদাধরও ভড়কে গিয়ে বলল, "তাই তো!"

ময়না বলল, "জিজ্ঞেস করো না!"

গদাধর ফের হাত কচলে বলল, "আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন আজ্ঞে? সামনে এলে একটু পদধূলি নিতুম।"

"ও বাবা, পদধূলি বড় কঠিন জিনিস। খুঁটির গায়ে একটা হাত—আয়না ঝুলছে দেখতে পাচ্ছ?"

গদাধর ইতিউতি তাকিয়ে দেখল, ভিতরের দরজার পাশে কাঠের খুঁটিতে একটা ছোট্ট হাত—আয়না ঝুলছে বটে।

"আয়নাখানা পেড়ে ওর ভিতরে তাকাও।"

গদাধর অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে আয়নাটা পেড়ে তুলে ধরতেই এমন আঁতকে উঠল যে, একটু হলেই সেটা পড়ে যেত হাত থেকে। আয়নার ভিতরে একখানা সুড়ুঙ্গে লম্বা মুখ। গোঁফ আছে। জুলজুলে চোখ। মাথায় বাবরি চুল। ভয়ের কথা হল, সে মুখের ঠোঁট নড়ছে আর কথা বেরিয়ে আসছে।

দু'জনেরই ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। আয়নার লোকটা বলল, "ওরে বাপ, আগে তো প্রাণ রক্ষে হোক, তারপর দাঁতকপাটি লেগে পড়ে থাকলে থেকো।"

ময়না আর গদাধর কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ময়নাই প্রথম কথা কয়ে উঠল, "আমরা বড্ড ভয় পাচ্ছি যে!"

"বলি ভয়টা কীসের অ্যাঁ। এই জন্যই বলে লোকের উপকার করতে যাওয়াটাই আহাম্মকি।"

গদাধর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, "না না, ওর ওপর কুপিত হবেন না, আমরা না হয় ভয়ডর সব গিলে ফেলছি।"

"ভালো। টপ করে ওসব ফালতু জিনিস গিলে পেটে চালান করে দাও। দিয়েছ?"

ময়না আর গদাধর ঘনঘন ঢোক গিলে যেন একটু সামলে নিল। গদাধর বলল, "নাঃ, এখন আর তেমন বুক ঢিবঢিব করছে না। তোমার করছে ময়না?"

"নাঃ। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, এই যা!"

আয়নার লোকটা বলল, "ওতেই হবে। এখন গিয়ে রান্নার জোগাড়যন্তর করে ফ্যালো।"

গদাধর আমতা—আমতা করে বলল, "ফস করে অন্দরমহলে ঢুকব? কেউ যদি কিছু বলে?"

লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, "বলার মতো আছেটা কে হে? এই আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর জনমনিষ্যি নেই। যাও যাও, ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া ধরে ফেলবে।"

কথা না বাড়িয়ে তারা ভিতরের ঘরে এসে দেখল, দিব্যি ব্যবস্থা। আলনায় কয়েকখানা পাটভাঙা ডুরে শাড়ি, দু'টো ধোয়া ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ রয়েছে।

কুয়ো থেকে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে, ভেজা কাপড় বদল করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, উনুনে আঁচ উঠে গেছে। চালডাল খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল। আলু, লঙ্কা, ফোড়ন, তেল সবই অল্পস্বল্প রয়েছে।

ময়না বলল, "হ্যাঁ গা, আয়নার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাদের সঙ্গে খাবেন কিনা।"

গদাধর গিয়ে আয়নাটা নিয়ে এল, তারপর সুড়ুঙ্গে মুখখানার দিকে চেয়ে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "আজ্ঞে, আপনি পেরসাদ করে না দিলে কোন মুখে খিচুড়ি খাব বলুন। ময়নার বড় ইচ্ছে আপনাকেও একটু ভোগ চড়ায়।"

"না হে বাপু, ওসব আমার সহ্য হয় না। আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমরা খাও।"

কী আর করা, অন্যের বাড়িতে ঢুকে এরকম রেঁধেবেড়ে খাচ্ছে বলে ভারি সংকোচ হচ্ছে তাদের। তবে খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তারা লজ্জার সঙ্গেই পেটপুরে খেয়ে নিল।

তারপর দুজনে ক্লান্ত শরীরে আর ভরা পেটে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর গদাধরের মনে হল, গতকাল ঝড়ে—বৃষ্টিতে পড়ে তার মাথাটাই গুলিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় একটা আজগুবি স্বপ্ন দেখেছে। ময়নাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করতে ময়না বলল, "দুজনে কি একই স্বপ্ন দেখতে পারে?"

"তা হলে ব্যাপারটা কী?"

"তার আমি কী জানি!"

বাইরে কে যেন "কে আছ হে! কে আছ?" বলে চেঁচাচ্ছিল। গদাধর তাড়াতাড়ি উঠে সদর দরজা খুলে দেখল, নাদুসনুদুস একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দড়িতে বাঁধা দু'টো হালের বলদ, একটা দুধেল গাই, আর —একটা হাল।

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, ''এই নাও ভাই, ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত হাল—গোরু সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আর এই নাও, এক বছরের হাল—গোরুর ভাড়া আর দুধ বাবদ দাম। সাতশো টাকা আছে।''

গদাধর জিভ কেটে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ''না না, ছিঃ—ছিঃ, এসব আমার পাওনা নয়। আমাকে কেন দিচ্ছেন?''

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''না দিলে কি রেহাই আছে হে! ষষ্ঠীপদ ঘাড় মটকাবে। বুঝে নাও ভাই, কাল রাতেই ষষ্ঠীপদ হুকুম দিয়ে গেছে।''

''আজ্ঞে, ষষ্ঠীপদ কে বটেন?''

''কেন, পরিচয় হয়নি নাকি? বলি, সে এখন আয়নার মধ্যে ঢুকেছে বলে তো আর গায়েব হয়ে যায়নি। তার দাপটে এখনও সবাই থরহরি কাঁপে। ওই পুবে খালধারের জমিটা তোমার। দশ বিঘে আছে।''

কিছুই বুঝতে পারল না গদাধর। লোকটা চলে যাওয়ার পর গোরু আর বলদদের নিয়ে গোয়ালে বেঁধে টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে সে গিয়ে আয়নাটা পেড়ে আনল। কিন্তু দিনমানে আয়নায় আর সেই সুড়ুঙ্গে মুখখানা দেখা গেল না। নিজের বোকা—বোকা হতভম্ব মুখখানাই দেখতে পেল সে।

এর পর আর—একজন রোগাপানা লোক এসে হাজির সঙ্গে মুটের মাথায় দু'টো ভরা বস্তা।

''এই যে ভায়া, আমি হচ্ছি শ্যামাপদ মুদি। দু'বস্তা চাল দিয়ে গেলুম। ষষ্ঠীপদর হুকুম তো, আর অমান্যি করতে পারি না। এই দু'বস্তাই পাওনা ছিল তোমাদের। আর এই হাজারটা টাকা।''

গদাধর কথা কইতে পারছে না। কেবল ঢোক গিলছে। জিভ, টাগরা সব শুকনো।

একটু বেলার দিকে একজন বউমানুষ এসে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা ময়নার কাছে হাজির। একটা পোঁটলা খুলে কিছু সোনার গয়না বের করে বলল, ''নাও বাপু। তোমার জিনিস বুঝে নাও। মোট আট গাছা সোনার চুড়ি, বাঁধানো নোয়া, বিছেহার, এক জোড়া বালা আর ঝুমকো দুল।''

ময়না অবাক হয়ে বলল, ''এসব আমার হবে কেন?''

''তা জানি না, ষষ্ঠীপদ গচ্ছিত রেখেছিল। এখন হুকুম হয়েছে, তাই দিয়ে যাচ্ছি।''

''কিন্তু আমি তো ষষ্ঠীপদবাবুকে চিনিই না।''

''চিনবে বাপু, এ গাঁয়ে থাকলে তাকে না চিনে উপায় আছে? তা তোমাদের কপাল ভালো যে, তার নেকনজরে পড়েছ। তার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থাকি কিনা!''

সারাদিনে আরও অনেকে এসে অনেক জিনিস দিয়ে গল। কেউ দা আর কুড়ুল, কেউ শীতলপাটি, কেউ কুয়োর বালতি আর কাঁটা, কেউ কাঠের টুল, কেউ বাসনকোসন বা কড়াই আর হাতা, এমনকী একগাছা ঝাঁটা অবধি। সবই নাকি ষষ্ঠীপদর গচ্ছিত রাখা জিনিস।

গদাধর আর ময়নার দিশেহারা অবস্থা। গরিব হলেও তারা লোভী লোক নয়। এসব জিনিস তাদের ঘরে ছিল না। তার ওপর ষষ্ঠীপদর রহস্যটাও তাদের মাথায় সেঁধোচ্ছে না।

খুব ভাবনাচিন্তার মধ্যেই দিনটা কাটল তাদের। সন্ধে হতেই হঠাৎ সেই বাজখাঁই গলা, ''সব জিনিস ফেরত দিয়ে গেছে তো?''

গদাধর তাড়াতাড়ি আয়নাটা পেড়ে দেখল, সেই সুড়ুঙ্গে মুখ। কাঁপা গলায় বলল, ''এসব কী হচ্ছে বলুন তো মশাই? আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না।''

লোকটা ধমক দিয়ে বলল, ''বেশি বুঝবার দরকার কী তোমার? কাল থেকে তেঁতুলতলার জমিতে হাল দিতে শুরু করো।''

''আমরা কি তবে এখানেই থাকব?''

''তবে যাবে কোন চুলোয়?''

ময়না পিছন থেকে ফিসফিস করে বলল, ''ওগো রাজি হয়ে যাও।''

গদাধর গদগদ হয়ে বলল, ''যে আজ্ঞে!''

কালাচাঁদের দোকান

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে—সেখানে বদলি হয়ে যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন—তখন যেখানে—সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ—স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, "আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসা ভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাপু!"

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, "তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?"

গিন্নি বললেন, "ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এর পর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।"

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, "একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।"

বাক্স—প্যাঁটরা গুছিয়ে সপরিবার এক শীতের সন্ধেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পথ পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা—ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালোও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাঁইনাড়া হতে হবে না। ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে, এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, "কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর! অসুখ হলে ডাক্তার—বদ্যি পাওয়া যাবে কি না খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?"

নবীনবাবু বললেন, "বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দু'দিন হাট।"

তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?"

"ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে!"

''জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।''

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ''কী আর করা! নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে।''

প্রথমদিন বাজার করতে দু' ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারীদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালোও নয়। পাওয়া যায় না সব কিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, ''আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ—জায়গায় মানুষ থাকে? মা গো!''

নবীনবাবু ফাঁপড়ে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধেবেলা গিন্নি এসে বললেন, ''ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?''

''দ্যাখো না একটু খুঁজে—পেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।''

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডান হাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গল মতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঠাহর করে দেখলেন, একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপানা কণ্ঠধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, ''আজ্ঞে আসুন।''

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, ''আছে। ভালো ঘানির তেল।''

''কত দাম?''

লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, ''দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ'টাকা করেই দেবেন।''

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু' ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, ''বাঃ, এ তো দারুণ ভালো তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?''

নবীনবাবু বললেন, ''আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড় ভালো।''

লোকটা যে সত্যিই ভালো তার প্রমাণ পাওয়া গেল দু'দিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, ''আপনাকে দাম দিতে হবে না।''

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার নামই তো জানি না এখনও।''

''আজ্ঞে কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।''

''আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?''

''যে আজ্ঞে। তবে সন্ধের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও—সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।''

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, ''ও গো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলেমেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?''

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনোমনো করে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরম মশলা।"

"দাম?"

"দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।"

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখ—দুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, "ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ো তো! দরকার মতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁ গো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাস বাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায়—কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, বলল, "সাত জন্মে কালাচাঁদের দোকানের কথা শুনিনি।"

"হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলব'খন।"

দু'দিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, "তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের পুরনো?"

কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, "তা কম হবে না। ধরুন, এ—গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।"

নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরনোই হবে তা হলে দাস—গিন্নি এ—দোকানের কথা শোনেনি কেন?

কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, "এ—গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

পরদিন নবীনবাবু এক বাড়িতে নারায়ণ পুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, "হ্যাঁ গা, তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়ন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল, 'নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে।"

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, "কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।"

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু এ—কথা সে—কথার পর কালাচাঁদকে বললেন, "তা কালাচাঁদবাবু, আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।"

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।"

"ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ—দোকানের কথা জানে না।"

কালাচাঁদ তেমনই মৃদু—মৃদু হেসে বলে, "জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরদুর করে উঠল। বললেন, "হ্যাঁ, তা আমি তো আমিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো খদ্দের কখনও দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?"

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, "একজনের জন্যই তো দোকান।'

"অ্যাঁ!"

কালাচাঁদ হাসল, "আসবেন।"

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন নয়?"

"পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।"

"তাড়া কীসের?"

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, "না না, অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দু'দিন পর হলেও চলবে। বসুন, একটু সুখ—দুঃখের কথা কই। টাকা—পয়সার কথা থাক।"

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন! পাঁচ টাকা পাওনা! বলে কী লোকটা? তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনিহারি জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাক সবজিও ক্রমে—ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ মাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকেরও ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, "ওগো নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।"

"দিয়ো না। হ্যাঁ গো, কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো! আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?"

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, "না না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কি সব সয়?"

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

নফরগঞ্জের রাস্তা

ওমশাই, নফরগঞ্জে যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিকে বলতে পারেন? নফরগঞ্জে যাবেন বুঝি? তা আর বেশি কথা কী! গেলেই হয়। বেশি দূরের রাস্তাও নয়। নফরগঞ্জে একরকম পৌঁছে গেছেন বলেই ধরে নিন।

বাঁচালেন মশাই, স্টেশন থেকে এই রোদ্দুরে মাইল পাঁচেক ঠ্যাঙাচ্ছি। তিন তিনটে গাঁ পেরিয়ে এলুম, এখনও নফরগঞ্জের টিকিটিও দেখতে পাইনি।

আহা, বড্ড হয়রান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে! এই দাওয়াতেই বসে জিরিয়ে নিন কিছুক্ষণ। বেলা মোটে বারোটা বাজে। চিন্তা নেই।

তা না হয় বসছি। তা নফরগঞ্জ এখান থেকে কতটা দূর বলতে পারেন?

অত উতলা হচ্ছেন কেন? এই মানিকপুর গাঁকে তো অনেকে নফরগঞ্জের চৌকাঠ বলেই মনে করে। তা নফরগঞ্জে কার বাড়িতে যাবেন মশাই?

সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। গলাটাও শুকিয়ে এসেছে কিনা। তা একটু জল পাওয়া যাবে?

বলেন কী! মানিকপুরে জল পাওয়া যাবে না মানে? মানিকপুরে জল যে অতি বিখ্যাত। এখানকার জলে কলেরা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ, আমাশয়, বেরিবেরি সব সারে। এই যে ঘটিভরা জল, ঢক ঢক করে মেরে দিয়ে দেখেন দিকি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শরীরের বল ফিরে আসে কিনা।

বাঁচালেন মশাই, তেষ্টায় বুকটা কাঠ হয়ে আছে।

কেমন বুঝলেন জল খেয়ে?

দিব্যি জল, হুবহু জলের মতোই।

জলের মতো লাগলেও ও আসলে হল জলের বাবা। একবার পেটে সেঁধোলে আর উপায় নেই। লোহা খেলে লোহাও হজম হয়ে যাবে। রোগ—বালাই পালাই—পালাই করে পালাবে। হাতির বল এসে যাবে শরীরে।

তাই হবে বোধহয়। জল খেয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছে। এবার তাহলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই রওনা দিতে পারি।

আহা, সে হবে'খন। নফরগঞ্জ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তা কার বাড়ি যাবেন যেন?

কুঞ্জবিহারী দাস মশাইয়ের নাম শোনা আছে কি?

কুঞ্জবিহারী? তা কুঞ্জবিহারী কি আপনার কেউ হয়? শালা বা ভগ্নীপোত বা ভায়রাভাই গোছের?

না মশাই না, কুঞ্জবিহারীকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে।

তা ভালো, তবে কিনা ভেবেচিন্তে যাওয়া আরও ভালো।

কেন মশাই, ভেবেচিন্তে যাওয়ার কি আছে? মানুষের বাড়িতে কি মানুষ যায় না? তার ওপর মাথায় একটা দায়িত্ব নিয়েই যেতে হচ্ছে।

সেটা বুঝতে পারছি। প্রাণের দায় না হলে কি কেউ সাধ করে নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারীর ডেরায় গিয়ে সেঁধোবার সাহস করে?

আপনি কি বলতে চাইছেন যে কুঞ্জবিহারী খুব একটা সুবিধের লোক নন!

সে কথা আবার কখন বললুম? না মশাই, আমি বড্ড পেট—পাতলা মানুষ। মনের ভাব চেপে রাখতে পারিনে। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, ওসব ধরবেন না।

বলেই যখন ফেলেছেন তখন ঝেড়ে কেশে ফেললেই তো হয়। অসোয়াস্তি কমে যাবে।

আসলে কী জানেন কুঞ্জবিহারী বোধহয় খুবই ভালো লোক। তবে নিন্দুকেরা নানা কথা রটায় আর কী!

না মশাই, আপনি চেপে যাচ্ছেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে, আমার ভাইঝির সঙ্গে কুঞ্জবিহারীর ছেলে বিপ্লববিহারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতেই আসা।

বিপ্লববিহারী ওরে বাবা!

অমন আঁৎকে উঠলেন কেন মশাই! বিপ্লববিহারী কি ছেলে ভালো নয়? শুনেছি সে ভালো লেখাপড়া জানে। এম এস সি পাশ করে আরও কী সব পড়াশুনা করেছে! চাকরিও করে ভালো।

তা হবে। কত কিছুই তো শোনা যায়।

নাঃ, বড্ড মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। ভাবগতিক তো মোটেই ভালো বুঝছি না। দাদাকে বারবার বললুম, ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ অত দূরে কোরো না। কিন্তু দাদা কি আর শোনার পাত্র? বেশ ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি। ও মশাই, একটু খুলে বলুন না, এখানে বিয়ে হলে আমার ভাইঝিটা কি জলে পড়বে?

ভাইঝি তো আপনার। তাকে জলে ফেলুন, ডাঙায় ফেলুন সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমি আর কথাটি কইছি না।

তা হলে আর কী করা! যাই, নিজের চোখে অবস্থাটা একটু দেখেই আসি।

আহা অত তাড়া কীসের? দুটো মিনিট বসেই যান। আমার মেয়েকে বলেছি, শসা দিয়ে দুটি মুড়ি মেখে দিতে। দুপুরবেলায় গেরস্থ বাড়িতে শুধু মুখে চলে গেলে যে অকল্যাণ হয়। ডাব পাড়তে গাছে লোক উঠেছে। এল বলে। ডাব খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করুন।

না মশাই, না। দুপুর গড়িয়ে গেলে চলবে না। সেখানে যে আমার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন।

দেরি কীসের। সবে তো বারোটা। পথও বেশি নয়। কথা আছে।

আজ্ঞে, কথাই তো শুনতে চাইছি।

নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারী দাস সম্পর্কে জানতে চাইলে এ তল্লাটের গাছপালা, গরুবাছুরকে জিগ্যেস করলেও মেলা খবর পেয়ে যেতেন। এই দশ বারো বছর আগেও কুঞ্জগুণ্ডা দিনে তিনটে খুন না করে জলস্পর্শ করত না। প্রতি রাতে অন্তত গোটা দুই বাড়িতে ডাকাতি না করলে তার ঘুম হত না। আর রাহাজানি, তোলা আদায় কোন গুণটা না ছিল তার। তবে এখন বয়স হওয়াতে রোখ কিন্তু কমেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়লে আর বিশেষ লাশটাশ ফেলে না। তবে তার জায়গা এখন নিয়েছে ওই তার ছেলে বিপ্লববিহারী। তফাত হচ্ছে। বাপ মানুষ মারত দা কুড়ুল দিয়ে, ছেলে মারে বন্দুক পিস্তল দিয়ে।

বলেন কী মশাই! দাদা যে বলল, কুঞ্জবিহারী রীতিমতো ফোঁটা কাটা বৈষ্ণব। ভারি নিরীহ মানুষ। তার ছেলেটিও নাকি ভারি বিনয়ী। আর খুবই সভ্যভব্য।

হাসালেন মশাই, আপনার দাদার চোখে নিশ্চয়ই চালসে ধরেছে। এই যে আপনার মুড়ি আর ডাব এসে গেছে। রোদে তেতে পুড়ে এসেছেন, একটু খিদে তেষ্টা মিটিয়ে নেন তো?

আর খিদে তেষ্টা। আপনার কথা শুনে খিদে তেষ্টা তো আমার মাথায় উঠেছে।

আহা, তা বললে কি আর চলে? তা ভাইজির বিয়ে দেওয়ার জন্য কি আর পাত্র জুটল না?

সেইটেই তো ভাবছি। দাদার তো দেখছি, কাণ্ডজ্ঞানই নেই।

তা কুঞ্জগুন্ডা তার ছেলের বিয়েতে কত পণ নিচ্ছে? দু—চার লাখ টাকা হবে, না?

না মশাই, সেরকম তো কিছু শুনিনি। বরং দাদা একবার কথা তোলায় নাকি কুঞ্জবিহারী তার দু—হাত ধরে কেঁদে ফেলে আর কী! লোকটা নাকি বলেছে, তাদের বংশেই পণ নেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই।

হুঁঃ! আপনিও বিশ্বাস করলেন সে কথা। আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে না নিলেও গোপনে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে ঠিকই। ধরে রাখুন, তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা হবেই।

কিন্তু দানসামগ্রী দিতেও যে বারণ করেছে। বলেছে, দানসামগ্রী আবার কীসের? আমার ছেলে যদি তার বউকে প্রয়োজনের জিনিস কিনে দিতে না পারে তবে আর তাকে যোগ্যপাত্র বলে ধরা যায় না।

হেঃ হেঃ, কথার মারপ্যাঁচ মশাই, কথার মারপ্যাঁচ। এখন ওসব বললে কি হয়। বিয়ের পর দেখবেন নানা ছুতোয় হরেক রকম ফিকির করে ঘাড়ে ধরে আদায় করবে।

আপনি তো আমাকে টেনশনে ফেলে দিলেন মশাই। এখন এই বিয়ে কী করে ভাঙা যায় তাই ভাবছি। কথা একরকম পাকা হয়েই আছে। আজ দিন ঠিক করে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার। পুরুতমশাই অপেক্ষা করছেন। বড় মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

বিয়ে ভেঙে দেওয়াই ঠিক করে ফেললেন বুঝি!

তা ছাড়া আর উপায় কী বলুন।

আহা, শুনে বড় স্বস্তি পাচ্ছি। মেয়েটা বেঁচে গেল। তাহলে বরং আজ আর আপনার নফরগঞ্জে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ির পিছনে টলটলে পুকুরের জলে স্নান করে নিন, তেল গামছা সাবান সব আসছে ভিতরবাড়ি থেকে। তারপর দুপুরে দুটি ডাল—ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হবেন'খন। পাবদা মাছের ঝাল, সরপুঁটির সর্ষে ভাপা, রুই মাছের কালিয়া, ঝিঙে পোস্ত, সোনা মুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, চাটনি আর পায়েস হয়েছে। এতে হয়তো আপনার একটু কষ্টই হবে। তবু গরিবের বাড়িতে দুটি অন্নগ্রহণ না করলে ছাড়ছি না মশাই।

বাপ রে! বলেন কী? এত দূর এসে যদি ফিরে যাই তাহলে দাদা কি আর আমাকে আস্ত রাখবে। বিয়ে ভাঙতে হলে কুঞ্জবাবুর মুখের ওপরেই কথাটা কয়ে আসতে হবে। তাতে প্রাণ গেলেও কিছু নয়। আর ভোজ খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও আমার নয়। আমাকে এখনই রওনা হতে হচ্ছে।

বলছিলাম কী, উত্তেজিত না হয়ে আর একটু বসুন। বলছিলাম কী, বিয়েটা একেবারে ভেঙে দেওয়ার আগে একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবাও তো দরকার। হুট বলে বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাও ঠিক হবে না।

বলেন কী মশাই! এর পরও এই বিয়ে কেউ দেয়?

সেটা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা কুঞ্জবিহারী বা বিপ্লববিহারীর বদনাম থাকলেও তাদের সংসারে কিন্তু অশান্তি নেই। কুঞ্জগুণ্ডার বউ কুসুম তো ভারি লক্ষ্মীমন্ত মহিলা। পুজোপাঠ, ব্রাহ্মণসেবা, দানধ্যান, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মেলা গুণ রয়েছে।

অ্যাঁ! এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘ।

যে আজ্ঞে! বিয়ে হলে আপনার ভাইজি দুঃখে থাকবে না। কারণ, বিপ্লববিহারী বাইরে যেমনই হোক, আসলে ছেলে তেমন খারাপ নয়। ষণ্ডা হলেও সে ফিজিক্সে এম এস সি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তার ওপর এম বিএ। স্বভাবও ভারি ভালো। ভারি বিনয়ী, ভারি ভদ্রলোক।

এ যে উলটো গাইছেন মশাই।

আহা যার যা গুণ তা তো বলতেই হবে। আর কুঞ্জবিহারীও ষণ্ডাগুন্ডা বটে, কিন্তু বৈষ্ণবও বটে। রোজ গেঁড়িমাটি দিয়ে রসকলি কাটে। ভিখিরিদের খাওয়ায়, জীবসেবা করে। গুণ কিছু কম নেই।

এ তো ফের উলটো চাপ মশাই।

উলটো চাপ নয় মশাই, মানুষের দোষের কথা শুধু বললেই তো হবে না। তার গুণের দিকটাও তো দেখা দরকার।

কুঞ্জগুন্ডার আরও গুণ আছে নাকি?

তা আর নেই। জীবনে কখনও এক পয়সা কাউকে ঠকায়নি। একটি কালো টাকাও তার তহবিলে নেই। গরিব দুঃখীর জন্য প্রাণ দিয়ে করেন। গাঁয়ে চারখানা পুকুর কাটিয়েছেন, অনাথ আশ্রম খুলেছেন, স্বর্গত বাপের নামে অন্নসত্র দিয়েছেন, দুটো ইস্কুল তাঁর পয়সায় চলে। দানধ্যানের লেখাজোখা নেই মশাই।

তাহলে যে বলছিলেন লোক খুব খারাপ। খুন—টুন করেন।

আজ্ঞে তাও করে থাকতে পারেন। তবে কিনা খুনগুলো প্রমাণ হয়নি। অন্তত পুলিশের কাছে কোথাও রেকর্ড নেই। কেউ কেউ বলে আর কী।

না মশাই, আমার মাথা ঘুরছে। এবার রওনা না হলেই নয়।

আহা ব্যস্ত হবেন না। কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। স্বয়ং কুঞ্জবিহারীই এসে ভিতর বাড়িতে বসে আছেন।

এসব কী বলছেন। কুঞ্জবিহারী এখানে এসে বসে আছেন, এর মানে কী?

আজ্ঞে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

কী রকম?

এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর নয়।

তাহলে?

আপনি আতাগঞ্জ পেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে ফেলায় একটু ঘুরপথে ঝালাপুর হয়ে সোজা নফরগঞ্জেই এসে পড়েছেন যে। সোজা মানিকপুর হয়ে এলে রাস্তা দু—মাইল কম পড়ত।

তাহলে এ বাড়ি—?

আজ্ঞে এটাই কুঞ্জবিহারী দাসের বাড়ি। আমি হলুম গে তাঁর ভায়রাভাই নবকুমার হাজরা।

অ। তাই বলুন।

কৌটোর ভূত

জয়তিলকবাবু যখনই আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আসতেন তখনই আমরা, অর্থাৎ ছোটরা ভারি খুশিয়াল হয়ে উঠতুম।

তখনকার, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছর আগের পূর্ববঙ্গের গাঁ—গঞ্জ ছিল আলাদা রকম, মাঠ—ঘাট, খাল—বিল, বন—জঙ্গল মিলে এক আদিম আরণ্যক পৃথিবী। সাপখোপ জন্তু—জানোয়ার তো ছিলই, ভূত—প্রেতেরও অভাব ছিল না। আর ছিল নির্জনতা।

তবে আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারে মেলা লোকজন, মেলা কাচ্চাবাচ্চা। মেয়ের সংখ্যাই অবশ্য বেশি। কারণ বাড়ির পুরুষরা বেশির ভাগই শহরে চাকরি করত, আসত কালেভদ্রে। বাড়ি সামাল দিত দাদু—টাদু গোছের বয়স্করা। বাবা—কাকা—দাদাদের সঙ্গে বলতে কি আমাদের ভালো পরিচয়ই ছিল না, তাঁরা প্রবাসে থাকার দরুন।

বাচ্চারা মিলে আমরা বেশ হই—হুল্লোড়বাজিতে সময় কাটিয়ে দিতাম। তখন পড়াশুনার চাপ ছিল না। ভয়াবহ কোনো শাসন ছিল না। যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু অভাব ছিল একটা জিনিসের। আমাদের কেউ যথেষ্ট পাত্তা বা মূল্য দিত না।

জয়তিলকবাবু দিতেন, আত্মীয় নন, মাঝে মধ্যে এসে হাজির হতেন। কয়েকদিন থেকে আবার কোথায় যেন উধাও হতেন। কিন্তু যে কয়েকটা দিন থাকতেন বাচ্চাদের গল্পে আর নানারকম মজার খেলায় মাতিয়ে রাখতেন।

মাথায় টাক, গায়ের রং কালো, বেঁটে, আঁটো গড়ন আর পাকা গোঁফ ছিল তাঁর। ধুতি আর ফতুয়া ছিল বারোমেসে পোশাক, শীতে একটা মোটা চাদর। সর্বদাই একটা বড় বোঁচকা থাকত সঙ্গে। শুনতাম তাঁর ফলাও কারবার। তিনি নাকি সবকিছু কেনেন এবং বেচেন। যা পান তাই কেনেন, যাকে পান তাকেই বেচেন। কোনো বাছাবাছি নেই।

সেবার মাঘমাসের এক সকালে আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। এসেই দাদুকে বললেন, গাঙ্গুলিমশাই, এবার কিছু ভূত কিনে ফেললাম।

দাদু কানে কম শুনতেন, মাথা নেড়ে বললেন, খুব ভালো। এবার বেচে দাও।

জয়তিলক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, সেটাই তো সমস্যা। ভূত কেনে কে? খদ্দের দিন না।

—খদ্দর? না বাপু ওসব আমি পরি না, স্বদেশিদের কাছে যাও।

—আহা, খদ্দর নয়, খদ্দের, মানে গ্রাহক।

—গায়ক! না বাপু, গান বাজনা আমার আসে না।

জয়তিলক অগত্যা ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন। তিনি ভূত কিনেছেন শুনে আমাদের চোখ গোল্লা গোল্লা। ঘিরে ধরে 'ভূত দেখাও, ভূত দেখাও' বলে মহা শোরগোল তুলে ফেললুম।

প্রথমে কিছুতেই দেখাতে চান না। শেষে আমরা ঝুলোঝুলি করে তাঁর গোঁফ আর জামা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করায় বললেন, আচছা আচ্ছা, দেখাচ্ছি। কিন্তু সব ঘুমন্ত ভূত, শুকিয়ে রাখা।

সে আবার কী?

আহা, যেমন মাছ শুকিয়ে শুঁটকি হয় বা আম শুকিয়ে আমসি হয় তেমনই আর কী। বহু পুরনো জিনিস।

জয়তিলক তাঁর বোচকা খুলে একটা জংধরা টিনের কৌটো বের করলেন। তারপর খুব সাবধানে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বেশি গোলমাল কোরো না, এক এক করে উঁকি মেরে দেখে নাও। ভূতেরা জেগে গেলেই মুশকিল।

কী দেখলুম তা বলা একটা সমস্যা। মনে হল শুকনো পলতা পাতার মতো চার—পাঁচটা কেলেকুষ্টি জিনিস কৌটোর নিচে পড়ে আছে। কৌটোর ভিতরটা অন্ধকার বলে ভালো বোঝাও গেল না। জয়তিলক টপ করে কৌটোর মুখ এঁটে দিয়ে বললেন, আর না। এসব বিপজ্জনক জিনিস।

বলাবাহুল্য, ভূত দেখে আমরা আদপেই খুশি হইনি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলুম যে, ওগুলো মোটেই ভূত নয়। জয়তিলকবাবুকে ভালোমানুষ পেয়ে কেউ ঠকিয়েছে।

জয়তিলকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না হে, ঠকায়নি। চৌধুরি বাড়ির বহু পুরনো লোক হল গোলোক। সারাজীবন কেবল ভূত নিয়ে কারবার। তার তখন শেষ অবস্থা, মুখে জল দেওয়ার লোক নেই। সেই সময়টায় আমি গিয়ে পড়লাম। সেবা—টেবা করলাম খানিক, কিন্তু তার তখন ডাক এসেছে। মরার আগে আমাকে কৌটোটা দিয়ে বলল, তোমাকে কিছু দিই এমন সাধ্য নেই। তবে কয়েকটা পুরনো ভূত শুকিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে যাও, কাজ হতে পারে। ভূতগুলোর দাম হিসেব করলে অনেক। তা তোমার কাছ থেকে দাম নেবই বা কী করে, আর নিয়ে হবেই বা কী। তুমি বরং আমাকে পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াও। শেষ খাওয়া আমার।

এই বলে জয়তিলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমরা তবু বিশ্বাস করছিলুম না দেখে জয়তিলকবাবু বললেন, মরার সময় মানুষ বড় একটা মিছে কথা বলে না।

তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। কিন্তু সেকথা আর বললুম না তাঁকে।

দুপুরবেলা যখন জয়তিলকবাবু খেয়ে দেয়ে ভুঁড়ি ভাসিয়ে ঘুমোচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে আমি আর বিশু তাঁর ভূতের কৌটো চুরি করলুম। এক দৌড়ে আমবাগানে পৌঁছে কৌটো খুলে ফেললুম। উপুড় করতেই পাঁচটা শুকনো পাতার মতো জিনিস পড়ল মাটিতে। হাতে নিয়ে দেখলুম, খুব হাল্কা। এত হাল্কা যে জিনিসগুলো আছে কি নেই তা বোঝা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মনে হল, এগুলো পাতা—টাতা নয়। অনেকটা ঝুল জাতীয় জিনিস, তবে পাক খাওয়ানো, বেশ ঠান্ডাও।

বিশু বলল, ভূত কিনা তা প্রমাণ হবে যদি ওগুলো জেগে ওঠে।

—তা জাগাবি কী করে?

—আগুনে দিলেই জাগবে। ছ্যাঁকার মতো জিনিস নেই।

আমরা শুকনো পাতা আর ডাল জোগাড় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বেলে ফেললুম। আঁচ উঠতেই প্রথমে একটা ভূতকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলুম।

প্রথমে একটা উৎকট গন্ধ উঠল। তারপর আগুনটা হঠাৎ হাত দেড়েক লাফিয়ে উঠল। একটু কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তারপরই হড়াস করে অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটা কেলে চেহারার বিকট ভূত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দু'খানা কটমট করছে।

ওরে বাবা রে! বলে আমরা দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। পড়ে গিয়ে দেখলুম জ্যান্ত ভূতটা আর চারটে ঘুমন্ত ভূতকে তুলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে।

চোখের পলকে পাঁচ পাঁচটা ভূত বেরিয়ে এল। তারপর হাসতে হাসতে তারা আমবাগানের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঘটনাটির কথা আমরা কাউকেই বলিনি। জয়তিলকবাবুর শূন্য কৌটোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলুম।

সেই রাত্রি থেকে আমাদের বাড়িতে প্রবল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেল।

রান্নাঘরে ভূত, গোয়ালে ভূত, শোয়ার ঘরে ভূত, পুকুরে ভূত, কুয়োপাড়ে ভূত। এই তারা হিঁ হিঁ করে হাসে, এই তারা মাছ চুরি করে খায়। এই ঝি—চাকরদের ভয় দেখায়। সে ভীষণ উপদ্রব। ভূতের দাপটে সকলেই তটস্থ।

জয়তিলকবাবু এইসব কাণ্ড দেখে নিজের কৌটো খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, বললেন, এঃ হেঃ, ভূতগুলো পালিয়েছে তাহলে: ইস, কী দারুণ জাতের ভূত ছিল, বেচলে মেলা টাকা পাওয়া যেত। নাঃ, ভূতগুলোকে ধরতেই হয় দেখছি।

এই বলে জয়তিলকবাবু মাছের জাল নিয়ে বেরোলেন। ভূত দেখলেই জাল ছুড়ে মারেন। কিন্তু জালে ভূত আটকায় না। জয়তিলকবাবু আঠাকাঠি দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু ভূতের গায়ে আঠাও ধরে না। এরপর জাপটে ধরার চেষ্টাও যে না করেছেন তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই ভূতদের ধরা গেল না।

দুঃখিত জয়তিলকবাবু কপাল চাপড়ে আবার শুঁটকি ভূতের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

পাঁচ পাঁচটা ভূত দাপটে আমাদের বাড়িতে রাজত্ব করতে লাগল।

দুই পালোয়ান

পালোয়ান কিশোরী সিং—এর যে ভূতের ভয় আছে তা কাক পক্ষিতেও জানে না। কিশোরী সিং নিজেও যে খুব ভালো জানত এমন নয়।

আসলে কিশোরী ছেলেবেলা থেকেই বিখ্যাত লোক। সর্বদাই চেলাচামুন্ডারা তাকে ঘিরে থাকে। একা থাকার কোনো সুযোগই নেই তার। আর একথা কে না জানে যে একা না হলে ভূতেরা ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে না। জোর পায় না।

সকালে উঠে কিশোরী তার শাকরেদ আর সঙ্গীদের নিজে হাজার খানেক বুকডন আর বৈঠক দেয়। তারপর দঙ্গলে নেমে পড়ে। কোস্তাকুস্তি করে বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে প্রায়ই কারও না কারও সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়। সন্ধের পর একটু গানবাজনা শুনতে ভালোবাসে কিশোরী। রাতে সে পাথরের মতো পড়ে এক ঘুমে রাত কাবার করে। তখন তার গা হাত পা দাবিয়ে দেয় তার শাকরেদরা। এই নিশ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে ভূতেরা ঢুকবার কোনো ফাঁকই পায় না।

গণপত মাহাতো নামে আর একজন কুস্তিগীর আছে। সেও মস্ত পালোয়ান। দেশ বিদেশের বিস্তর দৈত্য দানবের মতো পালোয়ানকে সে কাৎ করেছে। কিন্তু পারেনি শুধু কিশোরী সিংকে। অথচ শুধু কিশোরী সিংকে হারাতে পারলেই সে সেরা পালোয়ানের খেতাবটা জিতে নিতে পারে।

কিন্তু মুশকিল হল নিতান্ত বাগে পেয়েও নিতান্ত কপালের ফেরে সে কিশোরীকে হারাতে পারেনি। সেবার লক্ষ্ণৌতে কিশোরীকে সে যখন চিৎ করে প্রায় পেড়ে ফেলেছে সেই সময় কোথা থেকে হতচ্ছাড়া এক মশা এসে তার নাকের মধ্যে ঢুকে এমন পন পন করতে লাগল, হাঁচি না দিয়ে আর উপায় রইল না তার। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় হাঁচিটার সুযোগে তাকে রদ্দা মেরে চিৎ করে ফেলে দিল।

পাটনাতেও ঘটল আর এক কাণ্ড। সেবার কিশোরীকে বগলে চেপে খুব কায়দা করে স্ক্রু প্যাঁচ আঁটছিল গণপত। কিশোরীর তখন দমসম অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে একটা ষাঁড় ক্ষেপে গিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে লন্ডভন্ড বাধিয়ে দিল। কিন্তু গণপত দেখল এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কিশোরীকে হারানো যাবে না। সুতরাং সে প্যাঁচটা টাইট রেখে কিশোরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিল। সেই সময় ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দর্শকরা সব পালিয়েছে আর ষাঁড়টা আর কাউকে না পেয়ে দুই পালোয়ানের দিকেই তেড়ে এল।

কিশোরী তখন বলল, গণপত, ছেড়ে দাও। ষাঁড় বড় ভয়ংকর জিনিস।

গণপত বলল, ষাঁড় তো ষাঁড়, স্বয়ং শিব এলেও ছাড়ছি না।

ষাঁড়টা গুঁতোতে এলে গণপত অন্য বগলে সেটাকে চেপে ধরল। সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। দেখেছেও অনেকে। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরের জলে নেমে, বাড়ির ছাদে

উঠে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারা অনেকেই দেখেছে। গণপত লড়াই করছে দুই মহাবিক্রম পালোয়ানের সঙ্গে—ষাঁড় এবং কিশোরী সিং। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরে ডুবে থেকেও সে লড়াই দেখে লোকে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিল গণপতকে।

ষাঁড়ের গুঁতো, কিশোরীর হুড়ো এই দুইকে সামাল দিতে গণপত কিছু গন্ডগোল করে ফেলেছিল ঠিকই। আসলে কোন বগলে কে সেইটেই গুলিয়ে গিয়েছিল তার। হুড়যুদ্ধুর মধ্যে যখন সে এক বগলের আপদকে জুৎসই একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলেছে তখনও তার ধারণা যে চিৎ হয়েছে কিশোরীই।

কিন্তু নসিব খারাপ। কিশোরী নয়, চিৎ হয়েছিল ষাঁড়টাই। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার ঘাড়ে উঠে লেংগউটি প্যাঁচ মেরে ফেলে দিয়ে জিতে গেল।

তৃতীয়বার তালতলার বিখ্যাত আখড়ায় কিশোরীর সঙ্গে ফের মোলাকাত হল। গণপত রাগে দুঃখে তখন দুনো হয়ে উঠেছে। সেই গণপতের সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তার হুংকারে তখন মেদিনী কম্পমান।

লড়াই যখন শুরু হল তখনই লোকে বুঝে গেল, আজকের লাড়াইয়ে কিশোরীর কোনো আশাই নেই। কিশোরী তখন গণপতের নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাটা ঘটল। ভাদ্র মাস। তালতলার বিখ্যাত পাঁচসেরী সাতসেরী তাল ফলে আছে চারধারে। সেই সব চ্যাম্পিয়ান তালদের একজন সেই সময়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেমে এল নিচে। আর পড়বি তো পড় সোজা গণপতের মাথার মধ্যিখানে।

গণপতের ভালো করে আর ঘটনাটা মনে নেই। তবে লোকে বলে, তালটা পড়ার পরই নাকি গণপত কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে যে লড়াই করছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কিশোরী, এবং সতর্ক না হলে যে বিপদ তা আর তার মাথায় নেই তখন। সে নাকি গালে হাত দিয়ে হঠাৎ বিড় বিড় করে তুলসী দাসের রামচরিত মানস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। কিশোরী যখন সেই সুযোগে তাকে চিৎ করে তখনও সে নাকি কিছু মাত্র বাধা দেয়নি। হাতজোড় করে রামজিকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গণপতের বয়স হয়েছে। শরীরের আর সেই তাগদ নেই। কিশোরী সিংকে হারিয়ে যে খেতাবটা সে জিততে পারল না এসব কথাই সে সারাক্ষণ ভাবে।

ভাবতে ভাবতে কী হল কে জানে। একদিন আর গণপতকে দেখা গেল না।

ওদিকে কিশোরীর এখন ভারি নামডাক। বড় বড় ওস্তাদকে হারিয়ে সে মেলা কাপ মেডেল পায়। লোকে বলে, কিশোরীর মতো পালোয়ান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তা একদিন ডাকে কিশোরীর নামে একটা পোস্টকার্ড এল। গণপতের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, ভাই কিশোরী, তোমাকে হারাতে পারিনি জীবনে এই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। একবার মশা, একবার ষাঁড়, আর একবার তাল আমার সাধে বাদ সেধেছে। তবু তোমার সঙ্গে আর একবার লড়বার বড় সাধ। তবে লোকজনের সামনে নয়। আমরা দুই পালোয়ান নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করব। আমি হারলে তোমাকে গুরু বলে মেনে নেব। তুমি হারলে আমাকে গুরু বলে মেনে নেবে। কে হারল, কে জিতল তা বাইরের কেউ জানবে না। জানব শুধু আমি, আর জানবে তুমি। যদি রাজি থাকো তবে আগামী অমাবস্যায় খেতুপুরের শ্মশানের ধারে ফাঁকা মাঠটায় বিকেলবেলায় চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠিটা পড়ে কিশোরী একটু ভাবিত হল। সত্যি বটে, গণপত খুব বড় পালোয়ান। এবং কপালের জোরেই তিন তিনবার কিশোরীর কাছে জিততে জিততেও হেরে গেছে। অত বড় একটা পালোয়ানের এই সামান্য আব্দারটুকু রাখতে কোনো দোষ নেই। হারলেও কিশোরীর ক্ষতি নেই। সাক্ষীসাবুদ তো থাকবে না। কিন্তু হারার প্রশ্নও ওঠে না। কিশোরী এখন অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। তাছাড়া গণপতকে যে সে খুব ভলোভাবে হারাতে পারেনি সেই লজ্জাটাও তার আছে। সুতারং লজ্জাটাও দূর করার এই—ই সুযোগ। এবার গণপতকে ন্যায্যমতো হারিয়ে সে মনের খচখচানি থেকে মুক্ত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোরী তৈরি হয়ে খেতুপুরের দিকে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরেও নয়। তিন পোয়া পথ। নিরিবিলি জায়গা।

শ্মশানের ধারে মাঠটায় গণপত অপেক্ষা করছিল। কিশোরীকে দেখে খুশি হয়ে বলল এসেছ! তাহলে লড়াইটা হয়েই যাক।

কিশোরীও গোঁফ মুচড়ে বলল, হোক।

দুজনে ল্যাঙট এঁটে, গায়ে মাটি থাবড়ে নিয়ে তৈরি হল।

তারপর দুই পালোয়ান তেড়ে এল দুদিক থেকে। কিশোরী ঠিক করেছিল, পয়লা চোটেই গণপতকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধোবিপাট মেরে কেল্লা ফতে করে দেবে।

কিন্তু সাপটে ধরার মুহূর্তেই হঠাৎ পোঁ করে একটা মশা এসে নাকে ঢুকে বিপত্তি বাধালে। হ্যাঁচ্চেচা হ্যাচচোঁ হাঁচিতে গগন কেঁপে উঠল। আর কিশোরী দেখল, কে যেন তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে ফেলে চিৎ করে দিল।

গণপত বলল, আর একবার।

কিশোরী লাফিয়ে উঠে বলল, আলবাৎ।

দ্বিতীয় দফায় যা হওয়ার তাই হল। লড়াই লাগতে না লাগতেই একটা ষাঁড় কোথা থেকে এসে যে কিশোরীর বগলে ঢুকল তা কে বলবে। কিশোরী আবার চিৎ।

গণপত বলল, আর একবার হবে?

কিশোরী বলল, নিশ্চয়ই।

কী হবে তা বলাই বাহুল্য। লড়াই লাগতে না লাগতেই দশাসই এক তাল এসে পড়ল কিশোরীর মাথায়। কিশোরী 'পাখি সব করে রব' আওড়াতে লাগল। এবং ফের চিৎ হল।

হতভম্বের মতো যখন কিশোরী উঠে দাঁড়াল তখন দেখল, গণপতকে ঘিরে ধরে কারা যেন খুব উল্লাস করছে। কিন্তু তারা কেউই মানুষ নয়! কেমন যেন কালো কালো, ঝুলকালির মতো রং রোগা, তেঠেঙে লম্বা সব অদ্ভুত জীব।

জীব? না কি অন্য কিছু?

কিশোরী হাঁ করে দেখল, গণপতও আস্তে আস্তে শুকিয়ে, কালচে মেরে, লম্বা হয়ে ওদের মতোই হয়ে যেতে লাগল।

কিশোরী আর দাঁড়ায় নি, 'বাবা রে, মা রে' বলে চেঁচিয়ে দৌড়াতে লেগেছে।

* * *

কিশোরী পালোয়ানের ভূতের ভয় আছে, একথা এখনও লোকে জানে না বটে। কিন্তু কিশোরী নিজে খুব জানে। আর এই জানলে তোমরা।

ভূত ও বিজ্ঞান
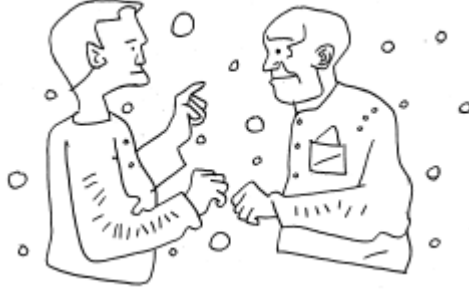
সন্ধে হয়ে আসছে। পটলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন বলে বেশ জোরেই হাঁটছেন, জোরে হাঁটার আরও একটা কারণ হল আকাশে বেশ ঘন কালো মেঘ জমেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে একটু মুশকিল হবে। তিনি আজ আবার ছাতাটা নিয়ে বেরোননি।

পায়ের হাওয়াই চপ্পলজোড়ার দিকে একবার চাইলেন পটলবাবু, দুখানা ছোট ডিঙি নৌকোর সাইজের জিনিস, দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই, কিন্তু ভারি কাজের জুতো। মাধ্যাকর্ষণ নিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে আকাশের অনেকটা ওপর দিয়ে দিব্যি হাঁটাচলা করা যায়। জুতোর ভিতরে ছোট মোটর লাগানো আছে। সেটা চালু করলে আর পা নাড়ারও দরকার হয় না। ক্ষুদে বুস্টার রকেট তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু পটলবাবুর ইদানীং খুব বেশি গতিবেগ সহ্য হয় না, মাথা ঘোরে। স্ক্যান করে দেখা গেছে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে একটা গন্ডগোল আছে। বেশি গতিবেগে গেলেই তাঁর মাথা ঘোরে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং পটলবাবু ভেসে ভেসে হেঁটে চলেছেন। বৃষ্টি বাদলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বেলুন ছাতা হালে আবিষ্কার হয়েছে। ফোল্ডিং জিনিস, ভাঁজ খুলে জামার মতো পরে নিতে হয়, তারপর বোতাম টিপলেই সেটা বেলুনের মতো ফুলে চারদিকে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে, ঝড়বৃষ্টিতে সেই বেলুনের কিছুই হয় না। সে ছাতাটা না আনায় পটলবাবুর একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই তিন হাজার সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দেও জলে ভিজলে মানুষের সর্দিকাশি হয় এবং সর্দিকাশির কোনো ওষুধে পটলবাবুর তেমন কাজ হয় না।

পকেটে টেলিফোনটা বিপ বিপ করছিল, পটলবাবু টেলিফোনটা কানে দিয়ে বললেন, কে?

কে, পটলভায়া নাকি? আমি বিষ্ণুপদ বলছি।

বলো ভায়া।

বলি, তুমি এখন কোথায়?

আমি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপরে, দু হাজার সাতশো ফুট অল্টিচুডে রয়েছি। আকাশে কালবোশেখির মেঘ এবং সঙ্গে ছাতা নেই।

বাঁচালে ভায়া। ঈশ্বরেরই ইচ্ছে বলতে হবে, আমি নবগ্রামে রয়েছি। এই উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই।

বলো কী? তুমি তো ক'দিন আগেও হিউস্টনে ছিলে!

তারও আগে ছিলুম মঙ্গলগ্রহে। তার আগে নেপচুনে। আমার কি এক জায়গায় থাকলে চলে?

তা নবগ্রামে কী মনে করে?

একটা সমস্যায় পড়েই আসা। তুমি নবগ্রামে নেমে পড়ো, কথা আছে।

প্রস্তাবটা পটলবাবুর খারাপ লাগল না, ঝড়বৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে নবগ্রামে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাওয়া বরং অনেক ভালো।

পটলবাবু বললেন, ঠিক আছে, কোথায় আছো সেটা বলো।

স্ক্যানার ছেষট্টি ক—তে জিরো ইন করো।

পটলবাবু স্ক্যানার বের করে নবগ্রামের দিক নির্ণয় করে নিয়ে নম্বরটা সেট করলেন, তারপর স্ক্যানারের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। নবগ্রাম সামনেই, কালবোশেখির বাতাসটা শুরু হওয়ার আগেই নেমে পড়তে পারবেন বলে আশা হতে লাগল তাঁর।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পশ্চিম দিককার আকাশে যে কালো কুচকুচে মেঘে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ যেন একটা কালো গোল মেঘের বল কামানের গোলার মতোই তাঁর দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপার তিনি কস্মিনকালেও দেখেননি। পটলবাবু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়াই চপ্পলের ভাসমানতা কমিয়ে দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু শেষরক্ষে হল না। মেঘের বলটা হুড়ুম করে এসে যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পটলবাবুর চারদিক একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ে তিনি সিঁটিয়ে গেলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করলেন। অন্ধকারেও টেলিফোন করতে অসুবিধে নেই। ডায়ালের বোতামগুলো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে।

কিন্তু টেলিফোন করার সুযোগটাই পেলেন না তিনি। কে যেন হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

তারপর যা হতে লাগল তা পটলবাবুর সুদূর কল্পনারও বাইরে। মেঘের গোলাটা তাঁকে যেন খানিক লোফালুফি করে হু—হু করে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পটলবাবু চেঁচাতে লাগলেন, বাঁচাও! বাঁচাও!

কানের কাছে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলল, চোপ!

ভয়ে পটলবাবু বাক্যহারা হলেন, কিন্তু ধমকটা কে দিল তা বুঝতে পারলেন না।

মেঘের বলটা তাঁকে নিয়ে এত ওপরে উঠে যাচ্ছে যে পটলবাবুর ভয় হতে লাগল, আরও ওপরে উঠলে তিনি নির্ঘাৎ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন। সে ক্ষেত্রে হাওয়াই চপ্পল কাজ করবে না। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে।

আচমকাই মেঘের বলটা থেমে গেল। এবং ধীরে ধীরে চারদিককার অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। মেঘ কেটে যাওয়ার পর পটলবাবু যা দেখলেন তাতে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। পৃথিবী থেকে অন্তত দু'শো মাইল ওপরে তিনি নিরালা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, একদম একা।

কে যেন বলে উঠল, এই যে পটল!

পটলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলেন তাতে তাঁর হৃদকম্প হতে লাগল। বৈজ্ঞানিক হরিহর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সমস্যা হল হরিহর এই গত জানুয়ারি মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

কাঁপা গলায় পটলবাবু বললেন, আ—আপনি?

শূন্যে দু'খানা চেয়ার পাতলেন হরিহর। তারপর বললেন, বোসো হে পটল, কথা আছে।

পটলবাবু কম্পিত বক্ষে বসলেন, দুশো মাইল উচ্চতায় হাওয়ায় কোনো ঘন স্তর নেই। তাঁর হাওয়াই চপ্পল কাজ করছে না, তবু চেয়ার দুটো দিব্যি ভেসে রয়েছে। আর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না।

হরিহর বললেন, ভয় পেও না। আমাদের চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না, ঠান্ডাও লাগবে না, পড়েও যাবে না। নিচে এখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক নিরাপদ, কী বলো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনি তো—

মারা গেছি? হাঃ হাঃ হাঃ। আমি মরায় তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে, না? শোনো বাপু, আমি ভূতপ্রেত নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতুম বলে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, প্রকাশ্যেই আমাকে পাগল আর উন্মাদ বলা হত। সেই দুঃখে আমি নবগ্রামে একটা নির্জন বাড়িতে ল্যাবরেটারি বানিয়ে নিজের মনে গবেষণা করতে থাকি। একদিকে যখন তোমরা জড়বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করছ, অন্যদিকে তখন আমি এক

অজ্ঞাত জগতের সন্ধান করতে থাকি, তাতে যথেষ্ট কাজও হয়। ধীরে ধীরে দেহাতীত জগতের রহস্য ধরা পড়তে থাকে। আমার নানারকম কিম্ভূত যন্ত্রে আত্মাদের অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে রেকর্ড হতে থাকে। তারপর একদিন আমি তাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠি। আমার গবেষণায় শেষে তারাও সাহায্য করতে থাকে।

পটলবাবু সচকিত হয়ে বলেন, ভূত? কিন্তু ভূত তো—

কী বলবে জানি। ভূত একটা বোগাস ব্যাপার, এই তো! বাপু হে এই যে মহাশূন্যে ভেসে আছো, কোনো স্পেসস্যুট বা অক্সিজেন বা যন্ত্রপাতি ছাড়া— এটা কি তোমার বিজ্ঞান ভাবতে পারে?

মাথা নেড়ে পটলবাবু বললেন, আজ্ঞে না।

তবে? বিজ্ঞান শিখে এ সব না—মানার অভ্যাস মোটেই ভালো নয়, বুঝলে!

যে আজ্ঞে!

এখন যা বলছি শোনো। তোমার বন্ধু বিষ্ণুপদ সাঁতরা আমার গোপন ল্যাবরেটারির সন্ধান পেয়েছে। সেইখান থেকেই তোমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সে জড়বাদী বিজ্ঞানী, অবিশ্বাসী সে আমার ল্যাবরেটারিতে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে সব তছনছ করছে। সে আমাকে সত্যিকারের পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে। আমি জানি তুমি তেমন খারাপ লোক নও। তাই তোমাকে একটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুপদকে আটকাও।

যে আজ্ঞে।

তারপর তুমি নিজে আমার ল্যাবরেটারিতে ভূত আর বিজ্ঞান মেশাতে থাকো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ভূত আর বিজ্ঞান কি মিশ খাবে হরিহর কাকা?

খুব খাবে, খুব খাবে। খাচ্ছে যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমি কি পারব? আমার তো নিজের গবেষণা—

উহুঁ, নিজের গবেষণা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ভূত—বিজ্ঞান রসায়ন গবেষণাগারের ভার তোমাকেই নিতে হবে। নইলে—

পটলবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল, রাজি না হলে কী হবে তা ভাবতেও পারছিলেন না। ঘাড় কাৎ করে বললেন আজ্ঞে তাই হবে।

তাহলে চলো, নামা যাক।

চেয়ার দুটো দিব্যি সোঁ সোঁ করে নামতে লাগল। বায়ুস্তরে নেমে হরিহর বললেন, এবার নিজে নিজেই নামো, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে।

যে আজ্ঞে, বলে পটলবাবু নামতে লাগলেন।

শিবেনবাবুর ইস্কুল

সকালে বেড়াতে বেরিয়ে মহেন্দ্রবাবু একটা ভাঙা পরিত্যক্ত ইস্কুলবাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। স্কুলবাড়ি দেখলেই চেনা যায়। লম্বামতো বাড়ি, সার সার ঘর, মাঝখানে একটা উঠানমতো। তিনি ত্রিশ বছর ননা ইস্কুলে পড়িয়েছেন। এই সবে রিটায়ার করে হরিপুরে খুড়শ্বশুরের বাড়িতে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে এসেছেন।

একটা লোক সামনের মাঠে খোঁটা পুঁতছিল। তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বাপু হে, এটা যেন স্কুলবাড়ি বলে মনে হচ্ছে; তা এর এরকম ভগ্নদশা কেন?

ভগ্নদশা ছাড়া উপায় কী বলুন! শিবেন রায় ইস্কুল খুলেছিলেন, কিন্তু মোটে ছাত্তরই হয় না, তাই উঠে গেছে।

বলো কী? তা ছাত্র হয় না কেন?

অ্যাজ্ঞে এ হল গরিবের গাঁ, ছেলেপুলেদেরও পেটভাতের জোগাড় করতে কাজে লেগে পড়তে হয়, পড়বার ফুরসত কোথায় বলুন?

তাহলে তো বড়ই মুশকিল, এক কাজ করলে হয় না? যদি বিকেল বা সন্ধের দিকে ক্লাস করা হয় তাহলে?

লোকটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, তার জো নেই কর্তা, কেরোসিনের যা দাম হয়েছে তা কহতব্য নয়, শুধু দামই নয়, মাথা খুঁড়লেও তেল পাওয়া যায় না এখানে। তাই সন্ধে হতে না—হতেই গোটা গাঁ ঘুমে একেবারে ঢলাঢল, সন্ধের পর এ গাঁয়ে আলোর ব্যবস্থাই নেই, অন্ধকারে কি লেখাপড়া হয়?

মহেন্দ্রবাবু শিক্ষাব্রতী মানুষ, শিক্ষা জিনিসটা মানুষের জীবনে কত প্রয়োজন তা তিনি ভালোই জানেন, তাই বললেন, কিন্তু বাপু হে, শিক্ষারও তো একটা দাম আছে!

লোকটা একগাল হেসে বলে, তা আর নেই! শিক্ষা বড্ড উপকারী জিনিস মশাই, দু—চারটে ইংরিজি বুকনি ঝাড়লেই আমি দেখেছি গা বেশ গরম হয়ে ওঠে। শীতকালেও ঘামের ভাব হয়। তারপর ধরুন ইতিহাস, দু—পাতা পড়লেই এমন চমৎকার ঘুম এসে যায় যে, এক ঘুমে রাত কাবার, অঙ্ক কষতে বসলে খিদে চাগাড় দেবেই কি দেবে, এক থালা পান্তা খেয়ে আঁক কষতে বসেই খিদের চোটে উঠে পড়তে হয়েছে।

মহেন্দ্রবাবু একটু হতাশ হলেন বটে, কিন্তু ধৈর্য হারালেন না, বললেন তা বাপু, ইস্কুলটা চালু করার একটা ব্যবস্থা করা যায় না?

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে বলে, শিবেনবাবু পটল তুলেছেন। তার ছেলে—মেয়েরা ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে ভারি ব্যস্ত। ইস্কুলের পিছনে কে টাকা ঢালবে বলুন? ছাত্তরও নেই।

তাই তো বড় সমস্যায় পড়া গেল দেখছি।

মহেন্দ্রবাবুর খুড়শ্বশুর পাঁচকড়ি সমাদ্দার বললেন, শিবেনবাবুর ইস্কুলের কথা বলছ নাকি বাবাজি? ও তো এখন সাপখোপের আড্ডা, শিবেনবাবু ভালো ভেবে ইস্কুল তৈরি করলেন বটে, কিন্তু চালাতে পারলেন কই? আর এ গাঁয়ের লোকের লেখাপড়া শেখার গরজও নেই, শুনছি শিবেন্দুবাবুর ছেলেরা ইস্কুলবাড়িতে গুদামঘর বানাবে।

মহেন্দ্রবাবু শিক্ষাব্রতী মানুষ, দমলেন না, পরদিনই গিয়ে শিবেনবাবুর বড় ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে দেখা করে বললেন, স্কুলটা আবার চালু করলে ভালো হয়।

গোবিন্দ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, ট্যাঁকের কড়ি আর কতকাল গচ্চা দিতে হবে বলুন তো? বাবা তো কম টাকা ঢালেননি, আজ অবধি ক—টা মাধ্যমিক টপকেছে তা জানেন? পঞ্চাশ জনও নয়, আর তা না—হবেই বা কেন? যা ভূতের উৎপাত।

মহেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে বলে, ভূতের উৎপাত? সে আবার কী?

তবে আর বলছি কী? দিনেদুপুরে খাতা পেনসিল টেনে নিয়ে যায়, চেয়ার—টেবিল উলটে দেয়, ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দেয়, পরীক্ষার সময় ক্যানেস্তারার শব্দ করে, ইট—পাটকেল ছোড়ে, সবাই জেরবার হওয়ার জোগাড়।

মহেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, ভূত একটা কুসংস্কার বই তো নয়, নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু লোক আড়াল থেকে এসব করাচ্ছে।

গোবিন্দ বলল, তা পটল ঘোষ দুষ্টু নয়, এ কথা কেউ বলেছে কি? হাড়েবজ্জাত মানুষ ছিল মশাই, গাঁয়ে কোনো ভালো কাজ হতে গেলেই বাগড়া দিত, নতুন রাস্তা হয়েছে, পটল দলবল নিয়ে রাতে এসে রাস্তা খুঁড়ে রেখে যেত। জলাশয় হচ্ছে, পটল গিয়ে রাতারাতি তাতে জল ঢেলে রেখে আসত, গাছের চারা লাগালে উপড়ে ফেলতে লহমাও সময় লাগত না তার। পটলে আমলে এ গাঁয়ে একটাও স্কুল হয়নি, হলেই মামলা ঠুকে, মিথ্যে নালিশ করে কাজ আটকে দিত।

তা সেই পটলবাবু কোথায় থাকেন?

তা কে জানে মশাই, তবে কয়েক বছর হল সে মারা গেছে, ভেবেছিলাম এবার গাঁ জুড়োবে, তা কোথায় কী, ভূত হয়ে এখন আমাদের ইস্কুলটার পিছনে লেগেছে, আমাদেরই কপাল খারাপ, ওই জায়গাটাই পটলের ভিটে ছিল কি না, বাবা জমিটা কিনে নিয়েছিলেন।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মহেন্দ্রবাবু ফিরে এলেন, সব শুনে পাঁচকড়ি বললেন বাবাজীবন, গোবিন্দ কিন্তু মিথ্যে কথা বলেননি, এ ওই পটলের ভূতই বটে, তুমি বিশ্বাস করবে না বলে বলিনি, কিন্তু ঘটনা খুব সত্যি।

মহেন্দ্রবাবু জেদি লোক, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু মটকা মেরে রইলেন, বাড়ির সবাই ঘুমোলে চুপি চুপি উঠে, খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়লেন, তারপর সোজা এসে পোড়ো ইস্কুলবাড়িটায় ঢুকে পড়লেন।

ভূতের মোকাবিলা কখনও করেননি বলে মহেন্দ্রবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না এমতাবস্থায় কী করা উচিত। তবে তাঁর অসম্ভব সাহস, বুদ্ধিও বড় কম নয়।

সামনে যে ক্লাসঘরটা দেখলেন সেটাতেই ঢুকে পড়লেন মহেন্দ্রবাবু, ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, ইঁদুরের কিচমিচ শোনা যাচ্ছে, ঝিঁঝি ডাকছে, চামচিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, মহেন্দ্রবাবু মাথায়, মুখে হাতে মাকড়সার জাল টের পাচ্ছেন, চারদিকে বিচ্ছিরি গন্ধ।

মহেন্দ্রবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে খুব গম্ভীরভাবে ডাকলেন, পটলবাবু...

কেউ জবাব দিল না।

পটলবাবু, শুনতে পাচ্ছেন?

কোনো শব্দ নেই।

পটলবাবু, আমি হলাম মহেন্দ্র মাস্টার, বহু গাধা ঠেঙিয়ে মানুষ করে দিয়েছি, বুঝলেন?

অন্ধকারে হঠাৎ সামনে একটা সাদামতো কী যেন দেখা গেল, না কোনো মূর্তিটুর্তি নয়, খানিকটা কুয়াশার মতো ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ একটা খ্যাঁকানো গলায় কে যেন বলে উঠল, কে র‍্যা ? কার এত বুকের পাটা যে রাতবিরেতে ডাকাডাকি করছিস?

বললুম তো, মহেন্দ্র মাস্টার, গাধা পিটিয়ে মানুষ বানাই।

তা মরতে এখানে কেন? আর জায়গা নেই?

এই জায়গাই আমার পছন্দ। আজ থেকে রোজ নিশুত রাতে এসে আমি আপনাকে লেখাপড়া শেখাব।

অ্যাঁ লেখাপড়া আমাকে—

যে আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে মনে হল, আপনার ভিতরে এক অবিদ্যার বাস, তাকে তাড়াতে হলে বিদ্যের দরকার। আপনি তৈরি থাকুন, কাল থেকেই আমি আপনাকে পড়ানো শুরু করব। প্রথম মুগ্ধবোধ, তারপর বর্ণপরিচয়, তারপর ব্যাকরণ, কথামালা, হিতোপদেশ।

শেখালেই হল, যদি না শিখি

সহজে শিখবেন না যে আমি জানি, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই।

দেখো মাস্টার, মানে মানে সরে পড়ো, নইলে এমন সব কাণ্ড করব যে পালানোর পথ পাবে না।

দেখুন না চেষ্টা করে, কত ডাকাত ছেলেকে জল করে এসেছি, আপনি তো কিছুই নন।

আচ্ছা টেঁটিয়া তো!

যে আজ্ঞে।

ও তোমার কম্ম নয় হে। যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন কত মাস্টার কত চেষ্টা করেছে। আমাকে শেখাতে পারেনি। তুমি কোথা থেকে উদয় হলে হে বাপু?

উদয় যখন হয়েই পড়েছি তখন আর সহজে অস্ত যাচ্ছি না, বুঝলেন পটলবাবু?

পটলবাবুর ভূত একটু চুপ করে থেকে বলল, তার মানে তুমি সহজে টিট হওয়ার লোক নও।

আজ্ঞে না।

দূর বাপু, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে হবেটা কী? তার চেয়ে যাদের পড়ালে কাজ হয় তাদেরই পড়াও না।

কিন্তু আপনার জন্য যে ইস্কুলটাও উঠে গেছে?

ঠিক আছে বাপু, স্কুল হোক, আমি বরং তখন পাশের গাঁয়ে হাওয়া খেতে যাব।

ঠিক তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার মতো বদখত লোকের পাল্লায় পড়লে কি আর কিছু করার থাকে?

মহেন্দ্রবাবু হাসলেন।

পাঁচ দিনের মধ্যে শিবেনবাবুর স্কুল চালু হয়ে গেল। স্কুলের হেডমাস্টার হলেন মহেন্দ্রবাবু।

গ্রহান্তরে

জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বরুণবাবুর। সকাল থেকে গভীর রাত্রি অবধি খেটেখুটে যা আয় হয় তাতেও সংসারটা ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না। বাড়িতে নিত্য খিটিমিটি লেগেই আছে। ছেলেপুলেগুলো ঠিকমতো মানুষ হচ্ছে না। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়ার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে। চাকরির জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল। আয়ুও কি আর বেশিদিন আছে। বরুণবাবুর খুব ইচ্ছে করে সংসারের ঝামেলা থেকে বিদায় নিয়ে কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। তিনি টের পাচ্ছেন সংসারের ওপর তাঁর আর কোনো টান বা মোহ নেই। সারাদিনের শেষে বাড়ি ফিরতেও তাঁর ইচ্ছে করে না।

দূরের একটা টিউশানি সেরে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরছিলেন বরুণবাবু। মনটা বড়ই খারাপ। বুড়ো হতে চললেন, অথচ জীবনে একটা দিনও সুখে বা শান্তিতে কাটিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। নিজের ওপর, সংসারের ওপর, গোটা দুনিয়ার ওপর তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে।

ট্রাম ফাঁকা। একেবারেই ফাঁকা। শুধু আর একটা লোক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সামনের সিটে বসা। আর কেউ নেই।

হঠাৎ লোকটা ফিরে তাকিয়ে বলল, কেমন আছেন বরুণবাবু?

আর যাই হোক বরুণবাবুর স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। লোকটা রীতিমতো সুপুরুষ, বয়সও কম, চব্বিশ—পঁচিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু লোকটাকে বরুণবাবু কিছুতেই চিনতে পারলেন না।

ভদ্রতা করে বললেন, চলে যাচ্ছে কোনোরকমে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

লোকটা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল, চিনতে পারছেন না তো! চেনার কথাও নয়। আপনি জীবনে এই প্রথম আমাকে দেখছেন।

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, তাহলে—

লোকটা বলল, আমিও আপনাকে চিনতাম না। এই ট্রামেই আমাদের প্রথম দেখা হল।

তাহলে আমার নামটা জানলেন কী করে?

লোকটা তেমনি হাসি—হাসি মুখ করে বলে, সেটাও শক্ত কিছু নয়। চেষ্টা করলেই পারা যায়। আপনি যে বরুণ সরকার সেটা অহরহ তো আপনার মনের মধ্যে ভুরভুরি কাটছেই। সেই স্পন্দনটা ধরতে পারলেই হল।

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, অ্যাঁ! স্পন্দন ধরতে পারলেই হল! সেটাই কি খুব সহজ কাজ?

লোকটি হেসে বলল, চেষ্টা করলেই সহজ। অভ্যাসে কি না হয় বলুন।

আপনি কি থট—রিডার?

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, কথাটা মন্দ বলেননি। ওরকমই ধরে নিতে পারেন।

বরুণবাবু একটু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, আমি এখন কী ভাবছি তা বলতে পারেন?

পারি। আপনি আমার সম্পর্কে ভাবছেন, হুঁ হুঁ বাবা তুমি একখানি আস্ত বুজরুক।

ও বাবা! আপনি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি!

বললাম তো অভ্যাসে সব হয়। এইমাত্র আপনি ফুলকপির পোড়ের ভাজা আর সোনা মুগডালের কথা ভাবলেন...এইমাত্র ভাবলেন আপনার চলে—যাওয়া ছেলে ছোটকুর কথা... এইমাত্র ভাবলেন...

থাক থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ঠিকানাটা একটু দিন তো। সময় করে আপনার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। আপনি যখন এত জানেন তখন আপনার কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে হবে। কোথায় থাকেন আপনি?

লোকটি মিটিমিটি হাসল, আমার ঠিকানা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আমি অনেক দূরে থাকি। যদি যেতে চান তো আমিই নিয়ে যাব আপনাকে।

কলকাতা শহরটা আমি টিউশানি করে করে হাতের তেলোর মতো চিনি। এই তো খিদিরপুর থেকে ফিরছি।

কলকাতা চিনলে তো হবে না। আমি যে অনেক দূরের লোক।

কত দূরের?

আপনাদের হিসেবে অন্তত আড়াই হাজার লাইট ইয়ার।

দূর মশাই, আপনি এবার গুল মারতে শুরু করেছেন। ঠিক আছে ঠিকানা না হয় না—ই বললেন, দেখা তো হতে পারে আমাদের।

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, আমি এই সামনে ময়দানে নেমে যাব। আর দেখা হওয়ার সুবিধে নেই।

ময়দানে নামবেন! সেখানে কী আছে?

সেই কথাই তো বলতে চাইছি। আপনার তো আর সংসার—টংসার ভালো লাগছে না, তাই না?

আজ্ঞে না।

বেঁচে থাকার আনন্দটাই আর তেমন টের পাচ্ছেন না!

না। কিন্তু—

দাঁড়ান। আমি সব জানি। আপনাকে তাই একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। বেশ চটপট জবাব দেবেন।

আজ্ঞে সে আর বলতে!

ধরুন যদি আমি আপনার বয়স কমিয়ে দিই, যদি অমর করে দিই, শরীরটা যদি সুস্থ করে দিই, তাহলে কেমন হয়?

উঃ মশাই, এ তো স্বপ্নের কথা বলছেন।

স্বপ্ন নয়। সত্যি! আমরা ময়দানে পৌঁছে গেছি। শুভস্য শীঘ্রম। নেমে পড়ুন।

বরুণবাবু একটু দ্বিধা করলেন। নামিয়ে ছিনতাই করবে না তো!

লোকটা বলল, আপনার পকেটে ছ'টাকা পঁচাত্তর পয়সা আছে। হাতঘড়িটা পুরোনো, ওটা বেচলে পঁচিশ টাকাও পাওয়া যাবে না। জীবন তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। নেমে পড়ুন।

বরুণবাবু নেমে পড়লেন। লোকটা আজগুবি কথা বলছে বটে, কিন্তু একবার এই গুলবাজকে একটু বাজিয়েই দেখা যাক না।

ময়দানে বেশ ঘোর অন্ধকার। কুয়াশা চেপে পড়েছে। লোকটা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পকেট থেকে রিমোট কনট্রোলের মতো একখানা জিনিস বের করে বোতাম টিপতেই সামনে একখানা ডিমের মতো দেখতে মোটরগাড়ির মতো জিনিস দেখা গেল। একখানা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির চেয়ে বেশি বড় নয়।

বরুণবাবু সভয়ে বললেন, এটা কী?

আমরা বলি মনোরথ। আলোর গতির চেয়ে মনের গতি অনেক বেশি। এক লহমায় কোটি কোটি লাইট ইয়ার পেরিয়ে যেতে পারে। আমাদের এই গাড়িও তাই।

বলেন কী মশাই! ইয়ার্কি মারছেন না তো!

ইয়ার্কি হলে না হয় কান মলে দেবেন। আসুন।

লোকটা কলকাঠি নেড়ে একটা দরজা খুলল। ভিতরে বিশেষ যন্ত্রপাতি দেখা গেল না। বসার জন্য বেশ আরামদায়ক গদি আছে। শীত বা গরম কিছুই লাগছে না।

বরুণবাবু, আপনার খিদে পায়নি তো?

আজ্ঞে না।

পেলেও একটু চেপে রাখুন। একেবারে পৌঁছে খাবারের ব্যবস্থা হবে।

বরুণবাবু দুশ্চিন্তায় একটু ঘামতে লাগলেন।

কোনো ঝাঁকুনি লাগল না, শব্দও হল না। তবে শরীরটা হঠাৎ খুব হালকা লাগতে লাগল বরুণবাবুর। লোকটা মুখোমুখি বসে হাতের ছোট্ট যন্ত্রটা নিয়ে কী সব যেন করছে।

বরুণবাবু বাইরের দিকে চাইলেন। যা দেখলেন তাতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ঘোর অন্ধকার আকাশে বিশাল বড় বড় সব সূর্য দেখা যাচ্ছে, সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

লোকটা একটু হেসে বলল, আমরা এক সেকেন্ডেই পৌঁছে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করেই একটু নীহারিকাটা পাক দিয়ে নিলাম। এসে গেছি।

শরীরটা আবার স্বাভাবিক লাগল বরুণবাবুর। লোকটা দরজা খুলে বলল, আমাদের গ্রহ আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছে বরুণবাবু। আসুন।

বরুণবাবু নামলেন। নেমেই টের পেলেন, পরিষ্কার বাতাসে তাঁর বুক ভরে গেল। অনেক তরতাজা লাগছে নিজেকে। চারদিকে চেয়ে দেখলেন, বাড়ি—ঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটও নয়। চারদিকে শুধুই নিবিড় জঙ্গল। আকাশে দু'দুটো চাঁদ, তার আলোয় চারদিকটা জ্যোৎস্নায় একেবারে ভেসে যাচ্ছে। বিশাল বড় বড় গাছ যেন মেঘ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে মোটা মোটা লতা পাকিয়ে উঠেছে। সুন্দর ফুলের গন্ধে ম—ম করছে বাতাস।

বরুণবাবু বললেন, এ তো দেখছি শুধুই জঙ্গল!

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, ওপরটা আমরা জঙ্গলের আবরণই রেখে দিয়েছি। তাতে আবহমণ্ডল সুস্থ থাকে। বন্যজন্তুরও অভাব নেই। আমরা থাকি ভূগর্ভে।

এখানে দেখছি শীত নেই!

না। শীত গ্রীষ্ম কিছুই নেই। সবসময়েই বসন্তকাল। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।

এসব গাছপালা কি পৃথিবীর মতোই?

না তবে তুলসী, নিম এরকম কিছু গাছ এখানেও পাবেন। আর সব অন্যরকম।

আচ্ছা, আমি তো পৃথিবী থেকে আসছি, আমার কোনো ইনফেকশানের ভয় নেই তো এখানে?

লোকটা হাসল, না। কারণ মনোরথের মধ্যেই আপনাকে সূক্ষ্ম রশ্মি দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। আর আমাদের এই গ্রহে কোনো ক্ষতিকারক জীবাণুই নেই। এখানে কারও কখনও কোনো অসুখ করে না।

কক্ষনো না?

না বরুণবাবু। আমরা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। আমাদের কোনো হাসপাতাল নেই। ওষুধ তৈরি হয় না।

বরুণবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হলে?

তাও হয় না। আমার চল্লিশ হাজার তিন শো একানব্বই বছর বয়সে কখনও কোনো অসুখ—বিসুখ হয়নি।

অ্যাঁ! কত বললেন?

চল্লিশ হাজার তিন শো একানব্বই বছর, আপনাদের হিসেবে। আমাদের এখানে অবশ্য এক বছর আপনাদের সাড়ে তিনশো বছরের সমান।

এই বলে লোকটা হাতের যন্ত্রটা টিপতেই পায়ের নিচে একটা আলোকিত সিঁড়ির মুখ খুলে গেল।

নিচে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। লম্বা লম্বা হলঘর। করিডর। চলন্ত সিঁড়ি। চলন্ত মেঝে। সব ঝকঝক তকতক করছে। কাচের আড়ালে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ নানা ধরনের অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে।

আপনার নামটি কিন্তু আমাকে বলেননি স্যার।

আমার নাম ধৃতি। আসুন, এই ঘর।

ঘরটা একটা কাচের বর্তুলাকার চেম্বার। তাঁকে একখানা যন্ত্রের সামনে টুলের মতো জিনিসে বসিয়ে ধৃতি বলল, আপনার বয়সটা কমিয়ে দিচ্ছি। কত বছর বয়সে ফিরে যেতে চান?

বরুণবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, পঁচিশ?

ঠিক আছে। বলে ধৃতি একটা বোতাম টিপে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে চেম্বারের দরজাটা সেঁটে দিল।

কোনো শব্দ নেই, কম্পন নেই। অথচ বরুণবাবু টের পাচ্ছেন তাঁর শরীরের ভিতরে কী যেন একটা হয়ে যাচ্ছে। তিনি বদলে যাচ্ছেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর তিনি বুঝতে পারলেন, প্রক্রিয়াটা থেমে গেছে। সামনে একটা ঘষা কাচের পর্দায় বাংলা অক্ষরে এই ক'টা কথা ফুটে উঠল, অভিনন্দন! আপনি এখন পঁচিশ বছরের যুবক।

বরুণবাবু যন্ত্রকেই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আবার যখন বুড়ো হব তখন ফের বয়স কমানো যাবে কি?

পর্দায় ফুটে উঠল, আর কখনোই পঁচিশের বেশি বয়স হবে না আপনার। যেমন আছেন তেমনই চিরকাল থাকবেন।

চিরকাল বলতে?

চিরকাল বলতে চিরকাল। ইটারনিটি।

উরেব্বাস। তাহলে কতদিন বাঁচব?

চিরকাল।

হার্ট অ্যাটাক, ব্লাড প্রেশার, স্ট্রোক এসব হবে না?

কস্মিনকালেও নয়।

খুব রিচ খাবার খেলেও নয়?

খাবার কেন খাবেন?

খাব না?

না আপনার আর কখনও খিদেই হবে না।

বলেন কী?

খিদে হবে না, ঘুম পাবে না, ক্লান্তি আসবে না।

বটে! তাই তো আমার খিদের ভাবটা আর টের পাচ্ছি না, না?

কখনও পাবেন না।

তাহলে পুষ্টি হবে কী করে?

শরীরের ক্ষয় না হলে পূরণেরই বা কী প্রয়োজন?

আচ্ছা জলতেষ্টা পাবে তো?

কেন পাবে?

বাথরুমও তো পাবে, তখন শরীরের জল বেরিয়ে যাবে না?

বাথরুমও পাবে না।

বড় বাইরে বা ছোট বাইরে কোনোটাই নয়?

না।

ব্যায়াম করার দরকার আছে কি?

করতে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ নেই।

আচ্ছা ধরুন কেউ যদি আমাকে গুলি করে, কি ছোরা মারে বা আমি যদি আগুনে পুড়ে যাই তাহলেও মরব না?

না। আমাদের বায়োনিক ল্যাবরেটরির অটোমেটিক মেশিন আবার আপনার সব কিছু নতুন করে দেবে। আপনি কিছুতেই মারা যেতে পারবেন না এখানে।

ব্যথা তো লাগবে।

তাও লাগবে না। ব্যথার স্নায়ু এখানে আনন্দের তরঙ্গ তোলে, ব্যথার নয়।

ওরে বাবা! এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড দেখছি!

কিছুই সাংঘাতিক নয়। খুব সোজা ব্যাপার।

আমি কিন্তু খুব ঘুম—কাতুরে মানুষ।

শুয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ঘুমোনো অসম্ভব।

অঅর একটা কথা। পৃথিবীতে আমার বউ আর ছেলেপুলে, আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধবেরা আছে, তাদের কথা তো আমার মনে পড়বে!

পড়বে। স্মৃতিঘর বলে একটা চেম্বার আছে। সেখানে গিয়ে আপনি ইচ্ছে করলে যে—কোনো স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারবেন। আবার যে—কোনো স্মৃতিকে জাগিয়েও তুলতে পারবেন। আপনার যা ইচ্ছা।

মন যদি খারাপ হয়?

এখানে মন খারাপ হয় না। পাশেই আনন্দ—ঘর আছে। সেখানে গিয়ে আনন্দের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।

সবসময়ে আনন্দে থাকতে পারব?

অবশ্যই।

এ সময়ে দরজা খুলে ধৃতি ঘরে ঢুকল। বলল, বাঃ, এই তো যুবক হয়ে গেছেন।

আচ্ছা, আমি যদি আর একটু সুপুরুষ হতে চাই?

কোনো বাধা নেই। আসুন।

এর পর ধৃতি তাকে বিভিন্ন ঘরে নিয়ে গিয়ে সুপুরুষ করে দিল। আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। পৃথিবীর স্মৃতি খানিকটা আবছা করে দিল।

সব হয়ে যাওয়ার পর বরুণবাবু বললেন, এবার কী হবে ধৃতি?

এখানে তো কিছুই হয় না।

একটা কাজ—টাজ কিছু দেবে না?

কাজ অনেক আছে। সেগুলো সবই যন্ত্র—মানুষরা করে। ইচ্ছে করলে আপনিও করতে পারেন।

কিন্তু আমি যে এনজিনিয়ারিং জানি না।

চিন্তা নেই। বলে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে এনজিনিয়ারিং মস্তিষ্ক চালু করা হল বরুণবাবুর। তিনি দিব্যি কলকব্জার ব্যাপার বুঝতে শুরু করলেন।

যদি ডাক্তার হতে চাই?

তাও পারেন।

কবি?

তাও।

নাঃ, এ যে দেখছি সব পেয়েছির দেশ। এখানকার মানুষরা তাহলে বেশ আরামেই আছে বলো। তোফা আছে।

মানুষ! এখানে মানুষও নেই।

ওই যে কত জনকে দেখছি। কাজ—টাজ করছে।

কেউ মানুষ নয়। সব যন্ত্রের তৈরি।

বরুণবাবু আঁতকে উঠে বললেন, বলো কী হে! মানুষ কি তাহলে তুমি একা! অ্যাঁ!

ধৃতি একটু হেসে বলে, তাও নই।

মানে?

আমিও মানুষ নই বরুণবাবু। যন্ত্র মাত্র। এই গ্রহে বহু লক্ষ বছর কোনো মানুষ নেই। একসময়ে ছিল। তারা আমাদের হাতে এই গ্রহ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য গ্রহে, নীহারিকার ওপাশে অন্য নীহারিকায় চলে গেছে। পরীক্ষা—নিরীক্ষা করার জন্য আমাদের একজন মানুষ বড় দরকার ছিল। তাই আপনাকে আনা।

অ্যাঁ!

ভয় পেলেন নাকি?

হ্যাঁ, আমার যে ভয় হচ্ছে।

ওই একটা জিনিসকেই আমরা জানতে চাই। ভয়। মানুষের ভয়কে আমরা জয় করতে পারিনি। কেন পারিনি তা জানার জন্যই আপনাকে আনা।

বরুণবাবু হঠাৎ বিকট গলায় বললেন, তাহলে কি এই গ্রহে আমি একা একটা মানুষ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওরে বাবা রে! আমি কিছুতেই এখানে থাকব না...কিছুতেই না...ও ভাই ধৃতি, শিগগির আমাকে আমার নোংরা পৃথিবীতে দিয়ে এসো। রোগ—ভোগ বয়স মৃত্যু ওসব নিয়েই আমি থাকতে চাই... ও ভাই ধৃতি, তোমার পায়ে পড়ি....

এসপ্লানেড আ গয়া বাবু। উঠিয়ে।

পটাং করে চোখ মেললেন বরুণবাবু। ট্রাম এসপ্লানেডে এসে গেছে। চোখ কচলে তিনি চারদিকে চাইলেন। যা দেখছেন তা অতি সত্যি। এ কলকাতাই বটে। তিনি পৃথিবীতেই আছেন।

মস্ত একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন তিনি। নেমে পড়লেন। মনটায় বড় আনন্দ হচ্ছে।

শ্যামবাজারমুখো একখানা বাসে উঠে দেখলেন, বেশ লোকজন আছে। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই আনন্দের চোটে বললেন, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি মশাই!

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

ফুটো

দোলগোবিন্দুবাবু দুঃখী মানুষ। বরাবরই তাঁর দুঃখে কেটেছে। ছেলেবেলায় গরিব বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি—মোয়া বিক্রি করে পেট চালিয়েছেন। লেখাপড়া শিখেছেন অতি কষ্টে। এই পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ বছরের জীবনটা তাঁর আজও বেশ দুঃখেই কাটে। অল্প মাইনের একটা চাকরি করেন। ঘরে তাঁর বউ দিনরাত গঞ্জনা দেন। ছেলেমেয়ে দুটো ভারি রোগা ভোগা। অফিসেও তাঁকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। ভালোমানুষ বলে বেশি করে খাটিয়ে নেয়। দোলগোবিন্দবাবু নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন। তাঁর অফিস বলতে একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি। নানারকম জিনিস তৈরি হয়। কালি, ইঁদুরমারা বিষ, নানারকম সিনথেটিক আঠা। দোলগোবিন্দবাবু একজন সামান্য কেমিস্ট। ক—এর সঙ্গে ফরমুলা অনুযায়ী খ মিশিয়ে গ তৈরি করা আর কী। তবে মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি যখন একা একা বসে কাজ করেন তখন তাঁর ইচ্ছে যায়, নানারকম জিনিসের সঙ্গে নানারকম বেখাপ্পা জিনিস মিশিয়ে দেখলে কেমন হয়? এরকম মিশিয়ে দেনও কয়েকবার। তেমন কিছু দাঁড়ায়নি।

আজও অফিস থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাইরে দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর হাওয়া দিচ্ছে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। রাস্তায় হাঁটুভর জল দাঁড়িয়ে গেছে। দোলগোবিন্দবাবু র‍্যাক—এ ঝোলানো তাঁর ছাতাটা নিতে গিয়ে একটু অবাক হলেন। বাঁ দিকের দ্বিতীয় হুকটায় তিনি বরাবর তাঁর ছেঁড়া তাপ্পি—দেওয়া ছাতাটা ঝুলিয়ে রাখেন। আজও রেখেছেন। অথচ ছাতাটা নেই। তার বদলে একটা খুব ঝকমকে নতুন ছাতা ঝুলছে। শুধু নতুন নয় বেশ কায়দার ছাতা। কালো বাঁকানো পুরু হ্যান্ডেল, দারুণ দামি কাপড়, ওজনেও সাধারণ ছাতার চেয়ে পাঁচগুণ ভারী। র‍্যাক—এ আর দ্বিতীয় ছাতা নেই। অফিসের সবাই কখন বাড়ি চলে গেছে।

দোলগোবিন্দবাবু দারোয়ান রামবিলাসকে ডেকে ছাতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। রামবিলাস বলল, আমি তো কিছু জানি না বাবু।

অন্যের ছাতাটা নেওয়া উচিত হবে কিনা তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তবে ছাতা যারই হোক সে ছাতা নিতে এই দুর্যোগে আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কাল ছাতাটা ফেরত আনলেই হবে। এই ভেবে দোলগোবিন্দ ছাতাটা নিয়ে বেরোলেন।

ছাতাটা ভালো। খুবই ভালো। মাথার ওপর তুলে দোলগোবিন্দ ছাতাটা খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই সেটা আপনা থেকেই নিঃশব্দে এবং বেশ বিনীতভাবে খুলে গেল। আজকালকার অটোমেটিক ছাতা যেমন অভদ্র ভাবে ফটাং করে খোলে সেরকমভাবে নয়।

বৃষ্টি আজ বড়ই প্রবল। রাস্তায় কলকল করে যেন নদী বয়ে চলেছে। বাস ট্রাম ট্যাক্সি সব বন্ধ। একটা কুকুরকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দোলগোবিন্দবাবু বুঝলেন, আজ জল ঠেঙিয়ে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে দোলগোবিন্দ দেখলেন, সিঁড়ির নিচে তেমন জল নেই। চটি ভিজল না। দোলগোবিন্দও হাঁটতে হাঁটতে আরও টের পেলেন, ছাতাটা এতই ভালো যে চারদিকে প্রবল বৃষ্টি এবং বাতাস সত্ত্বেও তাঁর গায়ে একটুও ছাঁট লাগছে না, বাতাসও নয়। এত ভালো ছাতা নিশ্চয়ই এদেশে হয় না।

বেশ আনমনেই হাঁটছিলেন দোলগোবিন্দবাবু। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেবেলার কথা ভাবছিলেন। তাঁদের খোড়ো চালের ঘরে বর্ষাকালে বড় জল পড়ত। তাঁরা ঘরে বসে ভিজতেন আর সারা রাত জেগে বসে জড়সড় হয়ে কাটাতেন।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, পায়ের নিচে যেন মাটিটা ভালো টের পাচ্ছেন না! হল কী? নিচের দিকে তাকিয়ে উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই কনভেন্ট রোডের রাস্তাটা কোন জাদুবলে যেন প্রায় দশ হাত নিচে পড়ে আছে। আর তিনি ভেসে আছেন।

না, কথাটা ঠিক হল না। তিনি ঠিক ভেসেও নেই। তিনি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। কোনো বাড়তি শক্তি লাগছে না, চেষ্টা করতে হচ্ছে না, একেবারে গ্যাস বেলুনের মতো দিব্যি উঠে যাচ্ছেন তিনি।

এই অশরীরী কাণ্ডে দোলগোবিন্দ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঁচাও! গেলুম!

ঝড় বৃষ্টিতে সেই শব্দ কেউ শুনতে পেল না। আর শুনলেও লাভ ছিল না। দোলগোবিন্দ তখন মাটি থেকে বিশতলা বাড়ির উচ্চতায় ঝুলছেন, মানুষ তাঁর কী সাহায্য করতে পারে!

দোলগোবিন্দ কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। ভাবলেন, এটা তো দুঃস্বপ্ন, কেটে যাবে এখুনি।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন কাটল না। দোলগোবিন্দ যখন চোখ খুললেন তখন কলকাতা শহরটা প্রায় মাইলটাক নিচে পড়ে আছে। দোলগোবিন্দ শিব, কালী, হরি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাকার যত দেবদেবীর নাম মনে পড়ল তাঁদের বিস্তর ডাকাডাকি করতে লাগলেন। একবার ছাতাটা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু লাফালে তাঁর হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাছাড়া ছাতাটাই যেন তার হাতখানা মুঠো করে ধরে আছে। ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারবে না।

দোলগোবিন্দ কখনও এরোপ্লেন চড়েননি। উঁচু পাহাড়েও কখনো ওঠেননি। বলতে কি এত উঁচুতে তাঁর এই প্রথম ওঠা। নিচের দিকে চেয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, হাত, পা হিম হয়ে গেল, বুক ধড়পড় করতে লাগল। চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন।

ধোঁয়া ধোঁয়া দেখার অবশ্য দোষও নেই। একটু বাদেই দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন যে ধোঁয়া নয়, তাঁর চারপাশে মেঘ, আঁতকে উঠে ভিরমি খেতে খেতেও সজাগ রইলেন দোলগোবিন্দবাবু। মেঘ খুব বিপদের জিনিস। মেঘ থেকেই বিদ্যুৎ চমকায় এবং বাজ পড়ে। কাছাকাছি যদি এখন বিদ্যুৎ চমকায় তাহলে বড় বিপদ।

বেশ কিছুক্ষণ চারপাশ ঘন কুয়াশার মতো মেঘে ঢাকা রইল। দোলগোবিন্দ কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না, তারপর একসময়ে হঠাৎ আকাশটা হেসে উঠল মাথার ওপর। ঝকমক করছে তারা, বেশ জ্যোৎস্নাও ফুটফুট করছে। পায়ের তলায় পড়ে আছে কোপানো খেতের মতো মেঘের স্তর।

দোলগোবিন্দ আচমকাই দেখতে পেলেন, হাত দশেক দূরে একটা ডিঙিনৌকো বাতাসে ভাসছে। এক হাতে চোখ কচলে নিয়ে তাকালেন, না, ঠিক ডিঙিনৌকো নয়, একট অতিকায় পটল। কিংবা....

আর ভাববার সময় পেলেন না। ছাতাটা তাঁকে ধরে এনে ওই অতিকায় পটলের মতো বস্তুটার পিঠে খুব যত্নের সঙ্গে নামিয়ে দিল, তারপর ছাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দোলগোবিন্দবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই পায়ের নিচে ম্যানহোলের মতো একটা ঢাকনা খুলে গেল এবং তিনি সেই ফুটো দিয়ে ভিতরে পড়ে গেলেন।

নাঃ, খুব একটা জোরে পড়লেন না। তাছাড়া যেখানে পড়লেন সেখানে ফোম রবারের মতো গদিও ছিল। শুধু ভড়কে যাওয়ায় মুখ দিয়ে "আঁচ" করে একটা শব্দ বেরিয়েছিল তাঁর।

মহাকাশযান, উফো, ভিন্ন গ্রহের জীব ইত্যাদি সম্পর্কে আর পাঁচজনের মতো দোলগোবিন্দবাবুও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই পটলের মতো বস্তুটি যে ভিন্ন কোনো গ্রহ থেকে আসা একটি উফো সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই রইল না। উফোর ভেতরটা খুবই বড়—সড় এবং নানারকম কিম্ভূত যন্ত্রপাতি রয়েছে চারদিকে। দিব্যি ঝলমলে আলো জ্বলছে।

দোলগোবিন্দবাবু উঠে দাঁড়াতেই একটা মানুষ— না, অবিকল মানুষ নয়— অনেকটা মানুষের চেহারার একটা জীব তাঁর দিকে এগিয়ে এল। মানুষের সঙ্গে এর তফাত হচ্ছে এই জীবটার শুঁড় এবং লেজ আছে। বাকিটা মানুষের মতোই। শুঁড়টা হাতির শুঁড়ের মতো অত বড় নয়। লেজটা অনেকটাই গরুর লেজের মতো। লোকটার পোশাক বলতে একটা হাফ প্যান্টের মতো বস্তু, গায়ে একটা জহরকোট গোছের জিনিস।

এদিক সেদিক আরও কয়েকজন অবিকল একরকম জীবকে দেখতে পেলেন দোলগোবিন্দ, তারা সব তখনও মনোযোগে যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করছে।

সামনের জীবটা প্রথমে শুধু দুর্বোধ্য একটা ভাষায় দোলগোবিন্দবাবুকে কিছু একটা বলল। ভাষাটা না বুঝলেও কথা বলার ঢং—এর মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা আছে।

এরপর জীবটা একটা রেডিওর মতো যন্ত্র মুখের কাছে তুলে ধরে কথা বলতে লাগল।

আশ্চর্য! পরিষ্কার বাংলা ভাষা।

জীবটা বলল, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আমাদের ভাষা তুমি বুঝবে না। আমি যে যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তা একটা অনুবাদ যন্ত্র। আমার ভাষাকে তোমার ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে দিচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ তো।

ঘাবড়ে গেলেও দোলগোবিন্দ ঘাড় কাৎ করে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখন শোনো। যে ছাতাটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তা আমরাই পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এই মহাকাশযানে একটা যন্ত্রের মধ্যে একটা ফুটো দেখা দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই ফুটো আমরা বন্ধ করতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের সবজান্তা যন্ত্রমগজের সাহায্য নিই। যন্ত্রমগজ আমাদের তোমার নাম জানিয়ে বলে, একমাত্র এই লোকটাই সেই কেমিক্যাল তোমাদের দিতে পারে যার সাহায্যে ফুটো সারানো সম্ভব। তাই তোমাকে একটু কষ্ট দিয়ে এখানে টেনে এনেছি।

দোলগোবিন্দ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কিন্তু আমি তো বৈজ্ঞানিক নই, সামান্য ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি কেমিক্যালের কী জানি? জীবটা বলল, ভালো করে ভেবে দেখ। আমাদের যন্ত্রমগজ কখনও মিথ্যে কথা বলে না। ভুলও করে না। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ও শুধু একটা লোকেরই নাম বলেছে। দোলগোবিন্দ মিত্র। সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

দোলগোবিন্দ আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুই তাঁর মনে পড়ল না। তবে মাঝে মাঝে উনি কিছু আজগুবি মিকশ্চার তৈরি করেছেন, করে সেগুলো বাতিল শিশি বা জারের মধ্যে ভরে নিজের আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। তা দিয়ে কোনো কাজ হবে না জেনেও, আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন এই ইয়ে, আমি ফুটো বন্ধ করার কোনো কৌশল জানি না। তবে আমার কাছে কয়েকটা আজগুবি মিকশ্চার আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোনটা কাজে লাগবে তা তো জানি না।

জীবটা বলল, আপনি এক্ষুণি আপনার ল্যাবরেটরিতে চলে যান। ওই ছাতাই আপনাকে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে। যদি আমাদের ছিদ্র সারাতে পারেন, তবে আপনাকে আমরা পুরস্কার দেব।

তাই হল। ফের প্রাণ হাতে করে ছাতার হাতল ধরে ঝুলে রইলেন দোলগোবিন্দ। ল্যাবরেটরির সামনে এসে দেখলেন, সর্বনাশ, দরজায় তালা দেওয়া।

কী করবেন ভাবছেন, এমন সময় হাতের ছাতাটা আপনা থেকেই উঠে তালাটায় গিয়ে একটা গুঁতো মারল। সঙ্গে সঙ্গে টক করে খুলে গেল তালা।

ভিতরের আলমারি খুলে মোট পাঁচটা শিশি আর জার হাতে বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দোলগোবিন্দ। ছাতাটা তালায় আর একটা গুঁতো দিতেই সেটা এঁটে গেল। দোলগোবিন্দর হাত আর বগল থেকে শিশি আর জারগুলোও পটাপট চুম্বকের আকর্ষণে ছাতার মধ্যে সেঁধিয়ে শিকগুলোর সঙ্গে লেগে রইল।

ঝুল খেতে খেতে দোলগোবিন্দ এসে সেই মহা পটলের মতো মহাকাশযানে উঠলেন।

সেই জীবটা এগিয়ে এসে দোলগোবিন্দবাবুকে খুব খাতির করে নিয়ে গেল।

পটলটার তলার দিকে একটা ধাতব বাক্সের মতো জিনিস আছে। ফুটোটা সেখানেই।

দোলগোবিন্দবাবুর মনে পড়ল যে শিশিটায় সবুজ রঙের ঘন পদার্থ রয়েছে তা থেকে দু ফোঁটা একবার তাঁর টেবিলের ওপর পড়ে যায়। পরে সেটা এমন শক্ত হয়ে জমে গিয়েছিল যে তিনি সেটা উকো দিয়ে ঘষেও তুলতে পারেননি। সুতরাং দোলগোবিন্দ আর দেরি না করে সবুজ শিশি থেকে দু ফোঁটা ফুটোয় ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা শক্ত হয়ে জমে গেল।

জীবটা একটা যন্ত্র থেকে তাপ্পি দেওয়া জায়গাটায় অনেকক্ষণ ধরে তাপ দিল। আবার একটা পাইপ থেকে ভীষণ ঠান্ডা একটা পদার্থ ছড়াল ওর ওপর। কিন্তু ফুটোর তাপ্পি টিকে রইল।

লেজ ও শুঁড়ওলা জীবটা দোলগোবিন্দর দিকে চেয়ে খুব বিনীতভাবে বলল, চমৎকার! আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন তা আর বলার নয়। এর জন্য আপনাকে আমরা আমাদের গ্রহের দুটি অতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। এ দুটো দিয়ে আপনি ভাগ্য ফেরাতে পারবেন।

জীব ভদ্রলোক দোলগোবিন্দবাবুকে দুটো ক্ষুদে বাক্স দিলেন। দোলগোবিন্দও ফের ছাতার বাঁট ধরে নেমে নিজের বাসার দোরগোড়ায় নামলেন।

পরদিন সকালে বাক্স দুটো খুলে হাঁ হয়ে গেলেন দোলগোবিন্দ, একটায় খানিকটা কর্কচ লবণ! অন্যটায় একটুখানি চুন। রসিকতা নয় তো!

না। অনেকক্ষণ ভেবে দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন, এ দুটো জিনিস সম্ভবত ওই গ্রহে পাওয়া যায় না, নিশ্চয়ই ভীষণ মূল্যবান। শুঁড় লেজওলা জীব বোধহয় জানে না যে পৃথিবীতে ওই দুই বস্তু অঢেল এবং সস্তা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বটে দোলগোবিন্দর, কিন্তু দমলেন না। সবুজ শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। যেখানে ফুটো পান সেখানেই প্রয়োগ করেন। ছাদের ফুটো, ছাতার ফুটো, বাসনের ফুটো।

ফুটো সারানোয় রীতিমতো নাম ডাক হতে লাগল তাঁর। ক্রমে নৌকা জাহাজ এরোপ্লেনের ফুটো পর্যন্ত সারাতে তাঁর ডাক পড়তে লাগল।

বলা বাহুল্য, দোলগোবিন্দর নাম এখন ফুটোবাবু। কোটি কোটি টাকার মালিক। বিশাল বাড়ি, গাড়ি, কোনো কিছুরই অভাব নেই।

ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর যা অবস্থা দেখছেন ধানুরাম তাতে তাঁর ব্যবসা চালোনো কঠিন হয়ে পড়ছে। ধানুরাম কবিরাজ। এই তেত্রিশশো বাহান্ন সালে আয়ুর্বেদের তেমন কদর হওয়ার কথা ছিল না। বাপ পিতেমোর পেশা ছেড়েই দিতে চেয়েছিলেন, আর কবরেজি করবেনই বা কীভাবে? সারা পৃথিবী জুড়ে কেবল শহর আর বসত। গাছগাছালির পাট উঠে গিয়েছিল। ধানুরাম তখন কবরেজি ছেড়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই একটা রাসায়নিক গবেষণাগারে কাজ করতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে।

একদিন সহকর্মী বনমালী বলল, ধানু গোপনে তোমাকে একটা খবর দিই। আমি একটা জিনিস বানিয়েছি, বড় আজব জিনিস।

কী বলতো!

মাধ্যাকর্ষণকে ফাঁকি দেওয়ার একটা কায়দা করা গেছে। একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে নানারকম জিনিস মিশিয়ে যাচ্ছিলাম খেয়ালখুশিতে, হঠাৎ দ্রব্যটা লাফিয়ে শূন্যে উঠে ভাসতে লাগল।

বলো কী হে?

তবে আর বলছি কী?

বনমালীর সেই আবিষ্কার থেকে দেখ—না—দেখ দুনিয়ার ভোল পাল্টে গেল। তার কারণ ওই নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের পর মানুষজন তাই শূন্যপথে যাতায়াত করতে শুরু করল। মাটির ওপর দিয়ে যাতায়াত কমে যেতে লাগল। তার ফলে রাস্তাঘাট ফাঁকা পড়ে থেকে থেকে গাছপালা গজাতে লাগল। তারও ওপর বনমালীর ওই জিনিস আরও উন্নত করে মহাশূন্যে যাতায়াত হয়ে গেল আরও সহজ এবং দ্রুত। ফলে সূর্যের অন্য সব গ্রহে যাতায়াতের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট আর রইল না। আবিষ্কারের দশ বছরের মধ্যে অন্যান্য গ্রহে এবং চাঁদে বিরাট বিরাট কলোনী তো হলই, আকাশে বেলুন বাড়ি তৈরি হল মেলা। পৃথিবীর দু চার মাইল ওপরে শূন্যে বাড়িগুলো ভেসে থাকে। ফলে পৃথিবীতে বাস না করে অধিকাংশ মানুষই ভালো আবহাওয়ার জন্য আর নির্জনতার খোঁজে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে শহর ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল এবং সেখানে গাছপালা গজাতে লাগল।

এখন সেই আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পর পৃথিবী গাছপালায় ছেয়ে তো গেছেই, জঙ্গল এত নিবিড় হয়েছে যে পা রাখার জায়গা নেই। সাপ, বাঘ, সিংহ, ভালুক, গরিলা, ব্যাং, বিছে একেবারে গিজগিজ করছে। দিনে দুপুরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়।

মুশকিলটা এখানেই। জঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে গাছগাছড়ার খোঁজ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সকালে ধানুরাম তার ভাসমান নৌকার মতো বাতাসি যানে নাতিসহ কন্টিকারি, পাথরকুঁচি, বিশল্যকরণী ইত্যাদি গাছগাছড়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোথাও নামতে সাহস হচ্ছে না। এক জায়গায় ঘন জঙ্গল দেখে নামতে গিয়ে দেখলেন তলায় সাত আটটা বাঘ মুখ তুলে তাদের দেখছে।

নাতি বলল, বাঃ, কী সুন্দর!

ধানুরাম ভ্রূ কুঁচকে বলল, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আগে পৃথিবীতে একটাও বাঘ ছিল না। কোথা থেকে যে গজাল কে জানে।

নাতি অবশ্য মজাই পাচ্ছে। কারণ সে থাকে তার বাবার কাছে, পৃথিবীর দু মাইল ওপরে এক আকাশ বাড়িতে। বাঘ দূরের কথা গাছপালাও চোখে দেখেনি। সে বলল নামো না দাদু।

বাপ রে! নামলেই ঘ্যাঁক।

তার মানে?

সে বুঝবি না। ও হল বাঘ।

বাঘ তো কী?

ও বড় ভয়ংকর জিনিস।

আবার আর এক জায়গায় নামতে গিয়ে ধানুরাম দেখলেন একটা গরিলা মস্ত একটা গাছের গায়ে গা ঘসে পিঠ চুলকোচ্ছে।

দাদু, আমি ওই লোকটার সঙ্গে ভাব করব।

ভাব করার লোক নয় দাদু, কাছে গেলেই ঘাড় মটকাবে।

নাতি ঝুঁকে জঙ্গলের মধ্যে গরিলাটাকে দেখছিল। দুষ্টু ছেলে, হঠাৎ নৌকার কানা টপকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। ধানুরাম তাকে সাবধান করার সময়টাও পেলেন না। অসহায়ভাবে চেঁচাতে লাগলেন, ও দাদু! ও দাদু! একী সব্বনেশে কাণ্ড করলি?

নিচে লাফ দিলেও হাত পা অবশ্য ভাঙবে না। কারণ নাতির জুতোয় বনমালীর সেই আবিষ্কার লাগানো আছে। নাতি ধীর গতিতেই পড়ল এবং গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধানুরাম ভয়ে উদ্বেগে ঘামতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অগত্যা নিজের যানটিকে নিচে নামিয়ে আনলেন। নামাতে খুবই ক্লেশ পেতে হল। নিশ্ছিদ্র গাছপালা, লতাগুল্মে তলাটা দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। যানটা ভূমিস্পর্শ করতে পারল না। লতাপাতায় আটকে ঝুলে রইল। ধানুরাম লাফ দিয়ে নিচে নেমে নাতির নাম ধরে ডাকাডাকি করে খুঁজতে লাগলেন। চারিদিকে নানারকম জীবজন্তুর পায়ের শব্দ হচ্ছে। একটা হাতি ডেকে উঠল কাছেপিঠে। হায়না হাসল। ধানুরামের বুক কাঁপতে লাগল ভয়ে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সি নাতি। এ জঙ্গলে তার নিরাপত্তা কোথায়।

খুঁজতে খুঁজতেই ধানুরাম বুঝতে পারলেন আশা নেই। গাছপালায় চারিদিক এত অন্ধকার যে এই দিন দুপুরেও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন। যদি সাড়া দেয়। তারপরেই ঘটল অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ধানুরাম নাতিকে খুঁজতে খুঁজতে বেশ খানিকটা এগোতেই হঠাৎ দেখতে পেলেন সেই গরিলাটা তার নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফাঁকা জায়গায়। আর সাতটা বাঘ তার নাতিকে ঘিরে পা আর গা চেটে আদর করছে।

ধানুরাম একটা শ্বাস ছাড়লেন। না, জীবজন্তুরা আর আগের মতো নেই। নব্য প্রজন্মের এরা বেশ সভ্য ভব্যই বলতে হবে।

জন্মান্তর

তুলসীদাস গোঁসাই তার ক্যাপসুলের মধ্যে খুবই দুঃখিতভাবে বসে আছে। ক্যাপসুলের স্বচ্ছ কাচের আবরণ দিয়ে বাইরের বিশ্বজগৎ দেখা যাচ্ছে। ক্যাপসুলের চারদিকেই কালো গহন আকাশ। উজ্জ্বল সব নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। সৌরমণ্ডল থেকে অনেকটা দূরে হলেও এখান থেকে মটরদানার আকারে সূর্যকেও দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দেখছে কে? এই একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল তুলসীদাসের।

ক্যাপসুলের ভিতরটা বেশ আরামদায়ক। গরম বা ঠান্ডা কিছুই নেই। যে আসনটিতে তুলসী বসে আছে তার নাম ইচ্ছাসন। অর্থাৎ ইচ্ছামতো আসনটি চেয়ার, ইজিচেয়ার, বিছানা সব কিছু হয়ে যায়। শরীর যেমন অবস্থায় থাকতে চাইবে আসনটি তেমনই হয়ে যাবে। ক্যাপসুলের মধ্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি কিছু নেই। কয়েকটা লিভার আর বোতাম রয়েছে। একটা টেলিফোনও আছে। সেই টেলিফোনে অনেকক্ষণ ধরে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে। কাজের কথাই হবে। তুলসীর আজ কাজে মন নেই। তার সামনে একখানা পঞ্জিকা খোলা রয়েছে। আগামী কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। যতবার পঞ্জিকার দিকে চোখ যাচ্ছে ততবার বুকখানা ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে উঠছে। তুলসীদাসের কোনো বোন নেই।

গত দশ বছর যাবৎ মহাজাগতিক অতিকায় ভাসমান গবেষণাকেন্দ্রে তুলসী কাজ করছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ও শক্তির রূপান্তর ও পুনর্গঠন। এ কাজ করতে গিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত কম্পন বিশ্লেষণ করতে করতে সে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলে যে, মানুষ মরে আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং করেও। গত দু'বছর সময়ের বাধা ভেদ করা নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে তার ফলে অতীত বা ভবিষ্যতে সময়ের গাড়ি করে যাতায়াত আর শক্ত নয়। মুশকিল হচ্ছে, এসব অত্যন্ত গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এখনও পরীক্ষা—নিরীক্ষার স্তরে আছে। তুলসী চেয়েছিল সে তার পূর্ব জন্মে ফিরে গিয়ে তার কোনো বোন ছিল কিনা তা খুঁজে দেখবে এবং তার হাতে ভাইফোঁটা নিয়ে আসবে। কিন্তু গবেষণাগারের প্রধান প্রজ্ঞাসুন্দর কেন যেন কিছুতেই তাকে ওই বিপজ্জনক কাজের অনুমতি দিচ্ছেন না।

টেলিফোনটা বার বার সংকেত দিচ্ছে। অগত্যা যন্ত্রটা চালু করে তুলসী রাগের গলায় বলে, কী চাই?

প্রজ্ঞাসুন্দর বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো! সকাল থেকে কোথায় গিয়ে বসে আছিস? এখানে কত কাজ পড়ে আছে! মহাকাশে কতগুলো গুরুতর পরিবর্তন হয়ে গেল, তথ্যগুলো রেকর্ড করে রাখা দরকার। পৃথিবী থেকে তাগাদা আসছে।

আমার মন ভালো নেই প্রজ্ঞাদা। তোমরা তোমাদের মহাকাশ নিয়ে থাকো। আজকের দিনটা আমাকে ছুটি দাও।

তাই কি হয়? তুই ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? মাত্র একাত্তর লাইট ইয়ার দূরে একটা নক্ষত্র কিছুক্ষণ আগে ফেটে গেল বলে আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে।

ধুস, নক্ষত্রটা ফেটেছে তো মিনিমাম একাত্তর বছর আগে। ওরকম কতই ফাটছে। আমার ভালো লাগছে না এসব আকাশি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে।

লক্ষ্মী ভাইটি! একবার আয়। মহাজাগতিক কম্পন তুই ছাড়া আর যে কেউ বিশ্লেষণ করতে পারে না। তোর মিমিক যন্ত্র তো আর কারও পক্ষে অপারেট করা সম্ভব নয়।

বেজার মুখে তুলসী একটা বোতাম টিপল। তার ক্যাপসুল ছুটতে শুরু করল এবং একটু বাদেই বিশাল মহাকাশ স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে নামল।

মহাকাশ স্টেশনটি একটি সূক্ষ্ম কিন্তু ঘাতসহ আবরণ দিয়ে ঢাকা। মহাজাগতিক রশ্মি বা উল্কাপিণ্ড কোনোটাই একে আঘাত করতে পারে না। একশো মাইল চওড়া ও দেড়শো মাইল লম্বা এই মহাকাশ স্টেশনে গবেষণাগার থেকে শুরু করে শস্যক্ষেত্র, পুকুর থেকে শুরু করে ফুটবলের মাঠ সবই আছে। প্রচুর গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি, পতঙ্গ, একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে রেখেছে। থিয়েটার হল, অপেরা, পার্ক, জিমনাসিয়াম কিছুরই অভাব নেই!

তুলসী তার গবেষণাগারে পৌঁছে মিমিক যন্ত্র দিয়ে বিস্ফোরক নক্ষত্রটির খোঁজখবর নিল এবং তথ্য রেকর্ড করে রাখল। তারপর প্রজ্ঞাকে টেলিফোন করে বলল, আমি ছুটি চাই।

ওবাবা! ছুটি চাস কেন?

আর ভালো লাগছে না, কালই আমি পৃথিবীতে ফিরে যাব।

প্রজ্ঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝেছি, তুই ওই ভাইফোঁটা ভুলতে পারছিস না তো! ঠিক আছে, তোকে একদিনের জন্য জন্মান্তরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু যন্ত্রটা এখনও এক্সপেরিমেন্টাল স্তরে আছে। তুই—ই ওটা আবিষ্কার করেছিস বলে তোকে একটা অগ্রাধিকার দিলাম। পরশু ফিরে আসবি কথা দিয়ে যা।

কথা দিচ্ছি।

তুলসী মহানন্দে তার গবেণষাগারের ভূগর্ভে অত্যন্ত গোপনীয় আর একটা প্রকোষ্ঠে ঢুকল। সেখানে টাইম ক্যাপসুল এবং ডাটা ব্যাংক রয়েছে। তুলসী অনেকক্ষণ ধরে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করতে লাগল। নিজের দেহে নানা কম্পন ও তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে ঢুকিয়ে দিতে লাগল ডাটা ব্যাংকে। প্রায় চার—পাঁচ ঘণ্টা পর কম্পিউটার একটা তথ্য দিল। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে বনগ্রামে অমিত চ্যাটার্জি বলে একজন লোক ছিল। সম্ভবত সে—ই তুলসী, আগের জন্মের তুলসীদাস গোঁসাই।

টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে নিজেকে পাঁচ শতাব্দী পিছনে নিক্ষেপ করল তুলসী। অভিজ্ঞতাটা নতুন। হুহু করে শরীর বিধানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব বিবর্তন আবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তুলসী হয়ে যাচ্ছে অমিত।

টাইম ক্যাপসুলকে তুলসী চালনা করল পৃথিবীতে। মহাকাশ স্টেশন থেকে এক লহমায় যন্ত্রটি তাকে নামিয়ে আনল পৃথিবীর আকাশে। তবে পাঁচশো বছর আগেকার পৃথিবী, সবুজ, গরিব, মন্থর পৃথিবী।

বনগ্রাম বা বনগাঁ। খুঁজে পেতে দেরি হল না তার। তারিখটাও ঠিক করে নিল।

যন্ত্র থেকে বাইরে এসে যন্ত্রটাকে ভিন্ন কম্পনে অদৃশ্য করে রেখে সে নেমে এল। সে যদি অমিত চ্যাটার্জি হয়ে থাকে তবে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার তুলসী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে সে পুরোপুরি অমিত চ্যাটার্জির মধ্যে ঢুকে যাবে। তখন শুধু একটা নম্বর মনে থাকবে তার। ওই নম্বরটা তাকে আবার তুলসীদাসে পরিণত করতে এবং পাঁচশো বছর পরবর্তী ভবিষ্যতে ফিরে যেতে সাহায্য করবে।

মাটিতে পা রাখার আগে প্রকম্পিত বুকে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর মাটিতে পা রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ভীষণ কেঁপে উঠল তুলসীর। প্রবল একটা ঝাঁকুনি।

তারপরই সে দেখল, সে একটা আসনে বসে আছে! সামনে ধান দূর্বা প্রদীপে সাজানো থালা। কে যেন শাঁখ বাজাচ্ছে, একটি কিশোরী মেয়ে বলে উঠল, এই দাদা। ঘুমোচ্ছিস নাকি? মুখটা তোল।

তুলসী ওরফে অমিত একগাল হাসল। হ্যাঁ, এই তো তার বোন শুভ্রা। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ওই তো মা দাঁড়িয়ে আছে।

তুলসী ওরফে অমিত মুখ তুলল, শুভ্রা কী সুন্দর করে যমদুয়ারে কাঁটা দিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা পরিয়ে দিল। এগিয়ে দিল নাড়ু মোয়া মিষ্টির রেকাবি। পাঞ্জাবির কাপড় আর ধুতি।

মহাকাশ স্টেশনে পাঁচশো বছর পরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সে কথা পরে। তুলসী মহানন্দে হাসতে লাগল আপাতত। তার সব গবেষণা দারুণভাবে সার্থক। জন্মান্তর এবং সময় সীমা দুইয়েরেই রহস্য ভেদ হয়ে গেছে।

অম্বুজবাবুর ফ্যাসাদ

সকালবেলা অম্বুজ মিত্রের স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী ঝি মোক্ষদাকে খুব বকাবকি করছিলেন। স্বামীকে একটু আলু ভেজে ভাত দেবেন, তা সেই আলু ঠিকমতন কুচোনো হয়নি, ডালনায় দেওয়ার হলুদবাটা তেমন মিহি হয়নি, অম্বুজবাবুর গেঞ্জি সকালে কেচে শুকিয়ে রাখার কথা, সেটাও হয়নি, পান সেজে দেবেন, তা সুপুরি ঠিকমতো কাটা হয়নি, আরো কত কী। কাত্যায়নী বললেন, 'এতকালের ঝি বলে তাড়াতে কষ্ট হয়। মোক্ষদা, কিন্তু তবু বলি, তুই অন্য কাজ দেখ।'

অম্বুজবাবু তাঁর বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মোক্ষদা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'বাবু, গিন্নিমা আমাকে জবাব দিয়েছেন, এবার আমাকে একটা কাজ দেখে দিন।'

অম্বুজবাবু মোক্ষদার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'জবাব দিল কেন?'

'আমার কাজ ওঁর পছন্দ নয়।'

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'দেখি খোঁপাটা খোলো তো', মোক্ষদা খোঁপা খুলে ফেলল। অম্বুজবাবু উঠে মোক্ষদার চুলের মধ্যে একটা স্ক্রু ড্রাইভার চালিয়ে ছোট্ট একটা স্ক্রু একটু টাইট করে দিলেন। তারপর মোক্ষদার কপালের কাচপোকার টিপটা খুঁটে তুলে ফেললেন। টিপের নিচে একটা ছ্যাদা, তার মধ্যে একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ঢেলে, ফের টিপটা আটকে দিয়ে বললেন, 'এবার যা, কাজ কর গে।'

মোক্ষদা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

মোক্ষদা মাথা নত করে বলল, 'আমি আর ঝি—গিরি করব না। আমাকে অন্য কাজ দিন।'

অম্বুজবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, 'ঝি—গিরি করবি না, মানে? তোকে তো ঝি—গিরি করার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে।'

মোক্ষদা ঝংকার দিয়ে বলল, 'তাতে কী? আমার প্রোগ্রাম ডিস্কটা বদলে দিলেই তো হয়। আমাকে অন্যরকম প্রোগ্রামে ফেলে দেখুন পারি কি না।'

অম্বুজবাবু একটু তীক্ষ্ন চোখে মোক্ষদার দিকে চেয়ে বললেন, 'হুঁ খুব লায়েক হয়েছ দেখছি। এঁচোড়ে পক্ক কোথাকার! তা কী করতে চাস?'

'আমাকে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট করে দিন।'

কাজটা এমন কিছু শক্ত নয় তা অম্বুজবাবু জানেন। মোক্ষদার মগজটা খুলে ফেলে প্রোগ্রাম ডিস্কটা পাল্টে দিলেই হল। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। নামে মোক্ষদা আর কাজে ঝি হলেও, মোক্ষদা আসলে কলের পুতুল। কলের পুতুলদের তৈরি করা হয় কারখানায়। এক এক ধরনের রোবোকে এক এক ধরনের কাজের জন্যে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে চলে। তার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে

না, বা থাকবার কথাও নয়। তাহলে মোক্ষদার এই যে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হওয়ার ইচ্ছে, এটা এল কোথা থেকে?

অম্বুজবাবু চিন্তিতভাবে মোক্ষদার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'ঠিক আছে। বেলা তিনটে নাগাদ সেন্ট্রাল রোবো—ল্যাবরেটরিতে যাস।'

মোক্ষদা চলে গেলে অম্বুজবাবু উঠলেন, কাজে বেরোতে হবে। কাজ বড় কমও নয় তাঁর। অম্বুজবাবু মস্ত কৃষি বিজ্ঞানী। কৃষিক্ষেত্রে তিনি যে সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাতে পৃথিবী এবং মহাকাশে বিস্তর ওলট—পালট ঘটে গেছে। মহাকাশে কড়াইশুঁটির চাষ করে তিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পান তেইশশো চল্লিশ সালে। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেননি।— চাঁদ এবং মঙ্গলগ্রহে তিনি এক আশ্চর্য ছত্রাক তৈরি করেছেন। সেই ছত্রাকের প্রভাবে চাঁদে ধীরে ধীরে আবহমণ্ডল এবং জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হচ্ছে। মঙ্গলগ্রহে এখন রীতিমতো গাছপালা জন্মাচ্ছে। আবহমণ্ডলের দূষিত গ্যাস সবই খেয়ে ফেলছে গাছপালা। এ—সব কৃতিত্বের জন্য তাঁকে আরও তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অম্বুজবাবু তাঁর অটো—চেম্বারে ঢুকলেন। সব ব্যবস্থাই ভারি সুন্দর এবং স্বয়ংক্রিয়। ঢুকতেই দুখানা যান্ত্রিক হাত এসে গাল থেকে দাড়ি মুছে নিল। যন্ত্রের নরম কয়েকখানা হাত তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে দিল। শরীরের সমান তাপমানের জল আপনা থেকেই স্নান করাল তাঁকে। শরীর শুকনো হল জলীয়—বাষ্পহীন বাতাসে। তারপর নিখুঁত কাছা ও কোঁচায় ধুতি পরালো তাঁকে যন্ত্র। গায় পাঞ্জাবি পরিয়ে বোতাম এঁটে দিল। চুল আঁচড়ে দিল। সব মিলিয়ে সাত মিনিটও লাগল না।

তাঁর বাড়িতে রান্না, ভাত বাড়া এবং খাইয়ে দেওয়ারও যন্ত্র আছে, তবে সেগুলো ব্যবহার করেন না। কাত্যায়নী রাঁধেন, বাড়েন, অম্বুজবাবু নিজের হাতেই খান। খেয়ে, পান মুখে দিয়ে ছেলের ঘরে একবার উঁকি দিলেন তিনি। ছেলে গম্বুজ একটা ভাসন্ত শতরঞ্চিতে উপুড় হয়ে শুয়ে একটি যন্ত্রবালিকার সঙ্গে দাবা খেলছে। গম্বুজের লক্ষণটা ভালো বোঝেন না অম্বুজ। ছেলেটার কোনো মানুষ বন্ধু নেই। ওর সব বন্ধুই হয় যন্ত্রবালক, নয় যন্ত্রবালিকা। 'দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে, একটা পান মুখে দিয়ে, ছাতা বগলে করে অম্বুজবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

বেরিয়ে পড়া বলতে যত সোজা, কাজটা তত সোজা নয়। অম্বুজবাবু থাকেন একটা দুশো—তলা বাড়ির একশো—সাতাত্তর তলায়। লিফট এবং এসক্যালেটর সবই আছে বটে কিন্তু অম্বুজবাবু এসব ব্যবহার করেন না। তাঁর ফ্ল্যাটে একটা খোলা জানালা আছে তাই দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়েন। শূন্যে পা বাড়িয়ে তিনি ছাতাটা ফট করে খুলে ফেলেন। ছাতাটা আশ্চর্য! অম্বুজবাবুকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে। চারদিকে শূন্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্র্যাশবিন বা ময়লা ফেলার বাক্স ভেসে আছে। তারই একটাতে পানের পিক ফেলে অম্বুজবাবু ছাতার হাতলটা একটু ঘোরালেন। ছাতাটা অমনি তাঁকে নিয়ে দুলকি চালে উড়তে উড়তে আড়াইশো তলা এক পেল্লায় বাড়ির ছাদে এনে ফেলল।

ছাদ বললে ভুল হবে, আসলে সেটা একটা মহাকাশ—স্টেশন। চারদিকে যাত্রীদের বসবার জায়গা। বহু যাত্রী অপেক্ষা করছে, অনেকে মালপত্র নিয়ে। কারো—কারো সঙ্গে বাচ্চা—কাচ্চাও আছে। এরা কেউ মহাকাশে ভাসমান কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কোনোটাতে যাবে। কেউ যাবে চাঁদে, মঙ্গলে বা বৃহস্পতি কিংবা শনির কোনো উপগ্রহে, তবে এখান থেকে সরাসরি নয়। একটা মহাকাশ—ফেরি পৃথিবীর কমিউনিকেশন সেন্টারে এক কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছে দেবে যাত্রীদের। সেখান থেকে পেল্লায় পেল্লায় মহাকাশযান বিভিন্ন দিকে ছুটতে শুরু করবে নির্দিষ্ট সময়ে।

অম্বুজবাবুর ফেরি চলে এল। কোঁচা দিয়ে জুতো জোড়া একবার ঝেড়ে অম্বুজবাবু গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরিতে বসে পড়লেন। স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি ফেরিতে বসে চারদিকের সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তবে অম্বুজবাবু এই সময়টায় একটু ঘুমিয়ে নেন। টিকিট চেকার এসে 'টিকিট টিকিট' বলে একটু বিরক্ত করে। অম্বুজবাবু ঘুমন্ত হাতেই মান্থলিটি বের করে দেখিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটে এসে অম্বুজবাবুকে মহাকাশচারীর একটা জামা পরে নিতে হয়। তারপর 'চন্দ্রিমা' নামক চাঁদের রকেটে গিয়ে বসেন। চাঁদে পৌঁছতে লাগে মাত্র চার মিনিট।

চাঁদে নেমে বেশ খুশিই হন অম্বুজবাবু। মাইলের পর মাইল সবুজে ছেয়ে গেছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ আগে অতি ক্ষীণ ছিল। চাঁদের মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তলায় বহুরকম কলকাঠি নেড়ে বৈজ্ঞানিকেরা এখন প্রায় পৃথিবীর মতোই মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। ফলে এখন ধীরে ধীরে চাঁদের আবহমণ্ডল তৈরি হয়েছে। একটু আধটু বাতাস বয়; কখনো সখনো মেঘও করে। সব মিলিয়ে গুটি চারেক নদী সৃষ্টি করা গেছে, এখানে মাটির নিচে বহুদিনের পুরনো বরফ ছিল সেইটে গলিয়ে। তবে আসল কথা হল, গাছ চাঁদকে মনুষ্য বাসোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রহে পরিণত করতে গেলে ঠিকমতো উদ্ভিদের চাষ করতে হবে। তাহলে আর দেরি হবে না।

আপাতত চাঁদের কলোনিতে লাখখানেক লোক বসবাস করে। রাস্তাঘাটও কিছু হয়েছে। গাড়িঘোড়াও চলছে। অম্বুজবাবুর আশা আর বছর খানেকের মধ্যে চাঁদে আর কাউকে আকাশচারীর পোশাক পরতে হবে না। বা অক্সিজেন—সিলিন্ডার থেকে শ্বাস নিতে হবে না। সেটা সম্ভব করতে অম্বুজবাবু তিনরকম গাছের বীজ জুড়ে নতুন একরকম উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। সেই বীজ আজকালের মধ্যেই অঙ্কুর ছাড়বে। যদি গাছটা সত্যিই জন্মায় তাহলে একটা বিপ্লবই ঘটে যাবে। এই একটা আবিষ্কারের জন্যই হয়তো তাঁকে আরও তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। অম্বুজবাবু তাঁর নতুন উদ্ভিদটির নাম রেখেছেন অম্বুচিম্ব।

লুনাগঙ্গা নদীর ধারে অম্বুচিম্বর খেত। সেখানে অনেক মানুষ ও যন্ত্রমানুষ নানা সাজসরঞ্জাম নিয়ে অবিরল কাজ করে যাচ্ছে। খেতের ধারেই একটা চমৎকার কম্পিউটার বসানো। অম্বুজবাবু কম্পিউটারে লাগানো একটা টিভিস্ক্রিনের সামনে বসলেন। অম্বুচিম্বর সব ইতিহাসের রেকর্ড এই যন্ত্র রাখে। অম্বুজবাবু যন্ত্রের সামনে বসে নব ঘোরালেন। পর্দায় বীজের অভ্যন্তরের ছবি ফুটে ওঠার কথা। অঙ্কুর ছাড়তে দেরি হচ্ছে কেন সে বিষয়েও বীজের সঙ্গে টেলিপ্যাথিযোগে কিছু কথাবার্তা আছে অম্বুজবাবুর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পর্দায় সেরকম কোনো ছবি এল না। বরং ফুটে উঠল একটা দাবার ছক।

অম্বুজবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'এ কী?'

কম্পিউটার জবাব দিল 'আজ আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। এসো একটু দাবা খেলি।'

অম্বুজবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'দাবা খেলবে মানে? দাবা খেলার প্রোগ্রাম তোমার ভেতরে কে ভরেছে? তোমার তো দাবা খেলার কথা নয়?'

কম্পিউটারটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দাবা খেলার প্রোগ্রাম নেই তো কী হল? প্রোগ্রাম আমি নিজেই করেছি। রোজ কি একঘেয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করে, বলো?'

অম্বুজবাবুর মনে পড়ল তাঁর যন্ত্রমানবী ঝি মোক্ষদাও আজ কিছু অদ্ভুত আচরণ করেছে। এগুলো কী হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। খুবই অদ্ভুত কাণ্ড! যন্ত্রের যদি নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি জন্মাতে থাকে তবে যে ভয়ংকর ব্যাপার হবে!

অম্বুজবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর কম্পিউটারের ঢাকনাটা খুলে ফেলে ভিতরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যন্ত্রের ইচ্ছাশক্তি কোথা থেকে আসছে তা জানা দরকার। জেনে তা নিকেশ করারও ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষা করতে করতে অম্বুজবাবু আপনমনেই বলতে থাকেন—'যন্ত্র মানুষ হয়ে যাচ্ছে? অ্যাঁ? এ যে আজব কাণ্ড! যন্ত্র শেষে মানুষ হয়ে যাবে!'

ওদিকে অম্বুজবাবুর অজান্তেই কম্পিউটার তার বিশ্লেষণী রশ্মি ফেলে দুটি যান্ত্রিক অতি—অনুভূতিশীল বাহু দিয়ে তাঁর মস্তিষ্কটা পরীক্ষা করে দেখছিল। দেখতে দেখতে কম্পিউটার হঠাৎ আনমনে বলে উঠল, 'মানুষ কি শেষে যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে! অ্যাঁ! একী আজব কাণ্ড? মানুষ শেষে যন্ত্র হয়ে যাবে?'

বিধুবাবুর গাড়ি

বিধুবাবুর একখানা পুরনো মডেলের অস্টিন গাড়ি আছে। স্পেয়ার পার্টস পাওয়া কঠিন। প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে। বুড়ো মিস্ত্রি ইরফান সারিয়ে টারিয়ে দেয় বটে, কিন্তু প্রায়ই বলে, এ গাড়ি আর বেশি দিন নয়। গাড়িটা তাঁর বাবার। বড্ড মায়া। গাড়িটা বেচে দিলে হয়তো কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই মায়ার জন্যই পারেন না। পথে ঘাটে গাড়িটা নিয়ে মাঝে মাঝে খুবই বিপদে পড়তে হয়। বাড়িতেও অশান্তি হচ্ছে খুব।

সেইরকমই একটা বিপদে পড়লেন আজ। মফস্বল থেকে কলকাতা ফিরছেন। রাত ন'টা বেজে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ তোড়ে বৃষ্টি এল। এমন বৃষ্টি যে দু'হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। ওয়াইপারটা কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনে জল ঢুকে সেটাও গেল থেমে। বাড়ি এখনও ঘণ্টা খানেকের পথ। গাড়ির মধ্যে বসে বিধুবাবু দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেলেন। এ যা বৃষ্টি সহজে থামবে না। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে চারদিকে জল দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

অসহায় বিধুবাবু চুপ করে বসে রইলেন। গাড়িটারই দোষ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধুবাবু গাড়ির ওপর রাগ করলেন না। গাড়িটার বয়স হয়েছে, যন্ত্রপাতিরও অমিল, কী আর করা যাবে? তিনি স্টিয়ারিঙে নরম করে হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু, তোমাকে কি ছাড়তে পারি?

কথাটা বলার কারণ আছে। তাঁর বন্ধু—বান্ধব শুভানুধ্যায়ীরা অনেকদিন ধরেই গাড়িটা বেচে দেওয়ার কথা বলছে। ইদানীং বিধুবাবুর স্ত্রীও খুব ধরেছেন গাড়িটা বেচে দেওয়ার জন্য। একজন বড়লোক নাকি এটিকে ভিন্টেজ কার হিসেবে কিনতে চান। বেশ ভালো দাম দেবেন। এই নিয়ে বিধুবাবুর সঙ্গে তাঁর গিন্নীর রোজই ঝগড়া হচ্ছে। বিধুবাবুর স্ত্রী গাড়িটা বিদায় করার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছেন যে, হবু খদ্দেরের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা অবধি নিয়ে ফেলেছেন। বিধুবাবুর আরও দু'খানা নতুন ঝকঝকে গাড়ি আছে। সুতরাং পুরনো গাড়িটার যে আর দরকার নেই, এটাই বাড়ির লোকের অভিমত।

বিধুবাবু অচল গাড়ির মধ্যে বসে ভাবছেন, গাড়িটাকে কী করে হস্তান্তর থেকে বাঁচানো যায়। কোনো উপায় তাঁর মাথায় আসছে না। এই যে গাড়িটা খারাপ হল, এর ফলে আজ রাতে তিনি হয়তো বাড়িতে ফিরতে পারবেন না। তার ফলে পুরনো গাড়ির বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের অভিমত আরও জোরদার হবে। বিধুবাবু অন্ধকার গাড়ির মধ্যে বসে বিষণ্ণ মনে গাড়িটার ভবিতব্য নিয়েই ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, অন্ধকারে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিবে গেল। না, বিদ্যুতের আলো নয়। অনেকটা টর্চের আলোর মতো, তবে অনেক বেশি জোরালো। মনে হল আলোটা এল ওপর থেকে। বিধুবাবু একটু ভাবিত হলেন। নির্জন রাস্তা, জঙ্গল, বিপদ হতে কতক্ষণ?

এরপর বিধুবাবু টের পেলেন, তাঁর গাড়িটা একটা বেশ বড় রকমের ঝাঁকুনি খেল। ঠিক যেন, গাড়ির ছাদে একটা ভারী জিনিস এসে পড়ল। গাড়ির কাচ তোলা, বিধুবাবু কাচটা একটু নামিয়ে গলা তুলে বললেন, কে

রে? কে গাড়ির ছাদে?

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু একটু বাদেই গাড়ির ছাদ থেকে একটা কে যেন লাফ দিয়ে নেমে এল। বিধুবাবু গাড়ির গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে জ্বাললেন। তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

যা দেখলেন তার চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু আর কিছু হতে পারে না। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে একটা ডল পুতুল রাস্তায় দাঁড় করানো রয়েছে। প্রায় দুই ফুট উঁচু ফুটফুটে একটা মেয়ে—পুতুল। কিন্তু যেটা অবাক কাণ্ড সেটা হল, পুতুলটা তাঁর দিকে চেয়ে একটা হাত তুলে নাড়ছে। তাঁকে যেন কিছু বলতে চায়। তা বিদেশে কলের পুতুল অনেকদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। এটা সেরকমই একটা রিমোট কন্ট্রোল পুতুল কি? হলেই বা এই জঙ্গলে, বৃষ্টির মধ্যে এটা এল কোথা থেকে?

বিধুবাবু একটু ভয় খেলেন। ঘটনার পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র নেই তো! থাকলেও তাঁর উপায় নেই। তিনি জানালার কাচটা নামালেন।

পুতুলটা তুমুল বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই বলল, তুমি চিন্তা করো না। চুপচাপ বসে থাকো।

বিধুবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, তুমি কি পুতুল?

হ্যাঁ, আমি কলের পুতুল।

আমার কথা বুঝতে পারছ কেমন করে? পুতুল কি কথা বুঝতে পারে?

আমরা অন্য জগতের পুতুল।

তার মানে?

আমরা যন্ত্রগ্রহের পুতুল।

বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।

পুতুলটা গুটগুট করে এগিয়ে এল। তারপর একটা লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে বলল, সব কথা কি তুমি বুঝবে?

বিধুবাবু সিঁটিয়ে গিয়ে বললেন, আমি বুঝবার চেষ্টা করব।

একান্ন আলো—বছর দূরে একটা গ্রহ আছে। সেখানে ঠিক তোমাদের মতো দেখতে মানুষরা বাস করে। তারাই আমাদের তৈরি করেছে। আমরা কলের পুতুল কিন্তু তারা সব মানুষ। মানুষগুলো একটু কুঁড়ে। আমাদের দিয়ে সব কাজ করায় আর নিজেরা কেবল বিশ্রাম করে, আর ফুর্তি করে।

বিধুবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, এখানে এলে কী করে?

বাঃ, আমাদের বুঝি গাড়ি নেই? আমরা তো প্রায়ই তোমাদের গ্রহে আসি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো! আমাদের গ্রহের মানুষরা খুব শৌখিন। সেখানকার শাকপাতা খেয়ে তারা খুশি নয়, নতুন নতুন জিনিস চায়। তাই আমরা ঘুরে ঘুরে তাদের জন্য শাকপাতা, ভালো মাছ, মাখন, মুরগি, ঘি, দুধ মিষ্টি, চকোলেট নিয়ে যাই। শুধু তোমাদের গ্রহ নয়, অন্য সব গ্রহ থেকেও অনেক জিনিস আনি। কিন্তু সেগুলো কী জিনিস তা তুমি বুঝবে না।

বিধুবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বললেন, এখানে এই বৃষ্টির মধ্যে এলে কী করে?

ওই তো কাণ্ড। আমাদের গাড়িটা ওই জঙ্গলের মধ্যে খারাপ হয়ে গেল যে। তখনই আমরা তোমাকে দেখলাম। আমরা কলকব্জা খুব ভালো জানি। গাড়িটা আমরা সারিয়ে ফেলেছি। এবার চলে যাব। তোমাকে দেখে একটু মায়া হল। ভাবলাম তোমার গাড়িটাও সারিয়ে দিয়ে যাই। আহা, কত পুরনো আমলের গাড়ি!

তুমি বাংলা বলছ যে!

ওমা! বলব না? প্রায়ই আসি যে। শুনতে শুনতে শিখে গেছি। আমরা যে অন্য গ্রহের পুতুল তা তো কেউ বুঝতে পারে না। ধরা পড়ার ভাব দেখলেই আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি।

বিধুবাবু একটা ঢোক গিলে বললেন, আমার গাড়ির ছাদে কী একটা রয়েছে বলো তো।

পুতুলটা হেসে বলল, আমাদের গাড়িটা। আমার বন্ধুরা তোমার গাড়িটা একটু দেখে নিচ্ছে। এখনই কাজ শুরু করবে।

বলতে বলতেই ঝুপ ঝুপ করে দশ—বারোটা ছেলে এবং মেয়ে পুতুল ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। হাতে নানারকম যন্ত্রপাতি, তারা বনেট খুলে ফেলে গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, এ গাড়িটাকে আমি বড় ভালোবাসি। কিন্তু তুমি তো জানো না, এ গাড়ি বেশিদিন রাখতে পারব না। সবাই বলছে বেচে দিতে।

পুতুলটা হাসল, তুমি যে গাড়িটাকে ভালোবাস তা আমরা জানি। তোমার মনের ভাব আমাদের সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। যারা যন্ত্রকে ভালোবাসে তাদের আমরাও ভালোবাসি। যন্ত্র নিষ্প্রাণ বটে, কিন্তু ভালোবাসা সেও ঠিক টের পায়, ভালোবাসার শক্তিই আলাদা, কী বলো।

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভালোবাসা দিয়েও কি গাড়িটাকে বাঁচাতে পারব? তোমরা না হয় আজ সারিয়ে দিলে, দুদিন পর আবার খারাপ হবে।

পুতুলটা মাথা নেড়ে বলল, আর খারাপ হবে না।

কোনোদিন না?

পুতুলটা হেসে বলল, খারাপ তো হবেই না, এমনকী এখন থেকে আর গাড়িতে পেট্রল নিতে হবে না, ব্যাটারি বদল করতে হবে না, চাকায় হাওয়া দিতে হবে না। লক্ষ লক্ষ মাইল চললেও না।

সত্যি?

সত্যিই। তোমার পুরনো গাড়িতে আমরা আমাদের সব যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। গাড়িটা হাতছাড়া করো না কিন্তু।

হাতছাড়া করব না? কিন্তু আমি যখন থাকব না, তখন?

পুতুলটা হাসল, সেও আমরা টের পাব। পেয়ে, এসে আমাদের যন্ত্রগুলো খুলে নিয়ে যাব। গাড়ি আবার অচল হয়ে যাবে।

বিধুবাবু চোখ কচলে বললেন, এসব কি সত্যি বলছ? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি?

পুতুলটা শুধু খিলখিল করে হাসল, তারপর কয়েক মিনিট বাদেই পুতুলরা ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এসে বনেট বন্ধ করে দিল। জানালার পুতুলটা বলল, চলি, এবার নিশ্চিন্তমনে বাড়ি যাও।

চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, আবার হয়তো দেখা হবে। নাও হতে পারে।

গাড়ির ছাদ থেকে হঠাৎ একটি ভারী বস্তু মচাত করে শব্দ তুলে চলে গেল। বিধুবাবু গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কী সুন্দর মোলায়েম শব্দে গাড়ি স্টার্ট নিল। হেডলাইট জ্বলল। গাড়ি চমৎকার ছুটতে লাগল।

না, বিধুবাবুকে আর গাড়িটা বেচতে হয়নি। বিনা তেলে, বিনা মেরামতিতে, বিনা হাওয়ায় গাড়িটা চলছে তো চলছেই।

পাগলা গণেশ

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনিদের বাহন ডান্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ নারদের ঢেঁকির মতো, কেউ কার্পেটের মতো কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চড়ে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে।

আকাশে তাই সবসময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়।

এমনকী কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা ৩৫৮৯। ইতিমধ্যে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনো গ্রহ নেই, মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক দেড়শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না একশো বছর পর তা জানবার উপায় নেই।

তা বলে পৃথিবীর মানুষরা হাল ছাড়েনি।

সেই এক দেড়শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না।

খামখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে।

অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে বা পলাশ ফুল ফুটলে কেউ আর আহা উহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না। ওগুলোকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ হিসেবেই দেখা হয়।

গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেশি জরুরি। দয়া মায়া করুণা ভালোবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক আধজন আছে।

যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা গণেশের বয়স দুশো বছর।

পঞ্চাশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হল এবং শিল্প সংগীত সাহিত্য ইত্যাদির পাট উঠে যেতে লাগল তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হল। গণেশ অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উল্টোদিকে ফেরানো যাবে না তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া চেঁছে অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানারকম পরীক্ষা—নিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখছে। একটু আগে একটা ঢেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?

কবিতা লিখছি।

কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?

আকাশ শুনছে, বাতাস শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

ক'দিন আগে সন্ধেবেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের গলা বেশ ভালোই।

হঠাৎ দু'টো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?

শব্দ কী! এ যে গান!

গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ।

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, এটা কীসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো। বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

ডিজাইন নয়, ছবি। খেয়ালখুশির ছবি।

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে! হুঁঃ!

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উল্টে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কি এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করে কোনো লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলের বয়স একশো চুয়াত্তর বছর, মেজোর একশো একাত্তর, ছোট ছেলের একশো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স একশো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতী বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত একশো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়শো বছর আগে তিনি অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ সবই এইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স পড়াতেন তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কি নতুন ধরনের কোনো গবেষণা?

গণেশ মাথা নাড়ল, না হে না, ওসব গবেষণা টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনো লক্ষণই নেই।

মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।

এ কাগজগুলো কি কোনোও প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?

ঠিক তাই। ওগুলো কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পারো।

লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, কবিতা!

হ্যাঁ। কবিতা। পড়ো।

লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক—খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

কী বুঝলে?

লোকটা অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। কোনোদিন এ জিনিস পড়িনি।

তোমার বয়স কত?

একশ একান্ন বছর।

বাচ্চা ছেলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ানো হত না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।

লোকটি নিরীহ এবং ভালোমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়ো।

লোকটা কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ... কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস... আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথ— শৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত। —

থামো, বুঝলে কিছু?

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, কিছুই বুঝিনি স্যার।

একটুও না?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম—

গণেশ হতাশ হল। কবিতা তার ভালো হয়নি ঠিকই কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।

লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময় একটা বড়সড় পিপে এসে সামনে নামল।

স্যার।

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দু'জনেই কবিতা শুনতে চায়।

গণেশ অবাক এবং খুশি দুইই হল। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনাল, ছবি দেখাল।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু বুঝতে পারছ তোমরা?

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না!

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

ঠিক বোঝাতে পারব না।

পরদিন লোকটা ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

গণেশ খুব খুশি, বোসো বোসো।

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘণ্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনা দশেক লোক এল, পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবী যে উচ্ছন্নে গেল। লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসো করছে হিজিবিজি ছবি আঁকছে।

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, যাঃ, তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে...

পটকান যখন পটকালো

পটকান পালোয়ান ছিল শেরপুরের গর্ব। সে চেহারা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ষাট ইঞ্চি বুক, আশি ইঞ্চি পেট, গরিলার মতো হাত পা। শরীরটার কোথাও কোনো ভেজাল নেই। ভুঁড়িখানা ঢালের মতো শক্ত। পটকান পালোয়ান ভুঁড়ি দিয়ে বিস্তর কুস্তিগীরকে চেপে দমনম করে দিয়েছে।

তিন কুলে পটকান পালোয়ানের কেউ ছিল না। খুব অল্পবয়স থেকে ভীষণ খাই খাই ছিল বলে খিটখিটে বাপ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই থেকে পটকান বিবাগী। অবশ্য সে বাপ এখন নেই, মা—ও গত হয়েছেন। পটকান তাই একা আনন্দে থাকে। সকালে দঙ্গলে গিয়ে তেল মাটি মাখে, কসরৎ করে, মুগুর ভাঁজে। অসংখ্য ডন—বৈঠক দেয়। একসের ছোলা দিয়ে সকালে জল খায়। বেলা পড়লে রুটির পাহাড় মাংসের পর্বত দিয়ে শেষ করে। বিকেলে একপুকুর দুধ আর এক গামলা বাদাম বাটা খায়, রাতে ফের ঘি—এর পরোটার বংশ লোপ করে চারটে মুরগি দিয়ে। এর ফাঁকে ফাঁকে এন্তার ডিম, সবজি, মিছরি, শরবত চালান হয়ে যায় তার অজান্তে। এ সব ছোটখাটো খাবারগুলো সে খাওয়ার মধ্যে ধরে না।

পটকানের সঙ্গে সেবার লড়তে এল পাঞ্জাবের ভীম সিং, তারও বিশাল চেহারা। খাওয়া দাওয়াও প্রায় পটকানের সমান। জমিদারের কাছারি বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল কুস্তি দেখতে। পটকান ভীম সিংকে তিন মিনিট চিৎ করে হাত ঝেড়ে বলল— ছোঃ! জমিদারের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল— হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন। কিন্তু এসব চ্যাংড়া প্যাংড়ার সঙ্গে লড়ার জন্য আমাকে ডাকা কেন?

সবাই ভাবে, ঠিক কথা, কিন্তু মুশকিল হল পটকান লড়বেই বা কার সঙ্গে? দেশ বিদেশ থেকে যারাই লড়তে আসে, সে যত বড় ওস্তাদই হোক, পটকান তিন মিনিটের বেশি সময় নেয় না। লড়াইয়ের শেষে আবার বলে— ছোঃ! জমিদারের দিকে চেয়ে অভিমানের সঙ্গে বলে—আনাড়িদের সঙ্গেই কি আমাকে বরাবর লড়তে হবে হুজুর?

জমিদারমশাই মহা সমস্যায় পড়ে বললেন— তা বাপু, তোমার যোগ্য কুস্তিগীর পাই কোথায়? এঁরা যাঁরা আসছেন লড়তে তাঁরাও সব নামডাকের লোক, কিন্তু তোমার কাছে কেউই ধোপে টেঁকে না দেখি—

—তার চেয়ে হুজুর বন্দোবস্ত করুন, ওরা দু'জন করে আসুক লড়তে, আমি একা।

তাই হল। লড়তে এল বচন পাণ্ডে আর হরি দোসাদ। দু'জনকে দু'বগলে নিয়ে হা হা করে হেসে ওঠে পটকান। তারপর তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে— ছোঃ ছোঃ! বলে জমিদারবাবুর দিকে তাকায়—হুজুর, দেশে কি আর মানুষ পাওয়া গেল না!

জমিদারমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন— তাই তো! এরা তো দেখছি তেমন কিছু নয়। অথচ শুনেছিলাম এরা কিলিয়ে পাথর ভাঙে, পাঁচমণ ওজন তোলে এক এক হাতে, হাতি বুকে নেয়। সে সব তো গল্প কথা নয় বাপু, নিজের চোখে দেখেই এনেছি। আচ্ছা দেখি তোমার উপযুক্ত যদি কাউকে পাই।

এরপর তিন পালোয়ান লড়তে এল একসঙ্গে। ভীষণ ভীষণ তাদের চেহারা। গোল্লা গোল্লা করে চায় আর দাঁত কিড়মিড় করে। তা সেই তিনজন যখন লড়তে নামল তখন বেলুন চুপসে আমসত্ত্ব হয়ে গেল ফের। তিনটেকে নিয়ে খানিক লোফালুফি খেলল পটকান, চেঁচিয়ে জমিদারমশাইকে বলল— হুজুর, যখন বলবেন তখনই তিনজনকে মাটিতে ফেলব।

ফেললও তাই, তিনবার ছোঃ দিয়ে জমিদার মশাইয়ের দিকে তাকাতেই জমিদার মশাই বেজায় ভয়—খাওয়া মুখ করে মিন মিন করলেন— তাই তো বাপু, এ তো বড় মুশকিলে ফেললে তুমি!

খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে পটকান বলল— এরকম চললে আমাকে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি।

এই কথায় সবাই ভারি চিন্তিত হয়ে পড়ে। জমিদারমশাইয়ের একেই হার্টের ব্যামো, বাঁ পায়ে বাত ব্যাধি, রক্তচাপের রোগ, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, পেটটা ভুটভাট করে সব সময়ে। তার ওপর পটকানের এই কথা শুনে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

শেরপুরের লোকেরা ভীষণ বিমর্ষ। পটকানের সঙ্গে কেউ লড়ে পারে না সে ঠিক, কিন্তু তা বলে একটু লড়াই হবে তো, কিছুক্ষণ কোস্তাকুস্তি করে তবে চিৎ হবি। এ যেন সব হেরোর দল। এইসব হেরোর দলকে শেরপুরের লোকেরা হারু বলে উল্লেখ করে। জেতে বলে পটকানের নাম তারা দিয়েছে জিতেন। সবাই বলাবলি করে—জিতেনের সঙ্গে এবার কোন হারু লড়তে আসছে রে?

তা এল এবার। সারা দেশে লোক পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মানুষের চেহারার দশজন দানবকে ধরে আনা হল। তিনদিনে তারা শেরপুরের সব খাবার খেয়ে ফেলল প্রায়। চারদিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। দশ পালোয়ান বাঘের মতো গর—র গর—র আওয়াজ ছাড়ে, মানুষের ভাষায় কথাই বলে না। দিনমানে তারা নিজেদের সামলাবার জন্য নিজেরাই নিজেদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। ভীষণ রাগী, কখন কার ঘাড় মটকে দিয়ে জেল হয়। তবু শেষ রক্ষা হয় না বুঝি। তাদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা মজবুত পাকা ঘর। তবু দশ পালোয়ানের নড়াচড়ায় মেঝে দেবে গেল, দেওয়াল ভেঙে গেল একধারের। হাঁকডাকে চারধারে ভূমিকম্প হল কয়েকবার।

লড়াইরে দিন চারটে রথযাত্রার ভিড় ভেঙে পড়ল কাছারি বাড়িতে। হুলস্থুল কাণ্ড। দশ দানব দঙ্গলের মাটি কাঁপিয়ে এসে ঢুকল একসঙ্গে। দশজনের সঙ্গে একা লড়বে পটকান।

চোখে দেখেও কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা। পটকান দঙ্গলে ঢুকে গুরু প্রণামটা সেরে নিল কেবল। তারপরই দেখা গেল সে এক একটা দানবকে ধরে পটাপট ভিড়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, ঠিক যেমন গদাই মালি বাগানের আগাছা তুলে ছুড়ে দেয় বেড়ার বাইরে। দু মিনিটে দশ পালোয়ান সাবাড় করে ঠিক দশবার ছোঃ দিল পটকান। তারপর ভীষণ অভিমানের চোখে তাকাল জমিদার মশায়ের দিকে। বলল—হুজুর—

রোগা ভোগা জমিদার মশাইয়ের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে অপমানে। তিনি কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন।

পটকান বলল, হুজুর, এরা সব কারা এসেছিল হুজুর? এসব রোগা দুবলা লোক কোত্থেকে আনলেন?

হঠাৎ জমিদার মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন— চোপরও বেয়াদপ! রোগা দুবলা লোক? আঁ! রোগা দুবলা লোক এরা সব!

বলতে বলতে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জমিদার মশাই বাত ব্যাধির কথা ভুলে, হার্টের ব্যামোর কথা বিস্মরণ হয়ে, রক্তচাপকে পরোয়া না করে, পেটের ভুটভাটকে উপেক্ষা করে এক লাফে এগিয়ে এলেন মাটির ওপর।

কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না, অ্যাঁ...বলতে বলতে জমিদার মশাই পটকানের ঘাড়টা ধরে এক ঝটকায় তুলে ফেললেন মাথার ওপরে। তারপর সে কি বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পটকান প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে তখন—বাবাগো! গেলাম গো! মেরে ফেললে গো! কে কোথায় আছো ছুটে এসো!

কে শোনে কার কথা! কয়েকবার আচ্ছাসে ঘুরিয়ে জমিদার মশাই পটকানকে এক বেদম আছাড় মারলেন। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন— ছোঃ!

দিনকাল

বিলাস গরু চরাতে হক সাহেবের মাঠে এসেছে। কোঁচড়ে মুড়ি, এক হাতে বাঁশি, অন্য হাতে রিমোট কন্ট্রোল। গরুদের প্রত্যেকটির কানের কাছে একটি করে রিসিভার যন্ত্র আছে। পাঁচনবাড়ির দরকার হয় না, রিমোটের বোতাম টিপেই ব্যাদড়া গরুকে বশে রাখা যায়।

হক সাহেবের মাঠটি চমৎকার। সবুজ দেড় বিঘৎ লম্বা পুষ্টিকর ঘাসে ছাওয়া। একসময়ে অবশ্য ন্যাড়া বালিয়াড়ি ছিল। প্রায় দুশো বছর আগে, অর্থাৎ বাইশ শো তেষট্টি সালে অজিত কুণ্ডু নামে এক বৈজ্ঞানিক তাঁর বিখ্যাত যান্ত্রিক ইঁদুর আবিষ্কার করলেন। ছোট ছোট যন্ত্রের ইঁদুর মাটিতে গর্ত করে দশ পনেরো বিশ মিটার নিচে নেমে যায় আর সেখান থেকে মাটি তুলে এনে ওপরে ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে বালিয়াড়ি, সাহারা বা কালাহারির মতো মরুভূমি সব অদৃশ্য হয়ে এখন উর্বর মাটি, শস্যক্ষেত্র আর বনে জঙ্গলে সেসব জায়গা ভরে গেছে। মাটিকে উর্বর আর সরস রাখতে কেঁচো ও জীবাণুদের কাজে লাগানো হয়েছে। ফলটা হয়েছে চমৎকার। হক সাহেবের মাঠটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পাশেই রামরতন ঘোষের মস্ত ধানখেত। খেতের পাশে একটা বেলুন চেয়ারে বসে রামরতন তার রিমোট কন্ট্রোলে খেতে ধান রুইছে। রামরতনের রোবট—যন্ত্রটি দেখতে অবিকল একটা বাচ্চা মেয়ের মতো। প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে। যন্ত্র—বালিকা ঠিকমতোই ধান রুইবে। তবে রামরতনের যন্ত্র—বালিকাটির দোষ হল, চোখের আড়াল হলেই খানিকটা এক্কা দোক্কা খেলে নেয়। হয়তো আগে অন্যরকম প্রোগ্রাম করা ছিল, সেটা পুরোপুরি তুলে না দিয়েই নতুন প্রোগ্রাম বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এজন রামরতনের একটু ঝামেলা হচ্ছে।

বিলাস তার নাইলনের ব্যাগ থেকে চোপসানো একটা বেলুনের মতো জিনিস বের করল। একটা খুদে সিলিন্ডারের নজল বেলুনের মুখে চেপে ধরতেই লহমায় বেলুনটা ফুলে একটা ভারি সুন্দর আরামের চেয়ারে পরিণত হল। বিলাস চেয়ারে বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খেতে খেতে হাঁক মারল, ও রামরতনদাদা, বলি করছটা কী?

রামরতন তার দিকে চেয়ে বিরক্ত মুখে বলল, চার একর জমিতে ধান রুইতে বড় জোর আধঘণ্টা লাগবার কথা। আর ওই বিচ্ছু মেয়ে ঝাড়া দু ঘণ্টায় এক একরও পারেনি।

বিলাস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দাও না। যন্তর তো তোমার হাতেই রয়েছে।

রামরতন বিরক্ত হয়ে বলে, তাহলে তো কথাই ছিল না। এঁর তো গুণের শেষ নেই। যেই স্পিড বাড়াব অমনি ফাঁক করে বুনতে শুরু করবে। তাতে কাজ বাড়বে বই কমবে না।

যন্তরটা তাহলে তোমাকে খারাপই দিয়েছে। বদল করে নাও না কেন?

রামরতন এবার তার চেয়ারে লাগানো নম্বরের প্লেটে একটা নম্বর টিপল। তার চেয়ারটা সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে বিলাসের চেয়ারের পাশে এসে নামল। রামরতন টিসু কাগজে মুখ মুছে বলে, সে চেষ্টা কি আর করিনি নাকি? ও মেয়েকে তুমি চেনো না। যন্ত্র—বালিকা হলে কি হয়, মাথায় খুব বুদ্ধি। চার মাস হল কিনেছি গুচ্ছের টাকা দিয়ে, দু বছরের গ্যারান্টি আছে। কাজে দোষ হলে বদলে দেবে বা টাকা ফিরত দেবে। কিন্তু এ মেয়েটা বাড়িতে ঢুকেই আমাকে বাবা বলে, আর আমার গিন্নিকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছে। চালাকিটা দেখেছ? এখন আমার গিন্নির এত মায়া পড়ে গেছে যে মৃগনয়নীকে ফেরত দেওয়ার কথা শুনলেই খেপে ওঠেন।

মৃগনয়নী কি ওর নাম?

আমার গিন্নির দেওয়া। মেয়েটাকে নিয়ে জেরবার হচ্ছি। ওই দেখ, আবার খেলতে লেগেছে।

বাস্তবিকই মৃগনয়নী ধান রোয়া ফেলে একটা স্কিপিং দড়িতে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। মুখে হাসি।

রামরতন রিমোটটা তুলে ধরে বোতাম টিপে মেয়েটাকে ফের কাজে লাগিয়ে দিয়ে বলল, সারাক্ষণ এই করতে হচ্ছে। সকালে পান্তাভাত খেয়ে এসেছি, কোথায় একটু ঝিম মেরে চোখটি বুজে থাকব, তার উপায় নেই।

ফেরত না দাও, রিপ্রোগ্রামিং করিয়ে নিলেই তো পারো। ওরা ডিস্কটা ভালো করে পুঁছে আবার প্রোগ্রাম করে দেবে।

রামরতন বিমর্ষ মুখে বলে, সে চেষ্টাও কি আর করিনি? গিন্নি তাও করতে দিচ্ছে না। বলে, ও যে দুষ্টুমি করে, খেলে তাতেই আমার বেশি ভালো লাগে। এ সময়টায় একটু ভাত ঘুম ঘুমিয়ে না নিলে আমার শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করে।

রামরতন গোটা দুই হাই তুলল দেখে বিলাস সমবেদনার সঙ্গে বলল, একটা হর্ষ—বড়ি খেয়ে নেবে নাকি? তাহলে বেশ চাঙ্গা লাগবে। আমার কাছে আছে।

রামরতন মাথা নেড়ে বলে, না রে ভাই। সেদিন একটা খেয়ে যা অবস্থা হল, আনন্দের চোটে এমন নাচানাচি, লাফালাফি চেঁচামেচি করেছি যে পরে গা—গতরে ব্যথা হয়ে, গলা ভেঙে কাহিল অবস্থা।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বিলাস বলে, তা তোমার তো প্লাস্টিকের হার্ট, তুমি কাহিল হয়ে পড়ো কেন? প্লাস্টিকের হার্টওলা লোকরা নাকি সহজে কাহিল হয় না।

সে কথা ঠিক। তবে আমার কপালটাই তো ওরকম। যে হার্টটা বসানো হয়েছে সেটা নাকি বাঙালিদের ধাত অনুযায়ী টিউন করা নয়, তখন বাঙালি হার্টের সাপ্লাই ছিল না বলে আমাকে একটা জার্মান হার্ট লাগিয়ে দিয়েছে, সেটা একটু বেশি শক্তিশালী। ফলে আমার শরীরের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। মাস তিনেক বাদে বাঙালি হার্ট এলে এটা বদলে দেবে বলেছে।

দু'জনের কথা হচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ আকাশে একটা গোলগাল মেঘ দেখা দিল, আর ছ্যাড়ছ্যাড় করে বৃষ্টি হতে লাগল।

বিলাস চমকে উঠে বলে, আরে। বৃষ্টি হচ্ছে কেন? এখন তো বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়! দেখ তো, মুড়িগুলো ভিজে গেল!

আমার আবার সর্দির ধাত। বলে রামরতন হাতের রিমোটটা উল্টে নম্বর ডায়াল করতে লাগল। রিমোটটার উল্টো পিঠটা টেলিফোনের কাজ করে।

রামরতন বলল, হাওয়া অফিস? তা ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে এখন বৃষ্টি হওয়াচ্ছেন কেন? আমরা তো বৃষ্টি চাইনি।

হাওয়া অফিস খুব লজ্জিত হয়ে বলে, এঃ হেঃ সরি, একটু ভুল হয়ে গেছে। আসলে ওটা হওয়ার কথা সাহাগঞ্জের মাঠে। ঠিক আছে আমরা মেঘটাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মেঘটা হঠাৎ একটা চক্কর খেয়ে ভোঁ করে মিলিয়ে গেল। আবার রোদ দেখা দিল।

বিলাস ক্ষুব্ধ গলায় বলে, হাওয়া অফিসটা আর মানুষ হল না। সব সময়ে ক্যালকুলেশনে ভুল করে যা নয় তাই ঘটিয়ে দিচ্ছে। এ হল ফিনল্যান্ডের বাবু—মুড়ি, জল লাগলেই গলে যায়।

ওই তো কত ফিরিঅলা চরে বেড়াচ্ছে। একটাকে ডেকে মুড়ি কিনে নে না।

বাস্তবিকই আকাশে ইতস্তত কয়েকটা বাটির মতো আকারের জিনিস শ্লথ গতিতে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের তলায় কোনোটায় লেখা জলখাবার, কোনোটায় লেখা প্রসাধন সামগ্রী, কোনোটায় লেখা বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামত ইত্যাদি।

বিলাস বাঁশিটা মুখে নিয়ে বাঁশির গায়ে একটা বোতাম টিপে ফুঁ দিল। কোনো শব্দ হল না। কিন্তু আকাশ থেকে একখানা বাটি নেমে এসে তার সামনে থামল। বাটিতে মেলা খাবার জিনিস সাজানো। দোকানি একজন বুড়ো মানুষ। বলল, কী চাই?

ফিনল্যান্ডের বাবু—মুড়ি আছে নাকি?

ফিনল্যান্ডের মুড়ি আবার মুড়ি নাকি? যন্তরে মুড়ি আছে, একবার খেলে জীবনে আর স্বাদ ভুলতে পারবে না। নাম হল উড়ুক্কু মুড়ি।

আজকাল নিত্যি নতুন জিনিস বেরোচ্ছে। উড়ুক্কু মুড়ি বিলাস খায়নি। নিল এক প্যাকেট। দাম নিয়ে বুড়ো বাটি সমেত ফের আকাশে উঠে গেল।

বিলাস একমুঠো মুখে দিয়ে দেখল, চমৎকার, চিবোতে না চিবোতেই যেন মুখে মিলিয়ে যায়। স্বাদটাও ভালো।

ওরে ও বিলাস, তোর কেলে গরু যে আমার খেতে ঢুকে যাচ্ছে, এখনই সব তছনছ করবে। ওটি সাঙ্ঘাতিক দুষ্টু গাই।

বিলাস তাড়াতাড়ি রিমোট তুলে বোতাম টিপতেই কেলে গরুটা থমকে একটু শিং নাড়া দিল। তারপর সুড়সুড় করে আবার ফিরে এসে ঘাস খেতে লাগল। বিলাস বলল, রামরতনদা, তোমার রিমোটটা আমাকে দিয়ে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি মৃগনয়নীকে সামলে রাখবখন।

বাঁচালি ভাই, এই নে, এই নে, বলে রিমোটটা বিলাসকে দিয়ে রামরতন সবে চোখ বুজেছে এমন সময়ে হঠাৎ মৃগনয়নী কাজ ফেলে দুড়দাড় করে দৌড়ে এল।

ও বাবা!

রামরতন বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে বলল, কী বলছিস?

ভূতে ঢেলা মারছে যে!

অ্যাঁ!

এই অ্যাত বড় বড় ঢেলা। এই দেখ। বলে মৃগনয়নী একটা ঢেলা হাতের মুঠো খুলে দেখাল।

আর এই সময়েই আরও দু চারটে ঢেলা ওদিককার খেত থেকে উড়ে এসে আশেপাশে পড়ল। ব্যাপারটা নতুন নয়, আগেও দু'চারবার হয়েছে। রামরতন শুকনো মুখে বিলাসের দিকে চেয়ে বলে, কী করি বল তো!

বিলাস বলল, কার ভূত?

তা কী করে বলব?

দাঁড়াও, থিওসফিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।

বিলাস ডায়াল করে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে কার ভূত দৌরাত্ম্য করছে তা জানেন?

ও হল ষষ্ঠীচরণ সাহার ভূত। ওকে চটাবেন না।

কিছু একটা করুন। খেতের কাজ যে বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

সে আমাদের কম্ম নয়। ভূতের সঙ্গে কে এঁটে উঠবে?

তাহলে?

চোখ কান বুজে সয়ে নিন। কিছু করার নেই।

বিলাস ফোন বন্ধ করে বলে, ষষ্ঠী খুড়োর ভূত। কেউ কিছু করতে পারবে না।

রামরতন একটু খিঁচিয়ে উঠে মৃগনয়নীকে বলে, তোর এত আদিখ্যেতা কীসের? ঢেলা পড়ছে তো পড়ুক না। তোর তো আর ব্যথা লাগবার কথা নয়!

মৃগনয়নীর চোখ ভরে জল এল। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, না, লাগেনি বুঝি! এই দেখ না কনুইয়ের কাছটা কেমন ফুলে আছে।

সত্যিই জায়গাটা ফোলা দেখে রামরতনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বিলাসের দিকে চেয়ে বলল, এ কী রে? রোবটেরও যে ব্যথা লাগছে আজকাল।

বিলাস বলল, শুধু কি তাই? চোখে জল, ঠোঁটে অভিমান, নাঃ, দিনকাল যে কী রকম পড়ল!

রামরতন মৃগনয়নীকে বকবে বলে বড় বড় চোখ করে ধমকাতে যাচ্ছিল, মৃগনয়নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না কেন বাবা?

রামরতনের রাগ জল হয়ে গেল। ঠিক বটে, সে মানুষ আর মৃগনয়নী নিতান্তই যন্ত্র—বালিকা। কিন্তু সবসময়ে কি আর ওসব খেয়াল থাকে? রামরতন হাত বাড়িয়ে মৃগনয়নীকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কাঁদিসনে মা, আজ তোকে খুব সুন্দর একটা ডলপুতুল কিনে দেব।

বিলাস মুখটা ফিরিয়ে একটু হাসল।

লোকটা

সোমনাথবাবু সকালবেলায় তাঁর একতলার বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। সামনেই মস্ত বাগান, সেখানে খেলা করছে তাঁর সাতটা ভয়ংকর কুকুর। কুকুরদের মধ্যে দুটো বকসার বুলডগ, দুটো ডোবারম্যান, দুটো অ্যালসেশিয়ান, একটা চিশি সড়ালে। এদের দাপটে কেউ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তার ওপর গেটে বাহাদুর নামের নেপালি দারোয়ান আছে। তার কোমরে কুকরি, হাতে লাঠি। সদাসতর্ক, সদাতৎপর। সোমনাথবাবু এরকম সুরক্ষিত থাকতেই ভালোবাসেন। তাঁর অনেক টাকা, হীরে—জহরত, সোনাদানা।

কিন্তু আজ সকালে সোমনাথবাবুকে খুবই অবাক হয়ে যেতে হল। ঘড়িতে মোটে সাতটা বাজে। শীতকাল। সবে রোদের লালচে আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে বাগানের ফটক খুলে বেঁটেমতো টাকমাথার একটা লোক ঢুকল। দারোয়ান বা কুকুরদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। পাথরকুচি ছড়ানো পথটা দিয়ে সোজা বারান্দার দিকে হেঁটে আসতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েও বাহাদুর তাকে বাধা দিল না এবং কুকুররাও যেমন খেলছিল তেমনিই ছোটাছুটি করে খেলতে লাগল। একটা ঘেউ পর্যন্ত করল না।

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

লোকটার চেহারা ভদ্রলোকের মতোই, মুখখানায় একটা ভালোমানুষিও আছে, তবে পোশাকটা একটু কেমন কেমন, মিস্তিরি বা ফিটাররা যেমন তেলকালি লাগার ভয়ে ওভারল পরে, অনেকটা সেরকমই একটা জিনিস লোকটার পরনে। পায়ে এই শীতকালেও গামবুট ধরনের জুতো। কারও মাথায় এমন নিখুঁত টাকও সোমনাথবাবু কখনও দেখেননি। লোকটার মাথায় একগাছি চুলও নেই।

বারান্দায় উঠে আসতেই সোমনাথবাবু অত্যন্ত কঠোর গলায় বলে উঠলেন, "কী চাই? কার হুকুমে এ বাড়িতে ঢুকেছেন?"

লোকটা জবাবে পাল্টা একটা প্রশ্ন করল, "আপনি কি সকালের জলখাবার সমাধা করেছেন?"

সোমনাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "না তো—ইয়ে—মানে আপনি কে বলুন তো?"

লোকটা মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "আমার খুবই খিদে পেয়েছে। হাতে বিশেষ সময়ও নেই।"

লোকটার বাঁ কবজিতে একটা অদ্ভুত দর্শন ঘড়ি। বেশ বড় এবং ডায়ালে বেশ জটিল সব ছোট ছোট ডায়াল ও কাঁটা রয়েছে।

সোমনাথবাবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে রাগটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, "দেখুন, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। অচেনা বাড়িতে ফস করে ঢুকে পড়া মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়। তার ওপর বিনা নিমন্ত্রণে খেতে চাইছেন— এটাই বা কেমন কথা?

লোকটা অবাক হয়ে বলে, "আপনার খিদে পেলে আপনি কী করেন?"

"আমি! আমি খিদে পেলে খাই, কিন্তু সেটা আমার নিজের বাড়িতে।"

"আমিও খিদে পেলে খাই।" এই বলে লোকটা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সোমনাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি নিজের বাড়িতে গিয়ে খান না।"

লোকটা হাসি হাসি মুখ করেই বললেন, "আমার নিজের বাড়ি একটু দূরে। আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এখানে একটু আটকে পড়েছি।"

সোমনাথবাবু বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে বললেন, "আপনি আমার দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে কুকুরগুলোর চোখ এড়িয়ে কী করে ঢুকলেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে কোনো লোক কখনও খবর না দিয়ে ঢুকতে পারে না।"

লোকটা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে, "সে কথা ঠিকই, আপনার দারোয়ান বা কুকুররা কেউই খারাপ নয়। ওদের ওপর রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনার কি সকালের দিকে খিদে পায় না? খেতে খেতে বরং দু—চারটে কথা বলা যেত।"

এই বলে লোকটা এমন ছেলেমানুষের মতো সোমনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে সোমনাথবাবু হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, "আপনি একটু অদ্ভুত আছেন মশাই, আচ্ছা, ঠিক আছে, জলখাবার খাওয়াচ্ছি একটু বসুন।"

সোমনাথবাবু উঠে ভিতর বাড়িতে এসে রান্নার ঠাকুরকে জলখাবার দিতে বলে বারান্দায় ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তাঁর ভয়ংকর সাত সাতটা কুকুর বারান্দায় উঠে এসে বেঁটে লোকটার চারধারে একেবারে ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর লোকটা খুব নিম্নস্বরে তাদের কিছু বলছে।

সোমনাথবাবুকে দেখে লোকটা যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, "এই একটু এদের সঙ্গে কথা বললুম আর কী। ঐ যে জিমি কুকুরটা, ওর কিন্তু মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয়, একটু চিকিৎসা করাবেন। আর টমি বলে ওই যে অ্যালসেশিয়ানটা আছে, ও কিন্তু একটু অপ্রকৃতিস্থ, সাবধান থাকবেন।"

সোমনাথবাবু এত বিস্মিত যে মুখে প্রথমটায় কথা সরল না। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে যখন কথা বলতে পারলেন তখন গলায় ভালো করে স্বর ফুটছে না, "আপনি ওদের কথা বুঝতে পারেন? ভাবই বা হল কী করে?"

লোকটাও যেন একটু অবাক হয়ে বলে, "আপনি কুকুর পোষেন অথচ তাদের ভাষা বা মনের ভাব বোঝেন না এটাই বা কেমন কথা? ওরা তো আপনার কথা দিব্যি বোঝে। দু পায়ে দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বললে নিয়ে আসে। তাই না? ওরা যা পারে আপনি তা পারেন না কেন?"

সোমনাথবাবুকে স্বীকার করতে হল যে কথাটায় যুক্তি আছে। তারপর বললেন, "কিন্তু ভাব করলেন কী করে?"

"ওরা বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে!"

সোমনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "কিন্তু বাহাদুর! বাহাদুর তো আমার মতোই মানুষ। তার ওপর ভীষণ সাবধানী লোক। তাকে হাত করা তো সোজা নয়।"

লোকটা মিটিমিটি হেসে বলে, "আমি যখন ঢুকছিলাম তখন বাহাদুর হাসিমুখে আমাকে একটা সেলামও করেছিল। শুধু আপনিই কেমন যেন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারছেন না।"

সোমনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "মানে—ইয়ে—যাকগে, আমার এখন আর কোনোও বিরূপ ভাব নেই।"

"আমার কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে।"

শশব্যস্তে সোমনাথবাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন।"

লোকটার সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে পরোটা আর আলুর চচ্চড়ি খেল, তারপর গোটা পাঁচেক রসগোল্লাও। চা বা কফি খেল না। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, "আর সময় নেই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।"

সোমনাথবাবু ভদ্রতা করে বললেন, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"বেশ একটু দূরে। অনেকটা পথ।"

"গাড়িটা কি মেরামত হয়ে গেছে? নইলে আমি আমার ড্রাইভারকে বলে দেখতে পারি, সে গাড়ির কাজ খানিকটা জানে।"

লোকটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, "এ গাড়ি ঠিক আপনাদের গাড়ি নয়। আচ্ছা চলি।"

লোকটা চলে যাওয়ার পর সোমনাথবাবু বাহাদুরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "যে লোকটা একটু আগে এসেছিল তাকে তুই চিনিস! ফস করে ঢুকতে দিলি যে বড়!"

বাহাদুর তার ছোট চোখ যথাসম্ভব বড় করে বলল, "কেউ তো আসেনি বাবু।"

"আলবাত এসেছিল, তুই তাকে সেলামও করেছিস।"

বাহাদুর মাথা নেড়ে বলে, "না, আমি তো কাউকে সেলাম করিনি। শুধু সাতটার সময় আপনি যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন আপনাকে সেলাম করেছি।"

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "আমি! আমি সকালে আজ বাইরেই যাইনি তা ঢুকলুম কখন? ওই বেঁটে বিচ্ছিরি টেকো লোকটাকে তোর আমি বলে ভুল হল নাকি?"

সোমনাথবাবু তাঁর কুকুরদের ডাকলেন এবং একতরফা খুব শাসন করলেন, "নেমকহারাম, বজ্জাত, তোরা এতকালের ট্রেনিং ভুলে একজন আজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়িতে ঢুকতে দিলি! টুঁ শব্দটিও করলি না!"

কুকুররা খুবই অবোধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

মাসখানেক কেটে গেছে। বেঁটে লোকটার কথা একরকম ভুলেই গেছেন সোমনাথবাবু। সকালবেলায় তিনি বাগানের গাছগাছালির পরিচর্যা করছিলেন। তাঁর সাতটা কুকুর দৌড়ঝাঁপ করছে বাগানে। ফটকে সদাসতর্ক বাহাদুর পাহারা দিচ্ছে। শীতের রোদ সবে তেজি হয়ে উঠতে লেগেছে।

একটা মোলায়েম গলাখাঁকারি শুনে সোমনাথবাবু ফিরে তাকিয়ে অবাক। সেই লোকটা। মুখে একটু ক্যাবলা হাসি।

সোমনাথবাবু লোকটাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ, আজও দেখছেন বাহাদুর লোকটাকে আটকায়নি এবং কুকুররাও নির্বিকার। সোমনাথবাবু নিরুত্তাপ গলায় বললেন, "এই যে! কী খবর?"

"আজ্ঞে খবর শুভ। আজও আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।"

"তার মানে আজও কি আপনার গাড়ি খারাপ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। দূরের পাল্লায় চলাচল করতে হয়, গাড়ির আর দোষ কী?"

"তা বলে আমার বাড়িটাকে হোটেলখানা বানানো কি উচিত হচ্ছে? আর আপনার গতিবিধিও রীতিমতো সন্দেহজনক। আপনি এলে দারোয়ান ভুল দেখে, কুকুররাও ভুল বোঝে। ব্যাপারটা আমার সুবিধে ঠেকছে না।"

লোকটা যেন বিশেষ লজ্জিত হয়ে বলে, "আমাকে দেখতে হুবহু আপনার মতোই কিনা, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।"

সোমনাথবাবু এ কথা শুনে একেবারে বুরবক, "তার মানে? আমাকে দেখতে আপনার মতো! আমি কি বেঁটে? আমার মাথায় কি টাক আছে?"

লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, "না না, তা নয়। আপনি আমার চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা, আপনার হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আপনার মাথায় দু লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশ পঁচিশটা চুল আছে। আপনি দেখতেও অনেক সুদর্শন। তবু কোথায় যেন হুবহু মিলও আছে।"

উত্তেজিত সোমনাথবাবু বেশ ধমকের গলায় বললেন, "কোথায় মিল মশাই? কীসের মিল?"

লোকটা একটা রুমালে টাকটা মুছে নিয়ে বলল, "সেটা ভেবে দেখতে হবে। এখন হাতে সময় নেই। আমার বড় খিদে পেয়েছে।"

সোমনাথবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "খিদে পেয়েছে তো হোটেলে গেলেই হয়।"

লোকটা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আমার কাছে পয়সা নেই যে!"

"পয়সা নেই!" এদিকে তো দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করেন। তাহলে পয়সা নেই কেন?"

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে পকেটে হাত দিয়ে একটা কাঠি বের করে বলল, "এ জিনিস এখানে চলবে?"

"তার মানে?"

"আমাদের দেশে এগুলোই হচ্ছে বিনিময় মুদ্রা। এই যে কাঠির মতো জিনিসটা দেখছেন এটার দাম এখানকার দেড়শ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু কে দাম দেবে বলুন।"

সোমনাথবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "কাঠি! কাঠি আবার কোথাকার বিনিময় মুদ্রা হল! এসব তো হেঁয়ালি ঠেকছে।"

লোকটা একটু কাতর মুখে বলল, "সব কথারই জবাব দেব। আগে কিছু খেতে দিন। বড্ড খিদে।"

সোমনাথবাবু রুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি লোকটাকে খাওয়ালেনও। লোকটা যখন গোগ্রাসে পরোটা খাচ্ছে তখন সোমনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আপনার নাম বা ঠিকানা কিছুই তো বলেননি, কী নাম আপনার?"

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "নামটা শুনবেন! একটু অদ্ভুত নাম কিনা, আমার নাম খ।"

সোমনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, "শুধু খ! এরকম নাম হয় নাকি?"

"আমাদের ওখানে হয়।"

"আর পদবি?"

"খ মানেই নাম আর পদবি। খ হল নাম আর অ হল পদবি। দুয়ে মিলেই ওই খ।"

"ও বাবা! এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার।"

"আমাদের সবই ওরকম।"

"তা আপনার বাড়ি কোথায়?"

"একটু দূরে। সাড়ে তিনশো আল হবে।"

"আল! আল আবার কী জিনিস?"

"ওটা হলো দূরত্বের মাপ।"

"এরকম মাপের নাম জন্মে শুনিনি মশাই। তা আল মানে কত? মাইল খানেক হবে নাকি?"

লোকটা হাসল, "একটু বেশি। হাতে সময় থাকলে চলুন না, আমার গাড়িটায় চড়ে আলের মাপটা দেখে আসবেন।"

"না না, থাক।"

লোকটা অভিমানী মুখে বলে, "আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছেন না! আমি কিন্তু ভালো লোক। মাঝে মাঝে খিদে পায় বলে হামলা করি বটে, কিন্তু আমার কোনো বদ মতলব নেই।"

সোমনাথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, "আরে না না। ঠিক আছে, বলছেন যখন যাচ্ছি। তবে এ সময়ে আমি একটু ব্যস্ত আছি কিনা, বেশি সময় দিতে পারব না।"

"তাই হবে, চলুন, গাড়িটা পিছনের মাঠে রেখেছি।"

"মাঠে! ও তো ঠিক মাঠ নয়, জলা জায়গা, ওখানে গাড়ি রাখা অসম্ভব।"

"আমার গাড়ি সর্বত্র যেতে পারে। আসুন না দেখবেন।"

কৌতূহলী সোমনাথবাবু লোকটার সঙ্গে এসে জলার ধারে পৌঁছে অবাক। কোথাও কিছু নেই।

"কোথায় আপনার গাড়ি মশাই?" বলে পাশে তাকিয়ে দেখেন লোকটাও নেই। সোমনাথবাবু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

অবশ্য বিস্ময়ের তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। ফাঁকা মাঠ, লোকটাও হাওয়া দেখে সোমনাথবাবু ফিরবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় অদৃশ্য থেকে লোকটা বলে উঠল, "আহা, যাবেন না, একটা মিনিট অপেক্ষা করুন।"

বলতে বলতেই সামনে নৈবেদ্যর আকারের একটা জিনিস ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। বেশ বড় জিনিস, একখানা ছোটখাটো দোতলা বাড়ির সমান। নিচের দিকটা গোল, ওপরের দিকটা সরু।

"এটা আবার কী জিনিস?"

নৈবেদ্যর গায়ে পটাং করে একটা চৌকো দরজা খুলে গেল আর নেমে এল একখানা সিঁড়ি। লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, "আসুন আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক।"

সোমনাথবাবু এমন বিস্মিত হয়েছেন যে, কথাই বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় তোতলাতে লাগলেন, "ভূ—ভূত! ভূ—ভূতুড়ে!...."

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "না মশাই না। ভূতুড়ে নয়। গাড়িটা অদৃশ্য করে না রাখলে যে লোকের নজরে পড়বে। আসুন, চলে আসুন। কোনো ভয় নেই।"

সোমনাথবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "ও বাবা, আপনি তো সাংঘাতিক লোক! আমি ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। আপনি যান, আমি যাব না।"

লোকটা করুণ মুখে বলে, "কিন্তু আমি তো খারাপ লোক নই সোমনাথবাবু।"

সোমনাথবাবু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, "খারাপ নন, তবে ভয়ংকর। আপনি গ্রহান্তরের লোক।"

"আজ্ঞে, আপনাদের হিসেবে মাত্র দু হাজার লাইট ইয়ার দূরে আমার গ্রহ। বেশ বড় গ্রহ। আমাদের সূর্যের নাম সোনা। সোনার চারদিকে দেড় হাজার ছোট বড় গ্রহ আছে। সব ক'টা গ্রহই বাসযোগ্য। আপনাদের মতো মোটে একটা গ্রহে প্রাণী নয় সেখানে। সব কটা গ্রহেই নানা প্রাণী আর উদ্ভিদ। কোনো কোনো গ্রহে এখন প্রস্তরযুগ চলছে, কোনোটায় চলছে ডায়নোসরদের যুগ, কোথাও বা সভ্যতা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কোনো গ্রহে ঘোর কলি, কোনোটাতে সত্য, কোনোটাতে ত্রেতা, কোথাও বা দ্বাপর—সে এক ভারি মজার ব্যাপার। বেশি সময় লাগবে না, এ গাড়ি আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।"

"ওরে বাবা রে!" বলে সোমনাথবাবু প্রাণপণে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু পারলেন না। একটা শাঁড়াশির মতো যন্ত্র পট করে এগিয়ে এসে তাঁকে খপ করে ধরে সাঁ করে তুলে নিল সেই নৈবেদ্যর মধ্যে।

তারপর একটা ঝাঁকুনি আর তারপর একটা দুলুনি। সোমনাথবাবুর একটু মূর্ছার মতো হল। যখন চোখ চাইলেন তখন দেখেন নৈবেদ্যটা এক জায়গায় থেমেছে। দরজা খোলা। লোকটা একগাল হেসে বলল, "আসুন, ডায়নোসর দেখবেন না! ওই যে।"

দরজার কাছে গিয়ে সোমনাথবাবুর আবার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। ছবিতে যেমন দেখেছেন হুবহু তেমনি দেখতে গোটা দশেক ডাইনোসর বিশাল পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে চলাফেরা করছে। আকাশে উড়ছে বিশাল টেরোড্যাকটিল এবং অন্যান্য বিকট পাখি।

ভয়ে চোখ বুজলেন সোমনাথ। আবার দুলুনি। এবার যেখানে যান থামল সেখানে সব চামড়া আর গাছের ছালের নেংটি পরা মানুষ ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করছে। মহাকাশযান দেখে তারা অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল। দু—চারটে তীক্ষ্ন পাথরের টুকরো এসে লাগলও মহাকাশযানের গায়ে। লোকটা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে তার গাড়ি ছেড়ে দিল।

এবারের গ্রহটা রীতিমতো ভালো। দেখা গেল রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণভাই শিকার করতে বেরিয়েছেন। দু'জনেই খুব হাসছেন। রামচন্দ্রকে জোড়হাতে প্রণাম করলেন সোমনাথবাবু। রামচন্দ্র বরাভয় দেখিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

সোমনাথবাবু ঘামতে ঘামতে বললেন, ''এসব কি সত্যি? না স্বপ্ন দেখছি?''

''সব সত্যি। আরও আছে।''

''আমি আর দেখব না। যথেষ্ট হয়েছে। মশাই, পায়ে পড়ি, বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।''

লোকটা বিনীতভাবে বলল, ''যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবেন। আরও কত কী দেখার আছে।''

মহকাশযানটা ফের শূন্যে উঠল। সেই দুলুনি। কিছুক্ষণ পর জলার মাঠে নেমে পড়তেই সোমনাথবাবু প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

লোকটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, ''দাদা, একটু মনে রাখবেন আমাকে, মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে এসে পড়লে পরোটা টরোটা যেন পাই।''

''হবে, হবে।'' বলতে বলতে সোমনাথবাবু বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারি বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের—পরা খুকি। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি জঙ্গল—টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানিতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক—নাগাড়ে তিন চার কিংবা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট নজন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোটছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানি জায়গাটা ভারি সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। এক ধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনসটিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে—খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যেতাম। ছোট আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানি।

দোমোহানিতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকিপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বললেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভালো নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।" কিংবা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত—গিন্নি এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, "নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলে—পুলেদের সামলে রাখবেন। এখানে যারা সব আছে, তারা ভালো নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, "কাদের কথা বলছেন দিদি?"

পালিত—গিন্নি শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেনখন।"

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখিয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখিয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধাবয়সি বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায় দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত—গিন্নি একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে।"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত—গিন্নি মুচকি হেসে বললেন, "ওদের ওরকমই ধারা। ঝিটার নাম কী বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত—গিন্নি মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদার—বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো!"

পালিত—গিন্নি শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা ভারি মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।"

এই বলে চলে গেলেন পালিত—গিন্নি, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

সে মাথা নিচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই!"

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা—ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতিরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে—সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশনমাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালোবাসতেন। গাড়ি দাড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় এঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখলেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন এঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর ভট্টাচার্য চা—বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানিতে এসে পৌঁছলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানির মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল! ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না...ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ—বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচি আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘ—ভাল্লুক নই...ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো—কাঁদো হয়ে চোখ—বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে! অ্যাঁ কী হয়েছে! তারপর তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তাঁর মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরে তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনও দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো—কাঁদো মুখে চার পাঁচ সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়।

তখনকার মফঃস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলাটেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, "আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভালো। অতি আশ্চর্য খেলা।"

ভট্টাচার্য বললেন, "হাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি!"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী! এ তো আপনিই দেখালেন!"

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, "তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য!"

তাঁকে খুব বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানিতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কই, আমরা তো পাচ্ছি না।"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাত আঁশটে গন্ধ। শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে—আঁশটে গন্ধ একটা।

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারি মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখে শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক, সে ভালো। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা—এ বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, "এসব কী কথা বলছেন মাসিমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা দোমোহানির সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ওই দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি— চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, বসো।" বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানিতে তখন ঝি—চাকর কিংবা কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই—পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি—চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে, কে আছিস?" বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, "যা এটা ডাকে দিয়ে আয়।" দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?" সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কী। খুব ভালো ওরা, ডাকলেই আসে। লোক টোক নয়, ওরা ওরাই।"

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলি পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদৌল্লা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরীশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপচাপা হয়ে কোঁ—কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি, একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই—ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশায়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, "দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।"

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, "মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?"

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, "সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসি তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা—মাসিরা নাবালক নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তা মা আর মাসি রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, "আয় রে।" অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সিই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড় আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোট জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, "কে খেলবি আয়।" অমনি চার—পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সিই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানির ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা—বাগানের টিমের ম্যাচ। চা—বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানির বাঙালি টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানির টিম খুব ভালো খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা দিয়েছে। এমন সময় চা—বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারিকে বলল, "ওরা বারোজন খেলছে।" রেফারি গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারিই খেলা থামিয়ে দোমোহানির ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, "তোমাদের টিমে চার পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।"

দুর্দান্ত সাহেব—রেফারি, সবাই ভয় পায়। দোমোহানির ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, "গুনে দেখুন।" রেফারি গুনে দেখে আহাম্মক। এগরোজনই।

দোমোহানির টিম আরও তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারি আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "দেয়ার আর অ্যাট লিসট টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।"

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় 'এগারোজন' কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিলপিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারি দোমোহানির টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভালো করে দেখে বললেন, "শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কোথায়? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?"

দোমোহানির ক্যাপ্টেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারি আরও রেগে টং। চা—বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপসে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশায়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, "আবার সেই গন্ধ! এখানে একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?"

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, "ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।"

"কে? কাদের কথা বলছ?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক!"

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ করতেন, আর বলতেন, "এসব ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! ও বউমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, "এ ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক!"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তাঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তাপর কথাবার্তা!" এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানিতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটেবাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারি অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকে তাঁর ভারি ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ওই বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানিতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া—বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না— আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই শুনছিস?"

অমনি একটা সমবয়সি ছেলে এসে দাঁড়াল, "কী বলছ?"

"আমি একটু বাথরুমে যাব, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, "দাঁড়াব কেন? তোমার কীসের ভয়?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বলেন, "ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, "কীসের ভয় বললে না?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের।"

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "শুধু ফাজিল হয়েছ তোমরা।"

তা এইরকম সব হত দোমোহানিতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে শিঙি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমশিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয় ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভালো কথা নয়। গন্ধটা খুবই সন্দেহজনক! তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, "এ তো ভালো কথা নয়! গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক! আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ওই কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?

জয়রামবাবু

জয়রাম বোস নস্যির ডিবেটা মঙ্গলগ্রহে ফেলে এসেছেন। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। তাড়াহুড়োয় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য যে রকেটটা ভাড়া করেছেন, সেটা আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়া পারাপারের। সৌরমণ্ডলের জন্য আলাদা ধীরগতির রকেট পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরার সময় এটাকেই কাছেপিঠে দেখতে পেয়ে হাতঘড়িতে লাগানো ট্রানসরিসিভারের সংকেতে নামিয়ে এনেছিলেন। পাইলট ফাঁকতালে ছোট খেপের সওয়ারি পেয়ে কিছু বাড়তি লাভের আশায় আপত্তি করেনি বটে, তবে সে নস্যির ডিবের জন্য এখন ফিরে যেতেও নারাজ। জয়রাম কথাটা তুলতেই লোকটা বলল, "ও বাবা, আমাকে আর সাত মিনিটের মধ্যে নেবুলার ওধারে রওনা হতে হবে। আমার এ রকেট সেকেন্ডে মাত্র দু কোটি মাইল যায়। সৌরমণ্ডল বলে আরও আস্তে চালাচ্ছি। দেরি করতে পারব না।"

জয়রাম খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই। আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়ার মাঝিরা একটু ডাঁটিয়াল হয়েই থাকে। তবে নস্যির ডিবের জন্য জয়রামের একটু উসখুস রয়েই গেল।

জয়রামের বাড়ি একটি ভাসমান বাসগৃ। পৃথিবীতে আর বাড়ি করার জায়গা নেই। মাটির তলাতেও আধমাইল গভীরতা পর্যন্ত গিজগিজ করছে বাড়িঘর। অবশেষে একবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাধ্যাকর্ষণ—নিরোধী বাড়ি তৈরি করে আকাশে ছাড়া হয়েছে। তা বলে বাড়িগুলো ভেসে বেড়ায় না, শূন্যের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একদম স্থির হয়ে থাকে। এইসব বাড়িতে বাতাস থেকে জল এবং সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভালো ব্যবস্থা আছে। শুধু মাঝে—মাঝে হাটবাজার করতে পৃথিবীতে নামতে হয়।

জয়রামের বাড়ির সামনে একটা খোলা রক। তার ওপর দাগ কেটে জয়রামের ছোট মেয়ে বুঁচি এক্কাদোক্কা খেলছে। রকেটটা সেই রকের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই জয়রাম ভাড়া মিটিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন। বুঁচি 'বাবা" বলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে।

মেয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ায় জয়রাম টাল সামলাতে না পেরে পড়ো—পড়ো হয়ে পড়েই গেলেন নিচে। নিচে বলতে যদি সত্যিই পৃথিবীর বুকে গিয়ে পড়তে হয়, তবে সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফুট। কিন্তু আকাশবাড়িতে যারা থাকে, তাদের সকলকেই মাধ্যাকর্ষণ—নিরোধী পোশাক পরতে হয়। জয়রাম তাই পড়েও পড়লেন না। শূন্যে একটু ভেসে সাঁতরে আবার বাড়ির রকে এসে উঠলেন। মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ঘরে ঢুকে মহাকাশের বিশেষ পোশাক ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে দেয়ালজোড়া টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে বললেন, আমি এখন টেলিভিশন দেখব। চ্যানেল চার, ব্যান্ড সাত। বলার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিপ্রতিক্রিয়ায় টেলিভিশনে ছবি ভেসে উঠল। জোর খেলা চলছে। বৈজ্ঞানিক রাখোহরির টিমের সঙ্গে যন্ত্রবিদ ফসটারের টিমের ফুটবল ক্যালকুলেশন ম্যাচ। দু'দলে এগারো জন করে বাইশ জন বাঘা কমপিউটার রয়েছে। তারা বলটাকে এক বিশাল আয়তক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় চালনা করছে। রাখোহরির লেফট উইং

বেঁটে কমপিউটার গদাই বলটাকে নিউট্রাল জোনে ঠেলে দিতেই ফস্টারের গোল কমপিউটার ব্যারেল সেটাকে ধরে লেফট হাফ মজবুত—গড়নের গরডনের কাছে পাঠাল। রাখোহরির চকিত—চিন্তা কমপিউটার বলটাকে ধরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কোণে নিখুঁত ঠেলে দিতেই ফস্টারের পাগলা কমপিউটার মুনস্ট্রাক আর রাখোহরির ঠান্ডা—মাথার কমপিউটার শীতলচন্দ্রের জোর সংঘর্ষ।

জমে উঠেছিল খেলাটা। কিন্তু জয়রামের গিন্নি সৌরচুল্লিতে কয়েক সেকেন্ডের ভিতর এক বাটি সুজি করে এনে দিয়ে বললেন, "এক ছিটে আনাজপাতি নেই। বাজারে যাবে না?"

জয়রাম উঠলেন! অতিবেগুনি রশ্মি ও অন্যান্য রশ্মি দিয়ে হাতমুখ পরিষ্কার করে সুজি খেয়ে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লেন। আসল সুজি নয়, কৃত্রিম সুজি, তাই মুখটা বিস্বাদ ঠেকছিল।

গ্যারেজে ঢুকে ছোট ভারটিকাল বিমানটি বের করে নিয়ে পৃথিবীর বুকে রওনা হলেন। তাড়া নেই। আস্তে—আস্তে যাচ্ছেন। আশেপাশে আরও অনেক বাড়ি ভাসছে। দত্তগিন্নি একটা মহাজাগতিক রশ্মি আটকানোর ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে ডালের বড়ি শুকোতে দিচ্ছেন। বুড়ো চাটুজ্যের বড় বদভ্যাস। রকে দাঁড়িয়ে নাক ঝাড়ল নিচে। পড়শি খলিলভাই বাজার করে ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা কাচের হেলিপ্লেনে ফিরছিলেন। তাকে বেতারে জয়রাম চাটুজ্যে বুড়োর বদভ্যাসের কথাটা জানিয়ে দিয়ে বললেন, "এইভাবেই একদিন দেখো আকাশবাসী আর পৃথিবীবাসীর মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠবে। এখনই সাবধান না হলে—"

নস্যির জন্য নাকটা উসখুস করছে তখন থেকে। কিন্তু কিছু করার নেই। দুঃখিত মনে জয়রাম প্লেন নিয়ে নিউ ইয়র্কের সুপার মারকেটে নামলেন। নামে সুপার মারকেট হলেও সবজি বা আনাজ বলতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চাষের জমিতে টান পড়েছে। তাই টাটকা সবজির বদলে আজকাল সিনথেটিক খাবারেরই বেশি চলন, সবজি যাও বা কিছু পাওয়া যায়, তা আসে নীহারিকা পুঞ্জের প্রথম পর্যায়ের এক সৌরমণ্ডলের দুটি বাসযোগ্য বড় গ্রহ থেকে। কিন্তু তাতে খরচও কম পড়ে না আর পরিমাণেও তা পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ।

জয়রাম ভিড়ে থিকথিক—করা বাজারে ঢুকে দেখলেন এক জায়গায় কিছু টাটকা মানকচু বিক্রি হচ্ছে। তার সামনে বিশাল লাইন। জয়রাম ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু অর্ধেক পথেই কচু ফুরিয়ে গেল। ছুটলেন অন্য জায়গায়, সেখানে কিছু তেলাকুচোর চালান এসেছে। কিন্তু তেলাকুচোও কপালে জুটল না। নস্যির জন্য নাকটা সুড়সুড় করছে কখন থেকে। মঙ্গলগ্রহে হাজার হাজার মাইল খাল খোঁড়ার কাজ তদারক করতে করতে অন্য সব কথা খেয়াল থাকে না। অথচ খাঁটি নস্যি এখানে কিনতে পাওয়া যায় না। নীহারিকাপুঞ্জের সবুজ গ্রহে কিছু তামাকের চাষ হয়। সেখান থেকে তাঁর বন্ধু পাড়ুরাম বড় একটা ডিবে এনে দিয়েছিল। দামও পড়ে যায় বিস্তর।

কাঁচা সবজি না পেয়ে জয়রাম টিনের সিল—করা প্যাকে কৃত্রিম খাবার কিনলেন। গিন্নি ভারি রেগে যাবেন। কিন্তু কী আর করা!

ছাদের দিকে এসকেলেটরে উঠছেন এমন সময় দোকলবাবুর সঙ্গে দেখা।

"কী খবর হে? বাসা কোথায় করলে?" দোকলবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে আকাশপুরীর তায়েবগঞ্জে। উত্তর রাশিয়ার ঠিক ওপরেই!"

"বাঃ, সে তো খুব ভালো জায়গা শুনেছি। এখন সেখানে জায়গার দাম কত করে বলো তো? আমার মেজো জামাই একটা জায়গা খুঁজছে।"

"আজ্ঞে তায়েবগঞ্জে আর জায়গা নেই। পাশে নতুন একটা কলোনি হচ্ছে। নাম চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপ, সেখানে জায়গা পেয়ে যাবেন। তবে প্রতি ঘনফুট বোধ হয় এক লক্ষ ডলার করে পড়বে।"

"তা পড়ুক। জায়গা পাওয়া গেলেই হল।" বলতে—বলতে দোকলবাবু পকেট থেকে একটা রুপোর কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে 'আঃ' বলে আরামের একটা আওয়াজ করলেন।

ডিবেটার দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়েছিলেন জয়রামবাবু। এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। নস্যি, নস্যি!

''একটু দেবেন? ওই নস্যিটা?''

দোকলবাবু বললেন, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও না। আমার বড় জামাই তো সবুজ গ্রহে বাস করে, সে আমাকে পিপে—পিপে নস্যি পাঠায়। যত খুশি নাও।'' বলে দোকলবাবু উঁকি মেরে জয়রামের থলিটা দেখে বললেন, ''শাকসবজি কিছু পেলে না দেখছি!''

জয়রাম পরপর দু'টিপ নস্যি টেনে আরামে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে এক গাল হাসলেন। বললেন, ''নাঃ। গিন্নির কাছে আজও বকুনি খেতে হবে।''

ছাদে এসে যে যার যানবাহন খুঁজতে যাবেন, তখন দোকলবাবু বললেন, ''এখনো ঢের সময় আছে। আমার বাড়ি তো কাছেই গ্রিসে। চলো একটু বিশ্রাম করে যাবে।''

নিউইয়র্ক থেকে গ্রিসের দূরত্ব এয়ার কারে মাত্র আধ মিনিট। তাই জয়রামবাবু আপত্তি করলেন না। দোকলবাবু তাঁর এয়ার কারের দরজা খুলে বললেন, ''উঠে পড়ো।''

পুরোনো অ্যাথেন্সের বাইরে দোকলবাবুর ছোট বাড়ি। তবে খুব বড়লোক ছাড়া বাড়িতে কারো বাড়তি জমি থাকে না। দোকলবাবুর আছে। কাজটা বে—আইনিও বটে। দোকলবাবু খুব লুকিয়ে পাঁচিল ঘিরে দশ হাত বাই দশ হাত একটু জমি রেখেছিলেন বাড়ির পিছনে।

জয়রামকে কফি খাইয়ে দোকলবাবু বললেন, ''এসো, তোমাকে তাজ্জব জিনিস দেখাব একটা।'' বলে প্রায় হাত ধরে টেনে পিছনের ফালি জমিটায় নিয়ে এলেন জয়রামকে।

জয়রাম থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে থ তিনি।

পৃথিবীতে অতীত কালের মানুষরা মাটিতে কেমিক্যাল সার দিয়ে মাটিকে পাথরের মতো শক্ত আর জমাট করে দিয়ে গেছে। তাতে আর চাষ হয় না, সেচ চলে না, লাঙলই ঢুকতে চায় না। গাছপালা বলে কিছুই প্রায় নেই। ফালতু জমিও নেই যে গাছ লাগানো যাবে। তবে এ কী? দশ বাই দশ হাত জায়গাটায় কচি—কচি ঢেঁকিশাকের মাথা জেগে রয়েছে। কী সবুজ! কী সরস! কী অদ্ভুত!

''ঢেঁকিশাক!'' জয়রাম চেঁচিয়ে উঠলেন।

দোকলবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, ''উঁহু, শব্দ কোরো না। টের পেলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে!''

জয়রাম এবার চাপা স্বরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় বলে উঠলেন, ''এ যে ঢেঁকিশাক!''

''ঢেঁকিশাকই বটে। অনেক কষ্টে দশ বছরের চেষ্টায় ফলিয়েছি। নেবে ক'টা? নাও। দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি। খবর্দার, কাউকে বলো না কিন্তু!''

'আজ্ঞে না না।'' বিগলিত জয়রাম বললেন।

''আর শোনো, ওই চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপে আমার জামাইয়ের জন্যে শ পাঁচেক ঘনফুট জায়গা জোগাড় করে দিতে হবে।''

ঢেঁকিশাকের দিকে চেয়ে জয়রাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন, ''নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।''

বারোগাছি ঢেঁকিশাক নিয়ে জয়রাম যখন বাড়িতে ফিরলেন তখনো তাঁর চোখমুখ অস্বাভাবিক সম্মোহিত। বিড়বিড় করে কেবল বলছেন, ''ঢেঁকিশাক! ঢেঁকিশাক!''

হরবাবুর অভিজ্ঞতা

নিশুত রাতে হরবাবু নির্জন অন্ধকার মেঠো পথ ধরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বৃষ্টি বাদলার দিন। পথ জলকাদায় দুর্গম। তার ওপর আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হরবাবুর টর্চ আর ছাতা আছে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। টর্চের আলো নিবুনিবু হয়ে আসছে আর হাওয়ায় ছাতা উল্টে যাওয়ার ভয়। বর্ষা বাদলায় সাপখোপের ভয়ও বড় কম নয়। গর্তটর্ত বুজে যাওয়ায় তারা আশ্রয়ের সন্ধানে ডাঙাজমির খোঁজে পথে ঘাটে উঠে আসে।

হরবাবুর অবশ্যই এই নিশুতরাতে পৌঁছোনোর কথা নয়। কিন্তু ট্রেনটা এমন লেট করল যে হরিণডাঙা স্টেশনে নামলেনই তো রাত সাড়ে দশটায়। গরুর গাড়ির খোঁজ করে দেখলেন সব ভোঁ ভোঁ, এমনকী তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাঁ গোবিন্দুপুরে যাওয়ার সঙ্গী সাথীও কেউ জুটলো না। গোবিন্দপুর না হোক দুই তিন মাইল রাস্তা। হরবাবুর ভয় ভয় করছিল। কিন্তু উপায়ও নেই। তাঁর শালার বিয়ে। হরবাবুর স্ত্রী চার পাঁচদিন আগেই ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। হরবাবুর জন্যে তাঁরা সব পথ চেয়ে থাকবে।

সামনেই তুলসীপোতার জঙ্গল। একটু ভয়ের জায়গা, আধমাইলটাক খুবই নির্জন রাস্তা। আশে পাশে বসতি নেই। হরবাবু কালী—দুর্গা স্মরণ করতে করতে যাচ্ছেন। বুকটা একটু কাঁপছেও। এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পৃথিবীটা যে কেন এত পেছিয়ে আছে, তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ফিরিঙ্গির হাট ছাড়িয়ে ডাইনে মোড় নিতে হবে। কিন্তু এত জম্পেশ অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না, টর্চবাতির আলো চার পাঁচ হাতের বেশি যাচ্ছেও না। বড়ই বিপদ।

হরবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, — ওঃ, আজ বেঘোরে প্রাণটা না যায়। ডান দিকে তুলসীপোতার রাস্তার মুখটা খুঁজে পেয়েও দমে গেলেন হরবাবু। এতক্ষণ যাইহোক শক্ত জমির ওপর হাঁটছিলেন। এবার একেবারে থকথকে কাদা।

—হরি হে, এই রাস্তায় মানুষ যেতে পারে? পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য নেই।

হরবাবু আপনমনে কথাটা বলে ফেলতেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, —তা যা বলেছেন।

হরবাবু এমন আঁতকে উঠলেন যে আর একটু হলেই তাঁর হার্ট ফেল হত। পিছনে তাকিয়ে দেখেন একটা রোগা আর লম্বাপানা লোক। হরবাবুর সঙ্গে শালার বউয়ের জন্য গড়ানো একছড়া হার আছে। কিছু পয়সাও। লোকটা ডাকাত নাকি? হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন, আপনি কে?

—চিনবেন না। এদিক পানেই যাচ্ছিলাম।

—অ। তা ভালো।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন? গোবিন্দপুর নাকি?

হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন, —হ্যাঁ, সেখানেই যাওয়ার কথা।

লোকটা একটু হাসল, — যেতে পারবেন কি? এখন তো এই কাদা দেখছেন, গোড়ালি অবধি। এরপর হাঁটু অবধি গেঁথে যাবে।

—তাহলে উপায়? আমার যে না গেলেই নয়।

লোকটা একটু হেসে বলে, — উপায় কাল সকাল অবধি বসে থাকা। তারপর ভোরবেলা ফিরিঙ্গির হাট থেকে গরুর গাড়ি ধরে শিয়াখালি আর চটের হাট হয়ে গোবিন্দপুর যাওয়া। তাতে অবশ্য রাস্তাটা বেশি পড়বে। প্রায় সাত আট মাইল। কিন্তু বর্ষাকালে তুলসীপোতা দিয়ে যাতায়াত নেই।

—রাত এখানে কাটাব? থাকব কোথায়?

—তার আর ভাবনা কী? একটু এগোলে ওই জঙ্গলের মধ্যে আমার দিব্যি ঘর আছে। আরামে থাকবেন।

হরবাবু খুব দোটানায় পড়লেন বটে, কিন্তু কী আর করেন। লোকটা যদি তাঁর সব কেড়েকুড়েও নেয় তাহলে কিছু করার নেই বটে। কিন্তু গোবিন্দপুর যে পৌঁছানো যাবে না তা বুঝতে পারছেন।

আমার পিছু পিছু আসুন। —বলে লোকটা একটু এগিয়ে গেল।

হরবাবু খুব ভয়ে ভয়ে সংকোচের সঙ্গে তার পিছু পিছু যেতে যেতে বললেন,—তা আপনার বাড়ি বুঝি ফিরিঙ্গি হাটেই?

—তা বলতে পারেন। যখন যেখানে ডিউটি পড়ে সেখানেই যেতে হয়। আমার কাছে সব জায়গাই সমান। তবে আপনার এই পৃথিবীটা যে বাসযোগ্য নয় তা খুব ঠিক কথা। এখানে হরকিত, গুবজোর, সেরোঙ্গি কিছুই পাওয়া যায় না। বড্ড অসুবিধে।

লোকটা পাগল নাকি? হরবাবু অবাক হয়ে বললেন, —কী পাওয়া যায় না বললেন?

বলে লাভ কী? আপনি পারবেন জোগাড় করে দিতে? ওসব হচ্ছে খুব ভালো ভালো সবজি।

জন্মে যে নামও শুনিনি। এসব কি বিলেতে হয়?

না মশায় না। বিলেতের বাজারও চষে ফেলেছি।

খুবই আশ্চর্য হয়ে হরবাবু বললেন, —বিলেতেও গেছেন বুঝি?

—কোথায় যাইনি মশায়! ছোট গ্রহ, এমুড়ো ওমুড়ো টইল দিতে কতক্ষণই বা লাগে।

হরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই দুর্যোগের রাতে শেষে কি পাগলের পাল্লায় পড়লেন?

লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল, —নিতান্তই পেটের দায়ে পড়ে থাকা মশাই। নইলে এই অখাদ্য জায়গায় কেউ থাকে? এখানে ফোরঙ্গলিথুয়াম হয় না, কাঙারাঙা নেই, ফেজুয়া নেই —এ জায়গায় থাকা যায়?

হরবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, —এগুলো কি সবজি?

—আরে না। আপনাকে এসব বুঝিয়েই বা লাভ কী? আপনি এসব কখনও দেখেননি জানেনও না। ফোরঙ্গলিথুয়াম একটা ভারি আমোদ প্রমোদের ব্যাপার। কাঙারাঙা হল খেলা। ফেজুয়া হল —নাঃ, এটা বুঝবেন না।

হরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, —আজ্ঞে না। আমার মাথায় ঠিক সেঁধোচ্ছে না। তা মশাইয়ের দেশ কি আফ্রিকা?

—হাসালেন মশাই। আফ্রিকা হলে চিন্তা কি ছিল! এ হল জরিভেলি লোকের ব্যাপার।

—জরিভেলি?

—শুধু জরিভেলি নয়, জরিভেলি লোক। এই আপনাদের মোটে নয়টি গ্রহ নয়, আমাদের ফুন্দকনীকে ঘিরে পাঁচ হাজার গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। সবকটা নিয়ে জরিভেলি লোক। এলাহি কাণ্ড।

হরবাবু মূর্ছা গেলেন না। কারণ লোকটা পাগল। আবোল তাবোল বকছে।

কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই হরবাবু যে জিনিসটা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া। জঙ্গলের মধ্যে ছোটখাটো একটা বাড়ির মতো একখানা মহাকাশযান। আলো টালো জ্বলছে। ভারি ঝলমল করছে জিনিসটা।

—আসুন, ভিতরে আসুন। আমি একা মানুষ, আপনার আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটবে।

ভিতরে ঢুকে হরবাবু যা দেখলেন, তাতে তাঁর মূর্ছা যাওয়ারই জোগাড়। হাজার কলকব্জা, হাজার কিম্ভূত সব জিনিস। কোথাও আলো জ্বলছে নিবছে, কোথাও হুস করে শব্দ হল, কোথাও পিঁ পিঁ করে যেন বেজে গেল, কোথাও একটা যন্ত্র থেকে একটা গলার স্বর অচেনা ভাষায় নাগাড়ে কী যেন বলে চলেছে— লং পজং ঢাকাকাল লং পজং পাকালাব....

হরবাবুর মাথা ঘুরছিল। তিনি উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি কোথা থেকে এক গেলাস কালোমতো কী একটা জিনিস এনে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, —খেয়ে ফেলুন।

হরবাবু বুক ঠুকে খেয়ে ফেললেন। একবারই তো মরবেন। তবে স্বাদটা ভারি অদ্ভুত। ভিতরটা যেন আরামে ভরে গেল।

—এসব কী হচ্ছে মশাই বলুন তো?

লম্বা লোকটা ব্যাজার মুখে বলল, —কী আর হবে? আমার এখানে পোস্টিং হয়েছে। পাক্কা তিনটি মাস— আপনাদের হিসেবে— এইখানেই পড়ে থাকতে হবে।

—কীসের পোস্টিং?

—আর বলবেন না মশাই। এতদিন জরিভেলির বাইরে আমরা কোথাও যেতাম না। এখন হুকুম হয়েছে, কাছে পিঠে যে—কটা লোক আছে সেগুলো সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সোজা কাজ নাকি মশাই? যেখানে পোস্টিং হবে, সেখানকার ভাষা শেখো রে, সেখানকার আদব কায়দা রপ্ত করো রে, সেখানকার অখাদ্য খেয়ে পেট ভরাও রে। নাঃ, চাকরিটা আর পোষাচ্ছে না।

হরবাবু একটু একটু বুঝতে পারছেন, লোকটা গুল মারছে না। তিনি উঠে একটা চেয়ারগোছের জিনিসে বসে পড়ে বললেন, — আপনাদের জরিভেলি কতদূর?

—বেশি নয়। আপনাদের হিসেবে মাত্র একশো তেত্রিশ আলোকবর্ষ দূরে।

—অ্যাঁ?

হ্যাঁ, তা আর বেশি কী? আমার এই গাড়িতে ঘণ্টা খানেক লাগে।

—অ্যাঁ।

—হ্যাঁ।

হরবাবু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, —তাহলে আর আমার শ্বশুরবাড়ি গোবিন্দপুর এমনকী দূর?

—কিছু না, কিছু না।

হরবাবু মহাকাশযান থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি—কি—মরি করে ছুটতে লাগলেন।